স্বামী সারদানন্দ

(যেমন দেখিয়াছি)

স্বামী ভূমানন্দ



উদ্বোধন কার্য্যালয়

[মূল্য আড়াই টাকা

প্রকাশক—
ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ,
উদ্বোধন কার্য্যালয়,
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

বর্ত্তমান পুস্তকে আমরা শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর পবিত্র জীবনীর আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার আশ্রয় লাভে নিজে ধন্য হইয়া তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য যেমন লাভ করিয়াছিলাম এই গ্রন্থে তাহারই আলোচনা করিয়াছি।

স্বামী সারদানন্দের সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট আমরা তাঁহার বাল্য জীবনের কথা জানিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রাচীনগণের মধ্যে পূজ্যপাদ স্বামী নির্ম্মলানন্দজীর নিকট তাঁহার কঠোর তপস্যার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি এবং তীর্থ পর্য্যটনাদি সহ অন্যান্য বহু বিষয় তাঁহার পরম বন্ধু, সুখ দুঃখের ভাগী, গুরুভ্রাতা পূজনীয় শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি। আজ স্বামী সারদানন্দের পূত জীবনী মুদ্রিত করিবার সুযোগে তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অলমিতি।

ফাল্গুনী—শুক্লা দ্বিতীয়া।
বুধবার—১৩৩৫ সাল।

শ্রীভূমানন্দ

ভূমিকা

পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী সারদানন্দজী ইহলোক হ'তে অপসৃত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পালয়িতা এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা এই শক্তিশালী আচার্য্যের ভক্ত অনুরক্ত ও অনুগামী সন্ন্যাসী ও গৃহী বহু আছেন। এক এক জন এক এক ভাবে তাঁর কৃপা পেয়েছেন, উপদেশ পেয়েছেন। যাঁর জীবনধারণের উদ্দেশ্যই ছিল—লোককল্যাণ সাধন, তাঁর জীবন কথা যাঁরা তাঁকে দেখেননি, তাঁদের পক্ষ্যেও কল্যাণপ্রদ। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর পবিত্রসঙ্গে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা যে আচার্য্যের সম্বন্ধে আরো বেশী জানতে চাইবেন, এ স্বাভাবিক! স্বামী ভূমানন্দ বহুদিন পূজনীয় আচার্য্যের সঙ্গে থেকে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী দেখেছেন। বিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অনেক কাজ কর্ম্মে তিনি সেবকরূপে স্বামি-পাদের সঙ্গে ছিলেন, ফলে অনেক দেখবার ও শুনবার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি যে ভাবে আচার্য্যকে দেখেছেন, সেই ভাবেই আলোচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ, তিনি আশা করেন, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ম্মী ও সন্ন্যাসীরা এই পবিত্র জীবনকথা থেকে বললাভ করবেন এবং শিক্ষা পাবেন।

আমি বাল্যকাল থেকে স্বামিজীর সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছি। উদারহৃদয়ের অসীম অনুকম্পা ও স্নেহে আমার জীবন পুষ্ট হয়েছে; এ ছাড়া তিনি কি ছিলেন, কে ছিলেন তা কোন দিন

ভাবিনি। তবুও গ্রন্থকার আমায় আদেশ করেছেন,—ভূমিকায় তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় করে দিতে। অথচ আমি গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পড়ে দেখ্‌লেম, তিনি ঐ মহাপুরুষকে যত বিভিন্নভাবে দেখেছেন, আমি ক্ষমতার অল্পতাবশতঃ তা' পারিনি! যাঁরা অধ্যাত্মরাজ্যে বা জ্ঞানরাজ্যের পিপাসা নিয়ে আচার্য্যের কাছে এসে পথ পেয়েছেন, স্থান পেয়েছেন, শান্তি পেয়েছেন, এমন কোন যোগ্য লোকের হাতেই ভূমিকা লেখার ভার দেওয়া উচিত ছিল—আমার পক্ষে এ একেবারেই অনধিকারচর্চ্চা!

আমি তাঁকে নিতান্ত স্থূলদৃষ্টিতে সাধারণ ভাবেই দেখেছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, যেন তাঁকে কারিগর করে গড়েছিলেন,—মঠ ও মিশনের নানা প্রতিষ্ঠান গড়বার জন্য। তিনি গড়েছেন, সামান্য থেকে বৃহৎ ব্যাপার গড়ে তুলেছেন। আবার যত বিভিন্ন ধাতের ভিন্ন রুচির লোক্‌কে তিনি নিজ হাতে গড়ে নূতন জীবনদিয়েছেন। তাঁর কাজের একটা সুশৃঙ্খল অথচ বিশিষ্ট ধারা আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি। মঠ ও মিশনের কাজে, অর্থাৎ ঠাকুরের কাজে তিনি একান্তবিশ্বাসে আত্মনিয়োগ করতেন,—কোন বাধা বিঘ্ন, তাঁকে নিরাশ বা সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারতো না,—আবার কোন মানুষকেই আশ্রয় দিতে তাঁর সঙ্কোচ বা দ্বিধা হত না। এজন্য তিনি স্বতীর্থ, সহকর্ম্মী বা গুরুভাইদের নিকট বাধা পেয়েছেন, কখনো বা কটুকথাও তাঁকে শুনতে হয়েছে, তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি! প্রফুল্ল ও প্রশান্তচিত্তে সব সহ্য করেছেন।

দেখেছি, দেশের সেবা কর্‌তে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে অনেক যুবক তাঁর কাছে এসেছে। তিনি অসঙ্কোচ সেই সব রাজনৈতিক কর্ম্মীকে আশ্রয় দিয়েছেন অথচ তাদের সামলাতে ঘরে বাইরে

তাঁকে কি বেগ্‌ই না পেতে হয়েছে। কোন গঞ্জনায় তিনি বিরক্ত হননি, কোন ভীতিতে তিনি বিচলিত হননি! তাঁর কেবল এই চিন্তা ছিল, কি ভাবে এদের গড়ে তোলা যায়! তিনি তাঁর কাজ করেছেন। তাঁর কৃপায় বহু নির্য্যাতীত দেশকর্ম্মী মিশনের নানা কেন্দ্রে প্রশংসা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং করছেন। তাঁর কাছে এসে তাঁর আশ্রয় নিয়ে কেউ বিফল হন নি। সামান্য সামান্য লোক্‌কে সস্নেহ ভালবাসা দিয়ে এবং বিশ্বাস করে, তিনি এমন করে গড়ে তুল্‌তেন যে দেখে অবাক হয়েছি। মাঝে মাঝে যেন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারতেম, কি অদ্ভুত কৌশলে তিনি এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়েছেন এবং তা' চালিয়েছন। এত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মী, তাঁর ওপর নির্ভর করে যে দিনের পর দিন কাজ করে যেতো—তার রহস্য কোন অলৌকিক শক্তি নয়,—তিনি প্রত্যেক্‌কে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি যেমন কারও দোষ উদ্‌ঘাটন করার জন্য চর লাগাতেন না, তেমনি কারও কথায় সহজে তাঁকে টল্‌তেও দেখিনি! তিনি ধীর স্থির ভাবে সকলের কথাই শুন্‌তেন, কিন্তু ভাল করে না বুঝে সহজে কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতেন না।

সে আজ অনেকদিনের কথা। তাঁর জনৈক গুরুভাই মঠের কোন ছেলে সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ও ছেলে মানুষ, ওর হাতে অত অত টাকার দায়ীত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছেন, টাকাকড়ি গোলমাল করে বলে আমার সন্দেহ হয়।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বল্‌লেন, "অমন বৃথা সন্দেহ কারও উপর করো না, তোমার অনুমান ছাড়া আর কিছু আছে কি?" গুরুভাইটি উত্তর না দিয়ে চুপ

করে রইলেন দেখে, তিনি আবার বল্লেন, "দেখ মানুষকে বিশ্বাস করবে, ভালবাস্বে তবেই মানুষ গড়ে উঠবে। আমি তাকে জানি, সে অমন নয়।" তিনি যেমন গুণের আদর করতেন, উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে কর্ম্মীদের শক্তি সামর্থ্য বাড়িয়ে দিতেন, তেমনটি আর দেখিনি! একদিন নট-গুরু গিরীশচন্দ্রের বাড়ীতে মঠের কাজকর্ম্মের কথা হচ্ছে, এমন সময় গিরীশবাবু উপস্থিত একটি ছেলেকে হাসতে হাসতে বল্লেন, "অমুকে এই সব কাজ করে, তুই পারবি?" বালকটির লেখাপড়ায় বড় মনযোগ ছিল না, সে কাজ তার দ্বারা সম্ভবও ছিল না। তবু স্বামী সারদানন্দ সস্নেহে বল্লেন,—"কিরে পারবি নি?—নিশ্চিত পারবি; বল্না, কাজ দিয়ে দেখুন পারি কিনা? দেখ জি, সি, ও ঠিক পারবে। তবে লেখাপড়া—ওইটেই মুস্কিল। আমি ওকে নিজে পড়াবার চেষ্টা করেছি—ও একেবারে "পেল্লাদ"। কোথাও যেতে বল, সারাদিন টো টো করে ঘুরে আস্তে মজবুত। আমি বল্লাম, স্থির হয়ে লেখা পড়া কর, ও চল্লো লাটু মহারাজের সঙ্গে পরিব্রাজক হয়ে। এ নিয়ে আমাকে প্রায়ই লাটুর সঙ্গে বকাবকি করতে হয়।" এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পরে, তিনি সেই বালককে দিয়েই ঐ কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন, বালক বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই সেই কাজ করছিল।

তিনি মানুষকে বিশ্বাস করতেন অথচ তার দোষ সম্বন্ধে অন্ধ বা উদাসীন ছিলেন না। যাকে যে কাজের ভার দিতেন, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেই দিতেন; কেউ ভুল করলে বা অন্যায় করলে তাকে ডেকে বুঝিয়ে দিতেন, সংশোধনের সুযোগ দিতেন।

দোষ দেখিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করতেন, "কি বলবার আছে বল।" সরাসরি বিচার তাঁর দ্বারা হত না। তাঁর চেষ্টাই ছিল মানুষকে সংশোধন করে গড়ে তোলা। বিচার করে শাস্তি দেওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। তিনি বিচারক ছিলেন না লোককে শোধরাবার বান্ধব ছিলেন।

তাঁর ছিল অসাধারণ সহ্যগুণ। তিনি যেন ছিলেন—ধৈর্য্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তাঁকে নানাভাবে বিব্রত হতে হয়েছে কিন্তু কখনো তাঁকে ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট দেখিনি। শ্রীশ্রীমা কল্‌কাতা এলে গঙ্গাতীরের কাছাকাছি তাঁর বাড়ী ভাড়া হ'তো,—তিনি গঙ্গাতীরই ভাল-বাস্‌তেন। ভাঁড়াটে বাড়ীতে অনেক অসুবিধা হতো। এ জন্য কেদারনাথ দাস নামে একজন ভক্ত বাগবাজারে একখণ্ড জমী মঠকে দান করেন। মাতাঠাকুরাণীর থাকার সুবিধা হবে, উদ্বোধন কার্য্যালয়েরও সুবিধে হবে বলে স্বামী সারদানন্দ ঐ জমীর উপর বাড়ী করবার সঙ্কল্প করলেন। তাঁর হাতে সামান্য টাকাই ছিল, তিনি দেনা করে বাড়ী তৈরী করেন। এ জন্য তাঁর এক সহকারী তাঁকে নানা কটূক্তি করেন। এই সহকারী তাঁর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। তিনি সেই কটুবাক্য বেমালুম সহজ করে বলেছিলেন,—"তোমরা ছেলেমানুষ, সামান্যতে এত বিচলিত হও কেন? ঋণ আমি যেমন করে পারি শোধ করবো। সে ঋণ তিনি কিছুদিন পরেই শোধ করেছিলেন, কিন্তু সহকর্ম্মীর কথায় বড়ই বেদনা পেয়েছিলেন। মাঝে মাঝে বল্‌তেন, "মার বাড়ীর জন্য অনেক কথা শুনেছি।" বর্ত্তমান নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় তিনি যখন ঋণ করে কাজ আরম্ভ কর্‌লেন, তখন

আবার নিজেদের ভেতরেই প্রতিবাদ উঠ্‌লো। তিনি ঐ সব সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কেবল বল্‌লেন,—"কাজ করতে গেলে বুকের পাটা চাই, যার সাহস নেই, ঠাকুরের ওপর নির্ভর নেই, সে কি করে কাজ করবে! নারীভাবাপন্ন পুরুষ দিয়ে কাজ হয় না। তারা কেবল ভয়েই মরে। ভগবানের প্রীতির জন্য কাজ করবো—ভয় কিসের? মানুষের ভালমন্দ কথাতে যারা মরে বাঁচে—তারাই ভয় পায়।"

এমনি ভাবে সুদীর্ঘকাল তিনি সাধু চরিত্রের অতুলনীয় শক্তিতে কাজ করে গেছেন। আমার মত স্থূলবুদ্ধি লোকের পক্ষে সেই অনুপম চরিত্র আর অগাধ জ্ঞানরাশির বিগ্রহরূপী মহাপুরুষের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা। অনুরুদ্ধ হয়ে যে কয়েকটি কথা লিখলেম তাতে তাঁর পরিচয় যে দেওয়া হল না,—এ আমি প্রাণে প্রাণে বুঝেছি। কিন্তু লেখকের অনুরোধ। এই মহাপুরুষের যে পরিচয় পাঠক পাঠিকাদের নিকট গ্রন্থকার উপস্থিত করেছেন, তা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না।

গণেন্দ্রনাথ

সূচনা

সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে। জগন্মাতার সম্মুখে পঞ্চ প্রদীপ হস্তে পূজারী আরতি করিতেছেন—বাম হস্তে ঘণ্টা বাজিতেছে। সেই ঘণ্টার সঙ্গে কাঁসর, বাদ্য-ঘড়ি, দামামা, তালে তালে বাজিতেছিল। মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ দর্শন করিতেছিলেন। প্রকৃতি শান্ত,—নিস্তব্ধ। আরতির বাদ্য ভিন্ন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অন্য কোন শব্দ কোলাহল ছিল না।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দির গঙ্গার উপরে। গঙ্গা কুলু কুলু শব্দে প্রবাহিতা। কচিৎ দূরাগত জলের ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দে নৌকার গমনাগমন সূচিত করিতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যা আগত দেখিয়া প্রথমে গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন। পরে বিন্দু বিন্দু ব্রহ্মবারি পান করতঃ হাত-তালি দিয়া সকল ঠাকুর দেবতার নাম লইতে লাগিলেন। এমনই সময় সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছিল।

সহসা ঠাকুর, ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। মন্দিরের সেবাইত মালিক—জানবাজারের বাবুরা মন্দিরে আসিলে যে বাড়ীতে থাকেন, লোকে সেই বাড়ীকে 'কুঠি' বলে। লোক-চক্ষুর অন্তরালে ঠাকুর সেই কুঠির ছাদে যাইয়া উঠিলেন, তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন, 'ওরে, ভক্তগণ তোরা কে কোথায় আছিস—শীগ্‌গীর আয়।' এই আকুল আহ্বান শ্রীশ্রীঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তের প্রাণে বাজিয়া উঠিল।

একে একে বালক ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আহ্বানে যাঁহারা * গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদেরই একজন।

তখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভক্তগণের দীক্ষা শিক্ষা চলিতে লাগিল। যিনি যে ভাবে ভাবিত, ঠাকুর তাঁহাকে সেই ভাবের অনুকূলে সাধন ভজন শিক্ষা দিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বালক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"হ্যাঁরে, তোর কোন্ ভাব ভাল লাগে?" স্বামী সারদানন্দকেও (শরৎ মহারাজ) ঠাকুর এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে শরৎমহারাজ বলিয়াছিলেন, "গণেশের ভাব আমার বেশ লাগে।" ঠাকুর বলিলেন—'তোর ঐ ভাব নয়। তুই সর্ব্বদা নিজকে শিব ভাব্‌বি।'

শ্রীশ্রীঠাকুর কঠিন গলরোগে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। বালক ভক্তগণ সেবার ব্যপদেশে দিনরাত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া

---

* (১) স্বামী বিবেকানন্দ
(২) " ব্রহ্মানন্দ
(৩) " যোগানন্দ
(৪) " প্রেমানন্দ
(৫) " নিরঞ্জনানন্দ
(৬) " অদ্বৈতানন্দ
(৭) " ত্রিগুণাতীত
(৮) " অদ্ভুতানন্দ;
(৯) " রামকৃষ্ণানন্দ
(১০) স্বামী তুরীয়ানন্দ
(১১) " সারদানন্দ

এই এগার জন মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছেন

(১২) স্বামী শিবানন্দ
(১৩) " অভেদানন্দ,
(১৪) " অখণ্ডানন্দ
(১৫) " সুবোধানন্দ
(১৬) " নির্ম্মলানন্দ
(১৭) " বিজ্ঞানানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচরগণের মধ্যে মাত্র শেষোক্ত ছয় জন প্রাচীন সন্ন্যাসী জীবিত আছেন।

রহিলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হইল না। হইল ঠাকুরের সেবা আশ্রয় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের (মঠের) প্রথম পত্তন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রাবণের অমানিশায় মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। যে সমন্বয় তিনি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই সত্য প্রচারের ভার ও যাহাদের তিনি ঘর ছাড়া করিয়াছিলেন তাঁহাদের রক্ষা করিতে চাপরাস্ (আদেশ) দিয়া গেলেন,—শ্রীনরেন্দ্রনাথকে।

যথাসময়ে বরানগরে একখানা ভাঙ্গা ভাড়াটীয়া বাড়ীতে মঠ স্থাপিত হইল। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) গুরু ভাইদের সহিত সেইখানে কঠোর তপস্যায় রত হইলেন।

দিন রাত জপ ধ্যান, শাস্ত্র পাঠ চলিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজা হইতেছে। তেলাকুঁচ পাতার চচ্চড়ি ও ভাত দিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইতেছে। যেদিন মঠে চাউল না থাকিত সেদিন সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন। মঠে সকলে কৌপীন পরিয়া থাকিতেন। মাত্র দুই খানা কাপড় ছিল। একখানা পরিয়া ঠাকুর পূজা হইত, অপরখানা কেহ মঠের বাহিরে গেলে পরিয়া যাইতেন।

এই বরানগর মঠে স্বামী বিবেকানন্দ রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দে ত নরম দেখে একখানা ইট, মাথায় দিয়ে একটু শুই।' তখন কাহারও বিছানা ছিল না, এমনই করিয়া দিন গত হইতেছিল।

একদিন স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) বরানগর মঠ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তারপর ভারতের নানা তীর্থাদি

পর্য্যটন, কত নগর, গ্রাম, পল্লী, অতিক্রম করিয়া মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজ হইতে আমেরিকার চিকাগো নগরে ধর্ম্ম মহামেলায় গমন, সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন, আমেরিকাবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জ্জন, দেশে আগমন এবং বেলুড়ে স্থায়ী মঠ স্থাপন করিলেন।

বেলুড় মঠ স্থাপন করিয়া স্বামিজী শ্রীশ্রীঠাকুরের মানস-পুত্র শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামিজীকে অধ্যক্ষ, ঋষি কেষ্টর * দলের লোক শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীকে সম্পাদক পদে মনোনীত করিলেন। তারপর স্বামিজীও মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। তদবধি শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও পূজ্যপাদ শরৎ-মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) আজীবন অধ্যক্ষ ও সম্পাদকের পদে থাকিয়া মঠ মিশনকে উন্নতি ও বিস্তৃতির পথে পরিচালিত করিয়াছেন।

বিগত ত্রিশ বৎসর সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমহারাজের সময়ে এবং শ্রীশ্রীমহারাজের মহা-সমাধির পরে কি ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মঠ মিশনের অগ্রগমন সূচিত হইয়াছিল কিম্বা গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার আলোচনা করিতে আমরা আসি নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয়—কি ভাবে আমরা স্বামী সারদানন্দকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম।

* শ্রীশ্রীঠাকুর যীশু খ্রীষ্টকে 'ঋষি কেষ্ট' বলিতেন। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামিজী ও শরৎ মহারাজকে ঠাকুর যীশু খ্রীষ্টের লীলাসহচররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।



স্বামী সারদানন্দ

(যেমন দেখিয়াছি)

প্রথম বর্ষ

ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে দুর্ব্বল ব্যক্তিও মহৎকার্য্য করিতে পারে। কিন্তু দৈনন্দিন ছোট খাট কাজগুলিতে যিনি উদারতা, সহনশীলতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, হৃদয়বত্তা ও পবিত্রতা দেখাইতে পারেন তিনি প্রকৃতই মহৎ, একথা যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে স্বামী সারদানন্দ মহত্তম ছিলেন।

বিংশতি বৎসর ধরিয়া দেখিতেছিলাম, এই সবল স্থূলকায় পুরুষসিংহ কিছুমাত্র ভাব-প্রবণতা না দেখাইয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অন্তঃপ্রেম প্রবাহে যতবড় বুক ততোধিক হৃদয় লইয়া স্বামিজীর নির্দ্দিষ্ট পথে ধীর গম্ভীর ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। স্বামী সারদানন্দের দৃঢ়তার সহিত অগ্রগমন-নীতি দেখিয়া স্বতঃই মনে হইত, এমন একনিষ্ঠ চিরবিশ্বস্ত সহকর্ম্মী স্বামিজীর অপর কেহ ছিলেন না যিনি অবনত ভারতে কর্ম্মযোগ প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর আছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মানস-পুত্র শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ সকলেই ঠাকুরের বিশেষ বিশেষ ভাব আশ্রয়

করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন,—স্বামিজী-প্রদর্শিত পথে কর্ম্ম-বিমুখ তমসাচ্ছন্ন ভারতে শক্তিপূজার প্রেরণা প্রদান করিতে—সেবা ও সহানুভূতি সহায়ে দরিদ্র নর-নারায়ণকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিতে।

প্রকৃত কর্ম্মীর যে সকল গুণ থাকা একান্তই প্রয়োজন সেই সকল গুণ তাঁহাতে বিশেষভাবে প্রকাশিত ছিল। এমন হৃদয়-বত্তা, পবিত্রতার সহিত একাধারে এমন প্রাণভরা সহানুভূতি, কর্ম্মে অদম্য উৎসাহ, কর্ম্ম-প্রবাহের মধ্যে অচল অটল, স্বামী সারদানন্দ ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিয়াছি এমন নাম,—কই মনেত পড়ে না।

সংহতি গঠন করিবার পক্ষে যে সকল অতি আবশ্যক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তাহাও তাঁহার মধ্যে 'স্বাভাবিক' ছিল। তিনি পরনিন্দা-বিমুখতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, সীমাশূন্য সহনশীলতা, আশ্রিত-বাৎসল্য এই সকল সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দের যে সকল দোষে 'সংহতি-বিচ্ছেদ' অবশ্যম্ভাবী হয় তাহার সামান্যমাত্রও স্বামী সারদানন্দে ছিল না। তিনি কাহারও কথা শুনিয়া অপরের প্রতি ভিন্ন ধারণা পোষণ করিতেন না—'এক তরফা' কথা শুনিয়া নিজমত ত্যাগ করিয়া কখন কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধ হইতেন না। বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বদা উভয়পক্ষের কথা ধীর ও সংযতভাবে শ্রবণ করিতেন।

আমি কখনও শরৎ মহারাজকে তাঁহার কোন গুরুভ্রাতার বিরুদ্ধে নিন্দা বা অমর্য্যাদাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। গ্রাম্যভাষা কখনও তিনি প্রয়োগ করিতেন না। অতীত কাল হইতে অবতার পুরুষগণের শিষ্যগণ মধ্যে পরস্পরে ঈর্ষ্যা যাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথায় দাঁড়াইয়াছে—সেই পাপে কেহ কখনও স্বামী সারদানন্দকে লিপ্ত হইতে দেখেন নাই।

মফঃস্বলের একটী ক্ষুদ্র সহরে ছিল আমার পূর্ব্বাশ্রম। ইং ১৯০৮ খ্রীঃ এর মার্চ্চমাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া বেলুড় মঠ হইতে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী) তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্ম্মলানন্দ) এবং নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) সেই ক্ষুদ্র সহরে শুভাগমন করেন। আমার পূর্ব্বাশ্রমেই পূজ্যপাদ মহারাজগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উৎসবের আনন্দে সাতদিন গত হইল। মঠে ফিরিবার সময় বাবুরাম মহারাজ আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠভুক্ত হইয়া মঠের অধীনেই আছি।

বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাড়ীতে শরৎ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। তখন তিনি দাড়ি গোঁফ রাখিতেন। সেই স্বল্প-ভাষী গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রীত হইলেও স্বস্তি অনুভব করিতে পারি নাই। আমি এমন গম্ভীর মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। চৈত্রমাসে শরৎ মহারাজকে প্রথম দেখিলাম।

তারপর দেখি বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে রাত্রি প্রায় ১১টার

সময়। আহিরীটোলা হইতে নৌকায় পার হইয়া শালকিয়া পথে শরৎ মহারাজ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ঐ সময়ে মঠে আসিতে দেখিয়া পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ দুর্যোগে?' শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'সকালে যে বলে পাঠিয়েছিলাম মঠে যাব।' বাবুরাম মহারাজ—'তা বেশ' বলিয়া শরৎ মহারাজকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গার ধারে বারাণ্ডায় বসাইলেন। তখন শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, 'সকালের দিকটায় হাতের কাজ শেষ কর্ত্তে পারলাম না, এদিকে জল ঝড় আরম্ভ হল, তখন বেরিয়ে পড়লাম; আহিরীটোলায় নৌকায় পার হলাম, একা নদী বিশ কোশ।' বাবুরাম মহারাজ বলিলেন 'যা বলেছ।' পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে আমরা আসিয়া স্বল্পভাষী দেখিয়াছি। এই স্বল্পভাষী শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহ, 'হাড় শুদ্ধ নৈকুষ্য' বাবুরাম মহারাজ ১৯১৩ খ্রীঃ রাণাঘাটে ঠাকুরের কথা বলিতে যাইয়া মুখর হন। সেদিনের সভায় তিনি দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তারপরে বাবুরাম মহারাজ আর স্বল্পভাষী ছিলেন না।

তখন মাত্র দুইমাস মঠে আসিয়াছি। ঠাকুরের সত্যরক্ষার কত অদ্ভুত কথাই না শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এমন দুর্যোগে রাত্রি ১১ টার সময় কথা দিয়াছি বলিয়া যে কেহ এত কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন তেমন লোকের দেখা তখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

গৃহে থাকিতে যে সকল সন্ন্যাসী দেখিয়াছি তাঁহারা প্রায় সকলেই হিন্দুস্থানী। প্রজ্জ্বলিত ধুনীর পার্শ্বে বৃক্ষতলশায়ী,

গঞ্জিকাসেবী, কৌপীন ও কম্বলমাত্র সম্বল, রোগে ঔষধপ্রদান, অর্থের বিনিময়ে (হাত দেখিয়া) ভাগ্যগণনা, ভাড়ার অর্থের জন্য গৃহীর দ্বারে শুভাগমন, ইহাই সাধুর লক্ষণ বলিয়া জানিতাম। ইহা ছাড়া স্থানীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া অভিহিত, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ক্বচিৎ কেহ মৌন থাকিতেন। ধার্ম্মিকদের মধ্যে প্রায় অনেকেই ভাবের আতিশয্যে কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন নৃত্য করিতেন আবার কখন বা কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করিতেন। এই সকল ধার্ম্মিকেরা কথা বলিতে যাইয়া "ভুলিয়া গেছি" এই কথা প্রয়োগ করিয়া জানাইতেন,—এ জগতে তাঁহাদের মন বেশীক্ষণ থাকিতেছে না। তখন বুঝিয়াছিলাম 'ভুল হওয়া' ধার্ম্মিকের একটা বড় লক্ষণ।

বেলুড় মঠে আসিয়া পূর্ব্বধারণা নিতান্তই অসার বলিয়া প্রতীত হইল। সংসারে থাকিতে দর্শক ছিলাম। এখানে শিষ্য সুতরাং শিখিতে হইল,—'ভাব' খুবই ভাল, কিন্তু তাহার সহিত 'প্রবণতা' যুক্ত হওয়া ভাল নহে; যেমন 'শুচি' ভাল, কিন্তু তাহার সহিত 'বাই' যুক্ত হওয়া সমীচীন নহে। জানিলাম 'ভুল হওয়া' ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, উহা নিছক ব্রহ্মচর্য্য অভাবের ফলমাত্র। শুনিলাম, সাধুর মাংসপেশী হইবে লোহার, স্নায়ু হইবে ইস্পাতের এবং এমন ইচ্ছাশক্তি হইবে যাহার গতিরোধ করা কিছুতেই সম্ভব নহে। (Muscles of iron, nerves of steel, gigantic will which nothing can resist)

কারণ, সাধুকে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করিতে হইবে—ভাবের বেগ, রিপুর বেগ ধারণ করিতে হইবে, কর্ম্মের মধ্যে ধীর স্থির থাকিয়া কাজ করিতে হইবে, তখন পেশী, স্নায়ু ও ইচ্ছাশক্তি সবল না হইলে সাধুজীবন নিতান্তই বিফল হইবে।

শেষে শুনিলাম—"বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার বশে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

সেদিনের মঠে স্বামী শুদ্ধানন্দ আমাদের ভাগ্যে এক অপূর্ব্ব উপদেষ্টা ছিলেন। রাত্রের আহারের পর মঠে দক্ষিণের রকে বসিয়া তিনি কখন স্বামিজীর কথা বলিতেছেন, কখন বা উপনিষদ্, গীতা—শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া যাইতেছেন—আর আমরা মুগ্ধ হইয়া সে বাক্য-লহরী শুনিয়া রাত্রের অধিক অংশ কাটাইয়াছি। কথা-প্রসঙ্গে তিনিও বলিয়াছিলেন—'আমারও প্রথম প্রথম শরৎ মহারাজের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে ভয় হত।'

যথাসময়ে স্বামিজীর বিরচিত মঠের নিয়মাবলীখানা পড়িয়া দেখিলাম—সকল নিয়মগুলি সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার্থে এবং বিজয় অভিযানে (defensive & offensive) পূর্ণ থাকিয়া স্বামিজীর দূরদর্শিতা সূচিত করিতেছে। এখনও আমার মনে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে—"বিদ্যার অভাবে ধর্ম্ম সম্প্রদায় নীচ দশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা থাকিবে।"

"ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস

করে, অতএব ত্যাগ ও তপস্যার ভাব সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।”

“প্রচার কার্য্য দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচার কার্য্য হইতে কখন বিরত থাকিবে না।”

“আত্ম-নির্ভর ও আত্ম-প্রত্যয় চরিত্র-গঠনের একমাত্র উপায়। অতএব এই মঠের প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক শিক্ষায় ইহার উপর যেন লক্ষ্য থাকে।”

“আজ্ঞাবহতাই কার্য্যকারিতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাপালন করিতে হইবে।”

“অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব-বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। অতএব কেহ তাহা করিবে না। যদি কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে তবে একান্তে তাহাকেই বলা হইবে।”

“এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিত যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই যান বা যে অবস্থায়ই থাকুন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং লোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে।”

পরবর্ত্তী সময়ে যতই শরৎ মহারাজকে দেখিয়াছি ততই মনে হইত স্বামিজীর এই সকল নিয়মাবলী যেন তাঁহাতে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে।

তখন শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) গরমের সময়ে পুরীধামে থাকিতেন, পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষ (শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী) মঠের কাজ দেখিতেন। গোপালদা (শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ স্বামী), নিত্যানন্দ স্বামী, গুপ্ত-মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) মঠে থাকিতেন।

সেই সময় শরৎ মহারাজ কলিকাতা হইতে মঠে আসিতেন। কখন ২।১ দিন থাকিতেন। প্রায়ই যেদিন আসিতেন সে দিনই কলিকাতায় ফিরিতেন।

যে বৎসর (১৯০৮ খ্রীঃ) মঠে স্থান লাভ করিলাম—সে বৎসর পুরী জেলায় মিশনের দুর্ভিক্ষ-সেবা-কার্য্য চলিতেছিল। চিল্‌কা হ্রদের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ আছে সেই সকল দ্বীপে অজন্মা হওয়ায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। এই সেবাকার্য্য দশমাস চলিয়াছিল এবং ১৯০৯ খ্রীঃএর নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সেবাকার্য্য বন্ধ করা হইল। শেষ অংশের পাঁচ মাস আমিও সেই সেবা-কার্য্যে যোগ-দান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তখন শ্রীশ্রীমহারাজ পুরীতে ছিলেন। সুতরাং সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) শরৎ মহারাজের নিকটে আমাকে আনাইয়া বলিলেন,—'গণেন ফিরে এসেছে, সেখানে লোকের প্রয়োজন, একে পাঠাতে চাই, আপনি কি বলেন?' শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'বেশ ত।' তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন 'উৎসাহের সহিত কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে পারবে তো?' আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

এইরূপে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার অধিকার মঠ জীবনে তাঁহার কাছে প্রথমে লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। চিল্‌কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেলুড় মঠে রহিলাম। কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার ভাঁড়ারে বাবুরাম মহারাজ আমাকে নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং আমার নিত্যকার কাজ হইল পূজার যোগাড় দেওয়া।

দ্বিতীয় বর্ষ

ইং ১৯০৯ খ্রীঃ। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-তিথি পূজার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে শিবচতুর্দ্দশী রাত্রে হোমের ঘরে বসিয়া শরৎ মহারাজকে চার প্রহর একাসনে বসিয়া পূজা করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তখন ৪।৫ জনের বেশী ব্রহ্মচারী মঠে ছিলেন না। পূজা অন্তে গান—গান অন্তে পূজা এই ভাবে সমস্ত রাত্রি গত হইল। গান গাহিয়াছিলেন শরৎ মহারাজ তানপুরা সহযোগে, সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাইয়াছিলেন প্রবোধবাবু।—এই পূজার প্রথম প্রহরে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন—'আয়, গণেন, পূজা করবি আয়।' গণেন বলিলেন—সমস্ত দিন তাঁর কাপড় বদলাইবার অবসর হয় নাই তা ছাড়া তিনি আহার করিয়াছেন। তা হ'ক 'ব্যাধ যেমন পূজা করেছিল তেমনি পূজা কর্‌বি' বলিয়া একটু গঙ্গাজল গণেনের মাথায় দিয়া পাশে বসাইয়া পূজা করাইয়া দিলেন।

ব্যাধের সহিত উপমা—আর সস্নেহে পাশে বসাইয়া পূজা করাইয়া দেওয়ার মধ্যে—বোধ হয় আর কিছু ছিল যাহার জন্য গণেন 'না' বলিয়া পাশ কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহাকেও সেই অবস্থায় পূজা করিতে হইল। পূজা ও গানের আনন্দের মধ্য দিয়া রাত্রি অবসান হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজার রাত্রিতে—শরৎ মহারাজকে প্রতি বৎসর—"দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে" গানটী ঠাকুরঘরে বসিয়া গাহিতে শুনিয়াছি ; আর শুনিয়াছি স্বামিজীর তিথি পূজায় গাহিতে,—"একরূপ অরূপ-নাম-বরণ অতীত-আগামি-কালহীন দেশহীন সর্ব্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়।" ইহা ছাড়া অন্য সময়েও তাঁহাকে অনেক গানই গাহিতে শুনিয়াছি।

কি চমৎকার কণ্ঠ—আর কি সুন্দর ছিল গাহিবার ভঙ্গী!

এই বৎসর উদ্বোধনের নিজ বাড়ী-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। উৎসবের পর শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে শরৎ মহারাজের কাছে চিঠি আসিল,—মামারা পৃথক হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, শরৎ মহারাজকে উপস্থিত থাকিয়া ভাগ বাটোয়ারা করিয়া দিতে যাইতে হইবে। মঠে আসিয়া সে সংবাদ শরৎ মহারাজ জানাইলেন। আমি বাবুরাম মহারাজকে ধরিয়া বসিলাম,—'মাকে কখন দেখি নাই, আমি শরৎ মহারাজের সঙ্গে যাব।' বাবুরাম মহারাজ আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিলেন।

ইং ২৩শে মার্চ্চ, ১৯০৯ খ্রীঃ সকালে গুমো প্যাসেঞ্জারে শরৎ মহারাজ রওনা হইলেন। শ্রীযুতা যোগীন মা (১) ও গোলাপ মা (২) সঙ্গে চলিয়াছেন। গাড়ী বাঁশী বাজাইয়া হাওড়া ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

---

(১) যোগীন মা খড়দহের সুবিখ্যাত ধনাঢ্য জমিদার ঘরের গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার স্বামীর নাম অম্বিকাচরণ বিশ্বাস। এই বংশে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণতোষিণী তন্ত্র গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। যোগীন মা শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা ছিলেন।

(২) কথামৃতের পাঠক যাঁহাকে শোকাতুরা ব্রাহ্মণী বলিয়া জানেন

এইবার গাড়ী অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। শরৎ মহারাজ পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া একটি চুরুট মুখে রাখিয়া বাক্সটি আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, 'লজ্জা করে আর কি করবে? অনেক রাস্তা যে এক সঙ্গে যেতে হবে।'

আমি তখন, ধূমপান করিতাম না। সুতরাং নিবেদন করিলাম,—আমি খাই না।

শরৎ মহারাজ,—তবে আর নিয়ে কি হবে।

যে উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আমাকে সিগারেট দিতে চাহিয়াছিলেন এই রকম উদারতার সহিত মফঃস্বলের লোক কখন পরিচিত নহে। সুতরাং তাঁহার উদারতার মূল্য— যে কি, তাহা বুঝিবার মত সামর্থ্য তখন আমার ছিল না। দেশাচার লোকাচার এমনই প্রবল!

খড়গপুরে গাড়ী আসিল। তখন খাবার কিনিয়া মহারাজ ও আমি খাইলাম। যোগীন মা ও গোলাপ মা গাড়ীতে কিছু গ্রহণ করিলেন না। বৈকালে গাড়ী বিষ্ণুপুরে আসিল। আমরা এই খানে সকলে নামিয়া পাড়লাম। একটা চটিতে যাইয়া রান্নার ব্যবস্থা হইল। আহারান্তে যাত্রা করিবার জন্য শরৎ মহারাজ প্রস্তুত হইলেন।

তিনিই রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ও ভক্ত সঙ্ঘে গোলাপ মা নামে পরিচিতা। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিলে গোলাপ মা মায়ের প্রধানা সেবিকা থাকিয়া মায়ের সকল রকম ব্যবস্থা করিতেন, মা দেশে থাকিলে গোলাপ মা উদ্বোধনে সাধুদের খাওয়া দাওয়ার তদ্বির তালাপি সমস্তই করিতেন।

স্বামী অরূপানন্দ লিখিত, উদ্বোধন পত্রিকা হইতে গৃহীত শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা যোগীন-মা ও গোলাপ মার সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থের অন্যত্র সন্নিবেশ করা গেল।

যথাসময়ে দুইখানা গরুর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল প্রথম খানাতে যোগীন মা ও গোলাপ মা উঠিলেন। অপর খানাতে শরৎ মহারাজ উঠিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'উঠে পড়।' সর্ব্বনাশ! এক গাড়ীতে উভয়কে শয়ন করিতে হইবে নাকি! একে তিনি স্থূল দেহী, আর এ দেহ, স্থূল না হইলেও কাঠামোখানা নেহাৎ কম নহে। কিন্তু সে কথা তখন বলে কে? সমস্ত রাত শরৎ মহারাজের পার্শ্বে এক পাশ হইয়া কাটাইয়া রাত যখন ৩টা, তখন গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিতে লাগিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া কিন্তু মনে হইতেছিল, ঠাকুর! এমন বিপদে যেন আর না পড়িতে হয়।

পরদিন গাড়ী সকাল ৯টার সময় কোয়ালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও কোয়ালপাড়া মঠ হয় নাই তবে বয়ন-বিদ্যালয় ছিল। কেদার বাবু (পরে স্বামী কেশবানন্দ) বাক্স ও বিছানা বহন করিবার লোক ঠিক করিয়া দিলেন। শরৎ মহারাজ পদব্রজে জয়রামবাটী চলিলেন।

বেলা ১১টার সময় আমোদর নদ পার হইয়া মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বট বৃক্ষের নীচে বসিয়া পড়িলেন। আমাদের পশ্চাতে একজন বৃদ্ধাও আসিতেছিলেন। মহারাজকে ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া তাঁহার সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল—বৃদ্ধা সস্নেহে বলিলেন, "আহা, ভোঁদা (মোটা) মানুষ, বড্ড কষ্ট হয়েছে, বাবা?" পরবর্ত্তী সময়ে মহারাজ কিন্তু একথা বলিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিতেন।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন। মহারাজ স্নান করিতে আমোদর নদে

নামিলেন। স্নান করিয়া ক্ষুদ্র মাঠখানা অতিক্রম করিয়া জয়রামবাটী গ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং একেবারে ধূলাপায়ে আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রথমে তিনি প্রণাম করিলেন—মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ ও চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন। পরে আমি প্রণাম করিলাম। মা আমার মাথায়ও হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ, এবং চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন। আমি এক দৃষ্টে মাকে দেখিতে লাগিলাম।

ইং ২৪শে মার্চ্চ (১৯০৯) স্বামী সারদানন্দ জয়রামবাটী আসিয়াছেন। কালীমামা (শ্রীশ্রীমা'র মধ্যমভ্রাতা) তাঁহার নূতন বাটীতে যত্ন সহকারে মহারাজের থাকিবার স্থান করিয়া দিলেন। কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া জয়রামবাটীতে পৌঁছিতে যে খরচ হইয়াছিল, তাহার হিসাব একটী পাই পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া মহারাজ বলিলেন,—"খুচরা খরচ না লিখলেও চলবে—পারত থোক টাকার খরচটা লিখে রেখো, ইচ্ছা হলে দেখতে পারব কি বাবদে কত খরচ হ'ল।" কথাপ্রসঙ্গে সুধীর মহারাজের নিকট শুনিয়াছিলাম স্বামিজী নাকি খরচ সম্বন্ধে বলিতেন, একটি পাই পর্য্যন্ত হিসাব রাখবি। আর মঠে বিভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন তহবিল ছিল বলিয়া স্বামিজী সতর্কতার জন্য নাকি বলিয়াছিলেন,—"কখনও শাকের কড়ি মাছে মিশাবিনা, মাছের কড়ি শাকে মিশাবিনা।"

শরৎ মহারাজও হিসাব খুব পরিষ্কার রাখেন, শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার নিজের টাকা বলিয়াই বোধহয় তিনি ঐ প্রকার আদেশ করিয়া থাকিবেন।

স্বামী সারদানন্দ,

চিরদিন শরৎ মহারাজ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে জীবন যাপন করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিতেন। অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল।

জয়রামবাটীতে শরৎ মহারাজ সকালে উঠিয়া নদীর ধারে যাইতেন। রাস্তা চলিবার জন্য যে ক্লান্তি বোধ করিতেন তাহা নিত্যই শ্মশানের একটি বট গাছ-তলাতে বসিয়া দূর করিতেন। কোন কোন দিন গাছতলায় বসিয়া গুণগুণ করিয়া গাইতেন—'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই।' তারপর মুখাদি ধৌত করিয়া স্নান করিতেন,—সেই আমোদরের হাটু জলের ও কম জলে, আমি বালি সরাইয়া পুকুর করিতাম তিনি ঘটি ভরিয়া জল তুলিয়া মাথায় দিতেন। কাপড় ছাড়িয়া শ্মশানের উপরে একটি আমলকী গাছের নীচে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান করিতেন—আমি স্নান করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। যখন তিনি উঠিতেন আমি তাঁহার অনুসরণ করিতাম। বাড়ীতে আসিয়া মাকে প্রণাম করিতে যাইতাম এবং ফিরিবার সময়ে চায়ের দুধ চিনি লইয়া আসিতাম। শরৎ মহারাজ দ্বিপ্রহরে খাইতে যাইয়া মাকে প্রণাম করিতেন। চা'পান করিবার পরে তিনি লেখাপড়ার কাজ লইয়া থাকিতেন আমি বসিয়া বসিয়া গীতা পড়িতাম। একদিন মহারাজ বলিলেন—"শুদ্ধ উচ্চারণ করতে হবে—এসো, বলে দিচ্ছি।" গীতা হাতে লইয়া তিনি পঞ্চদশ অধ্যায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সম্পূর্ণ অধ্যায়ই পড়িলেন। বিদ্যায় আমি সরস্বতী, সুতরাং যা শিখিবার শরৎ মহারাজের কাছেই শুনিয়া

লইলাম। তিনি গীতার ব্যাখ্যাও দুইদিন করিয়াছিলেন। তারপরে বেলগের (ভাগ বাটোয়ারা) হাঙ্গামায় গীতাপাঠ বন্ধ রহিল।

সকালে জ্ঞানযোগ সম্পাদন (edit) করা কিংবা বিষয়ের কথা, দ্বিপ্রহরে খাইবার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, বিশ্রামান্তে হাতমুখ ধুইয়া পুনরায় লেখাপড়া করিতে বসা,—বৈকালে নদীর ধারে যাওয়া ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিয়া আসা, ইহাই ছিল মহারাজের সমস্ত দিনের কার্য্য। সন্ধ্যার পরে পাত্র পূর্ণ করিয়া চা করিতাম। তখন দলে দলে গ্রামের লোক আসিয়া কালী-মামার দাওয়াতে বসিত। যাহারা চা'পান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিত তাহাদিগকে দেওয়া হইত। এই সময় শরৎ মহারাজ বৃদ্ধ "মুখ্যের" (গ্রামের প্রধান) সহিত নানা রকম গল্প করিতেন। ঘণ্টা খানেক গল্প শুনিয়া যে যাহার বাড়ীতে ফিরিয়া যাইত। রাত ৯টার সময় তিনি আহার করিতে উঠিতেন।

শ্রীশ্রীমা দুই বেলা শরৎ মহারাজের জন্য কিছু কিছু রান্না করিতেন। ভক্তদের রান্না করিয়া খাওয়াইতে মা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। যখনই কোন ভক্ত জয়রামবাটী মা কে দেখিতে আসিতেন মা সেই সময় কিছু কিছু রান্না করিতেন। সকালে বাহিরের উনুন নিজেই মুক্ত করিয়া আমাদের জন্য মাছ রান্না করিতেন। পাড়াগাঁয়ে বৃষ্টি হইলে কি রকম কাদা হয়! মা অন্দরের সেই কাদা সকালে একখানা কাঠ দিয়া সমান (level) করিয়া দিতেন। এক-দিন মহারাজকে একথা বলিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে (জয়রামবাটীতে) মায়ের হাত থেকে কাজ টেনে নিয়ে করবেনা তাতে মামীদের অখ্যাতি হবে।" তাই নিতান্ত

অনিচ্ছাসত্ত্বেও না দেখি না দেখি করিয়া চলিয়া আসিতাম। মা স্বেচ্ছায় কাজ করিতেন। কাজ করিয়া চিরদিন আনন্দ পাইতেন। কাজ করিতে না পাইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। প্রথমদিন হইতে মা আমার সঙ্গে কথা বলিতেন। কিন্তু আমি একটু বোকা জানিয়াই বোধ হয় শরৎ মহারাজ মায়ের কাছে বোকার মত কোন কথা না বলিয়া ফেলি এজন্য মাঝে মাঝে উপদেশচ্ছলে আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেন। একদিন কিন্তু দেখিলাম আমারও 'দাদা' আছেন। একজন ভক্ত আসিয়াছে, মাকে দর্শন করিতে। আমি তাহাকে লইয়া গেলাম। সে প্রণাম করিয়া মায়ের শ্রীপাদ বক্ষে ধারণ করিবার জন্য কিছু না বলিয়াই পা খানা ধরিয়া এক টান দিল। ভাগ্যে মা বারান্দায় একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন নতুবা কি যে হইত! আমি যাইয়া ভক্তের হাত ধরিলাম। মা শান্ত ভাবে বলিলেন—"ছেলেটি বড় সরল।" ভক্তটিকে লইয়া বাহিরে আসিলাম। এবং যথাসময়ে শরৎ মহারাজকে সে ঘটনা নিবেদন করিলাম। তিনি কোন মন্তব্য না করিয়া শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামিজীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"যোগীন স্বামিজী কখন মাকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম কর্ত্তেন না। মা চলে গেলে সে স্থান হতে ধূলি নিয়ে মাথায় দিতেন।" যে ভক্ত মার শ্রীপাদ ধরিয়াছিল সে একথা শুনিতে পাইল না। শুনিলাম আমি। তাই মনে হইয়াছিল বোধহয় শরৎ মহারাজ আমার জন্য সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে আছেন পাছে আমি ঐরকম একটা কিছু করিয়া বসি।

একদিন ভিখারী আসিয়া গান ধরিল :—

"কি আনন্দের কথা উমে।
লোক মুখে শুনি সত্য বল শিবানী
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে॥
অপর্ণে তোমায় যখন অর্পণ করি
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
এখন নাকি তাঁর দ্বারে আছে দ্বারী
দেখা পায়না তাঁর ইন্দ্র, চন্দ্র, যমে॥
ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা আমার বলত দিগম্বরে
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে।
এখন নাকি তিনি রাজা কাশীপুরে
বিশ্বেশ্বরী তুই বিশ্বেশ্বরের বামে॥
হিমালয়ে বাস হর করিয়াছে
ভিক্ষায় দিন রক্ষা এমন দিন গেছে।
এখন কুবের ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে
ফিরেছে কি কপাল তোর কপাল ক্রমে॥
বিষয় বৃদ্ধি বটে বুঝিলাম মনে
তা না হলে গৌরীর এত "গৈরব" কেনে।
আপন সন্তানে না দেখে নয়নে
মুখ বাঁকায়ে থাকে শ্রীরাধিকার নামে॥"

শ্রীশ্রীমা বড় মামার বাড়ীতে থাকিতেন। সে বাড়ীর বাহিরে আসিবার দরজার পাশে দাঁড়াইয়া মা গান শুনিতে-ছিলেন। গানটি মাকে অবলম্বন করিয়া সুন্দর প্রযুক্ত হইতে

পারে। ঠাকুরকে ওদেশের প্রায় সকলে ক্ষ্যাপা বলিয়া জানিত।. গান শুনিয়া শরৎ মহারাজ বেশ আনন্দ বোধ করিলেন। 'এত গৈরব' কথাটি হাসিমুখে উচ্চারণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, 'এ গান পূর্ব্বে জয়রামবাটীতে আসিয়া শুনিয়াছিলাম।' গানটি কিন্তু দাশরথি রায়ের। কে একজন রাধিকা উহা বেমালুম নিজ নামে চালাইয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি ছাপার হরপে গানের ভনিতায় আছে—'মুখ বাঁকায়ে থাকে দাশরথির নামে'।

একদিন গোলাপ মা বাহিরের ঘরে আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বলিলেন—'জ্ঞান, ঠাকুরের কথা লিখেছে।' শরৎ মহারাজ বলিলেন,—কিহে কি লিখেছ নিয়ে এস, দেখাই যাক্। আমি নিবেদন করিলাম,—'ঠাকুরের বিভূতির কথা যা শুনেছি তা পয়ারে লিখেছি। দেখবার মত নয়।' শরৎ মহারাজ বলিলেন—'নিয়ে ত এস আগে তারপর দেখা যাবে।' একখানা খাতা আনিয়া মহারাজের সম্মুখে রাখিলাম। আমার লেখাগুলি মোটেই ভাল নয়। মহারাজ দেখিয়া বলিলেন—পড় শোনা যাক্। পড়া আরম্ভ করিলাম, দুইটি ঘটনা শুনিয়াই মহারাজ বলিলেন—'স্বামিজী বলতেন ও সকল বিভূতি ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণের জন্য প্রকাশ হয়েছিল। সুতরাং ও সকল কথা বলে কোন লাভ নাই বরং বলতে গেলে লোকে ভাববে গোঁড়ামি প্রচার করা হচ্ছে।' আমি চুপ করিয়া আছি। মহারাজ বলিলেন—তামাক খাওয়াবে না? আমি তামাক সাজিতে গেলাম।

মহারাজ তামাক খাইতেছেন। আমি তখন বলিলাম,—মহারাজ ঠাকুরের একখানা জীবনী আপনি লিখুন না—যাতে সকল ঘটনা একখানা বই থেকেই জানা যেতে পারে।

মহারাজ—লিখলেই হ'ল বুঝি! এরকম কাজ আদেশ না পেলে করা উচিত নয়। ঠাকুর যদি কখন আদেশ করেন তখন দেখা যাবে। তারপর বলিতে লাগিলেন, স্বামিজী সাহস করে কিছু লেখেন নি—কেউ লিখতে বললে, বলতেন,—শেষে কি শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ে ফেলব। আদেশ না পেলে—এ সকল কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। দিলে সে লেখায় কোন ফল হয় না।

এই বৎসরই শরৎ মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি 'আদেশের' কথা ভুলি নাই। তাই অনেক বৎসর পরে একদিন শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মহারাজ, আপনি কি আদেশ পেয়ে লীলাপ্রসঙ্গ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন?

শরৎ মহারাজ—তোমার তা জেনে কি হবে?

আমি আর কথা বলিতে পারিলাম না।

অন্য এক সময়ে উদ্বোধনে একজন সন্ন্যাসী লীলা-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোন বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়া কিছু বলিয়াছিলেন। অপর সন্ন্যাসী সে কথা শরৎ মহারাজকে যাইয়া জিজ্ঞাসু-ভাবে প্রশ্ন করিল—মহারাজ, সমাধির কথা যা আপনি লিখেছেন—তা অনুমানের উপরে লিখেছেন, না উপলব্ধি করে লিখেছেন?

শরৎ মহারাজ উত্তরে বলিয়াছিলেন—তাঁর আদেশে যা লেখবার

লিখেছি। তবুও আব্‌দারের সঙ্গে প্রশ্ন হইল—না আপনাকে বলতেই হবে।

তখন শরৎ মহারাজ বলিলেন,—যা কখন জানি না এমন কথা আমি কখন লিখি নাই। প্রশ্নকারী সন্ন্যাসী উত্তর শুনিয়া সুখী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াই যিনি সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাকে মহারাজের কথা বলিলেন। কথাটা সেইখানেই শেষ হইয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপলব্ধি বিষয়ে দুই দিনের কথা আজ স্মরণ হইতেছে :—(১) মহারাজের কাশীতে মহাবীর দর্শন (২) কাশীতে রামকৃষ্ণ উপদেশ দ্বিতীয়বার লিখিবার সময় একটা কথা মহারাজ লিখিয়াছেন কিন্তু ঠাকুর বলিয়াছিলেন—ও কথা আমার নয়। এই কথা মহারাজ একদিন আমাদের কাছেও বলিয়াছিলেন। কিন্তু মঠের একজন (যিনি এরকম মূর্ত্তি ধরিয়া ভগবান্ কখন আসিতে পারেন বলিয়া স্বীকার করেন না) মহারাজকে যখন ঐ দুই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—তখন মহারাজ বলিয়াছিলেন, —একজন বুড়ো বামুন রামনাম শুনতে আসত তাকে দেখে মনে হয়েছিল—ইনিই বা মহাবীর হবেন। ঠাকুরের কথায় বলিয়াছিলেন—যেন মনে হল ঠাকুর বলছেন—ও কথা আমার নয়।

হাজার বৎরের অন্ধকার ঘর একটা দেশ্‌লাইয়ে দপ্‌ করিয়া আলো হইয়া উঠে। ঋষি কেষ্টর দলের লোক—ঠাকুরের লীলা-সহচর, তাঁহার সমাধি হইয়াছিল ইহাতে সংশয় কিম্বা শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজের ঠাকুরকে সামনা সামনি দেখা বা তাঁহার মহাবীর দর্শনে সংশয় যাঁহারা করিয়া থাকেন—তাঁহারা

বোধ হয় পড়িয়াছেন—ঠাকুর স্বামিজীকেই বলিতেছেন,—'ওরে ছুঁয়ে দেখেছি,—কথা কয় যে!'

সকাল বেলা কামারপুকুর হইতে শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র, আমাদের রামলাল দাদা) জয়রামবাটী আসিয়াছেন। তখনও চৈত্র সংক্রান্তি আসিতে চারি পাঁচ দিন বিলম্ব আছে। শ্রীযুক্ত রামলালদাদা—শরৎ মহারাজকে দেখিয়া —'দাদাগো' বলিয়া উঠিলেন। মহারাজও 'দাদাগো' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—রামলাল দাদা আসিয়া বিছানার উপর দাঁড়াইতে মহারাজ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরে রামলাল দাদা ও মহারাজ উভয়ে উপবেশন করিলেন। নানা কথার পর স্থির হইল চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন মহারাজ কামারপুকুর যাইবেন এবং ২রা বৈশাখ জয়রামবাটী ফিরিয়া আসিবেন।

কথা প্রসঙ্গে শুনিলাম নবাসন নামে এক গ্রাম আছে—সেখানে শ্রীমৎ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর সহোদরা ভগিনী আছেন। সুতরাং নবাসনে যখন যাইতেই হইবে (ভক্তগণের নিমন্ত্রণে) তখন শশী মহারাজের ভগিনীর সহিতও মহারাজ দেখা করিয়া আসিবেন।

কামারপুকুর যাইবার পূর্ব্বদিন শরৎ মহারাজ আমোদর হইতে স্নান করিয়া অন্য রাস্তা দিয়া জয়রামবাটীতে আসিতেছেন। গ্রামে বাড়ীর সম্মুখ দিয়া রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে প্রতি বাড়ীর সম্মুখে গরু বাঁধা। মহারাজের পরিধানে গৈরিকবসন দেখিয়া গরুমাত্রেই চঞ্চল হইতেছিল। পশ্চাতে আমি সাদা কাপড়ে চলিয়াছি, কিন্তু হাতের লাঠি গাছটি বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়াছি। মহারাজের

ভ্রুক্ষেপ নাই একটানা চলিয়াছেন। হঠাৎ একটা গরু দূর হইতে দেখিতে পাইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছিল আর কাঁপিতেছিল। যখন মহারাজ সেই গরুর সম্মুখে আসিলেন তখন গরু দড়ি ছিঁড়িয়া মহারাজকে গুঁতাইবার জন্য খুব চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহারাজ অপ্রত্যাশিত ভাবে গরুর আস্ফালন দেখিয়া দাঁড়াইলেন। গরুটি ভীষণ চঞ্চল হইয়া বেশী বেশী ফোঁস্ ফোঁস্ আরম্ভ করিল,—দড়ি ছিঁড়ে আর কি !

মুহূর্তের মধ্যে লাঠি বাগাইয়া গরুর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম। মহারাজ স্থির ভাবে বলিলেন—'চলে এসো।' আমি বলিলাম 'শীগ্‌গীর যান।' গরুটি বলিষ্ঠও যেমন, ভয়ওপাইয়াছিল ততোধিক। কিন্তু তিনি নড়িলেন না।

ইতিমধ্যে সম্মুখে সাদা কাপড় দেখিয়া গরুটি একটু স্থির হইয়াছিল। তখনও মহারাজ দাঁড়াইয়া আছেন, এবং স্থিরভাবে বলিতেছেন—'চলে এসো।' আমি উপায় না দেখিয়া মিনতির ভাষায় বলিলাম,—আপনি যান, আমি যাচ্ছি। তখন তিনি অগ্রসর হইলেন। এবং আমি এক দৌড়ে আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'গরুটা দড়ি ছিঁড়লে কি করতে ?' আমার উত্তেজনা তখনও দূর হয় নাই সুতরাং বলিলাম,—এক ঘা বসিয়ে দিতাম।' তিনি বলিলেন,—'গরুটা যদি মরে যেত ?' মনে হইতেছিল,—'যেত ত যেত' কিন্তু সে কথা বলিতে পারিলাম না—চুপ করিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে শরৎ মহারাজ কালীমামার বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

যথা সময়ে চা পান করিবার সময় শরৎ মহারাজ আমাকে দেখাইয়া যোগীন মাকে বলিলেন, 'বীর পুরুষ, একটা গরু মারতে গিয়েছিল।' যোগীন মা, জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন— ওমা, সে কিগো ? শরৎ মহারাজ সমস্ত ঘটনা বলিলেন। যোগীন মা বলিলেন,—তা ও ছেলে মানুষ যা ভাল বুঝেছে করেছে, গরুটাকে তো আর মারে নি, তা হলেই হলো। শরৎ মহারাজ বলিলেন—'মারেনি সত্য কিন্তু গরুটা এগুতে গেলে কি যে হতো', বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল।

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ কামারপুকুর শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। শ্রীযুত রামলাল দাদা, পূজনীয়া লক্ষ্মী দিদি সে সময় কামারপুকুরে আছেন সুতরাং ঠাকুরের সময়ের কথায়, প্রথমদিন কাটিয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল শরৎ মহারাজ নবাসন গ্রামে বেড়াইতে যাইবেন। দ্বিতীয় দিন সকালে মহারাজ—রামলাল দাদা ও আমাকে সঙ্গে করিয়া নবাসন যাত্রা করিলেন। ঐ দেশে মনুমেণ্টের ন্যায় ইষ্টকনির্ম্মিত কতগুলি উচ্চ স্তম্ভ আছে, লোকে বলিয়া থাকে—গির্জ্জা। নবাসন গ্রামে ঐ রকম একটা গির্জ্জা আছে। মহারাজ বলিয়াছিলেন, রাজা টোডরমল্ল মোগল রাজত্বে জমি জমা-বন্দী করিবার জন্য প্রথমে ঐ গুলি নির্ম্মাণ করেন, পরে পাঠানেরা উৎপাত আরম্ভ করিলে শত্রু-গতি পর্য্যবেক্ষণের কেন্দ্রে পরিণত করা হইয়াছিল। এখন জনশূন্য, কেহ উহাতে থাকে না। সমস্ত দিন নবাসনে থাকিয়া বৈকালে মহারাজ কামারপুকুরে ফিরিয়া চলিলেন।

নবাসনে নানা কথার মধ্য দিয়া সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। ফিরিবার সময় শশীমহারাজের ভগিনীর বাড়ীতে শরৎ মহারাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তগৃহে অবেলায় খাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যখন শশী মহারাজের ভগিনী আসন পাতিয়া মুড়ি আনিয়া দিলেন—তখন শরৎ মহারাজ আনন্দ করিয়া মুড়ি খাইতে লাগিলেন। ভগিনীর অবস্থা ভাল নয়, পাছে তিনি দুঃখিতা হন, কিছু মনে করেন—তাই খাইলেন। নতুবা এমন অসময়ে তাঁহাকে কখন খাইতে দেখা যাইত না।

এইবার গ্রাম ছাড়িয়া রাস্তা ধরিয়া রামলাল দাদা চলিলেন। মহারাজ তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন। এই রাস্তার কিছু দূরে অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর সেই স্মরণীয় শৈলেশ্বর শিব মন্দির এখনও রহিয়াছে। কিছুদূর আসিতেই খুব জল আরম্ভ হইল। রাস্তার ধারে 'ডাকাতে কালী মন্দিরে' রামলাল দাদা মহারাজকে লইয়া দাঁড়াইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে জল থামিল, রামলাল দাদা সোজা অর্থাৎ মাঠের পথ ধরিলেন। মাঠের আলে শরৎ মহারাজ পা দিতেই জুতা শুদ্ধ পা কাদায় বসিয়া গেল। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—'রামলাল দার কাণ্ডখানা দেখ, ভোঁদা (মোটা) মানুষটিকেও এমন পথে আনে, এখন যে একেবারেই অচল।' অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলাম জুতা হতে পা বের করে নিন্! তিনি কথা শুনিয়া একবার চাহিলেন, পরক্ষণে পা বাহির করিয়া লইলেন। রাস্তায় আর তেমন অসুবিধা হয় নাই, তবে যেখানে যেখানে পা ফেলিয়াছিলেন, সেই মাটিতে বিলক্ষণ দাগ পড়িয়া-

ছিল। তেমন দাগ ঐ দেশের লোক চলিলে কখন হয় না। ওদেশে কখনও স্থূলকায় লোক দেখি নাই। ম্যালেরিয়াতে ভুগিয়া সকলের চেহারাই যেন 'ঠ্যাঙ্গাটা'। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহারাজ কামারপুকুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন চৈত্রমাস, গাজন চলিয়াছে। ঢাকের বাজনাতে আর মেঘের গর্জ্জনে মিশিয়া গুরুগম্ভীর শব্দে গ্রামখানা বেশ ভরিয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ হাত মুখ ধুইয়া বাহিরের ঘরে বসিলেন। এদিকে চা প্রস্তুত হইতে লাগিল। যথাসময়ে মহারাজ চা পান করিলেন। রামলাল দাদা বাড়ীর ভিতরে ছিলেন। সুযোগ দেখিয়া লক্ষ্মীদিদি তাঁর শরৎদার কাছে আসিয়া বসিলেন। যোগীন মা ও গোলাপ মা সেই বাহিরের ঘরে ছিলেন। যোগীন মা জিজ্ঞাসা করিলেন "লক্ষ্মি, খাজাঞ্চী কি বলেছিল? লক্ষ্মীদিদি শরৎ মহারাজের দিকে চাহিয়া জিভ্‌ কাটিয়া দেখাইলেন অর্থাৎ শরৎদার সামনে দুষ্টুমি? শরৎ মহারাজ দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—'লক্ষ্মি কি বলেছিল খাজাঞ্চী? আর যায় কোথায়—! তখন লক্ষ্মীদি উঠিয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খাজাঞ্চী কেমন করিয়া দাঁতন করে, কেমন করিয়া কথা বলে, রাগ হইলে কি বলে ইত্যাদি এমন সুন্দর নকল করিতেছেন যে মহারাজ মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলেন, এমন কি আঁচল দিয়া কাছা দিতেও লক্ষ্মীদি ভুলেন নাই। ইতিমধ্যে রামলাল দাদা—'দাদাগো কি হচ্ছে' বলিয়া ঘরে আসিলেন। লক্ষ্মীদি তৎক্ষণাৎ চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। যোগীন মা বলিলেন—দাদা একটা গান গাও। রামলাল দাদা আরম্ভ করিলেন,—

'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥' ইত্যাদি,

গান থামিতে—'দাদা আর একটী' বলিয়া যোগীন মা চাহিয়া রহিলেন। দাদা গাহিলেন,—

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)॥ ইত্যাদি

গান থামিতেই দাদা মহারাজকে বলিলেন 'এবার দাদার একটা হক্।' লক্ষ্মীদি বলিলেন—শরৎদার গান অনেক দিন শুনি নাই। এদিকে ঘরের মধ্যে ভজন হইতেছিল ওদিকে প্রকৃতি তাহার বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জনের দ্বারা প্রলয়ের গীত আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারই মধ্যে মহারাজ গান ধরিলেন,—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ-রাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহা-বাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে মহা নির্ব্বাণ-হিল্লোলে
চির-শান্তি-পরিমল অবিরত যায় ভাসি॥
মহাকাল রূপ ধরি আঁধার বসন পরি,
সমাধি-মন্দিরে মাগো, কে তুমি মা, একা বসি,
অভয়-পদ-কমলে প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখ মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥

গানটি দুইবার হইয়া শেষ হইল। গানের শেষ কলি, 'শোভে অট্ট অট্ট হাসি'র সহিত বাহিরের মেঘ গর্জ্জন মিলিত হইয়া অব্যক্ত আনন্দ-ধারাতে মনকে নাচাইয়াছিল

তেমন গান, তেমন মেঘ-গর্জ্জন আজও যেন শুনিতে পাইতেছি। শক্তিমান্ পুরুষের শক্তির ছাপ, সহজে মুছিবার নহে।

স্তম্ভের ন্যায় উপবিষ্ট আমাদের মধ্যে প্রথমে লক্ষ্মীদি বলিলেন দাদা, 'যশোদা নাচাত তোমায়' ঐগানটি গাওনা? কথা শুনিয়া চমক ভাঙ্গার মত শরৎ মহারাজ লক্ষ্মীদিদির দিকে চাহিলেন। লক্ষ্মীদি বলিলেন, 'যশোদা নাচাত তোমায়' ঐ গানটি। মহারাজ গাহিলেন,—

যশোদা নাচাত তোমায় বলে নীলমণি।
সেরূপ লুকালি কোথা করাল বদনী (গো মা)॥
ছিদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে (গো মা)।
তাথেয়া তাথেয়া থিয়া থিয়া থিয়া বাজিত নূপুর-ধ্বনি,
শুন্‌তে পেয়ে আসতো ধেয়ে ব্রজের রমণী (গো মা)॥
গগনে বেলা বাড়িত রাণী কেঁদে আকুল হ'ত।
(বলে) ধররে ধররে ধররে গোপাল ক্ষীর সর ননী,
এলায়ে চাঁচর কেশ (রাণী) বেঁধে দিত বেণী (গো মা)॥

গানটি শেষ হইল। ভিতর হইতে সংবাদ আসিল—প্রসাদ পেতে আসুন। লক্ষ্মীদিদি বলিলেন,—তা হবে'খন এখন গান শুন্‌তে দে। রামলাল দাদার মধ্যমা কন্যা কল্যাণীয়া রাধারাণী চলিয়া গেলেন। তখন শরৎ মহারাজ পিছন ফিরিয়া বলিলেন, তোমার কোন ফরমাস আছে নাকি? আমি দ্বিধা-শূন্য হইয়া বলিলাম—আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে!

তিনিও আরম্ভ করিলেন—

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
যেখানে যাই সে যায় সাথে,
আমায়' বলতে হয় না জোর করে॥ ইত্যাদি।

গান শেষ হইল। রামলাল দাদা বলিলেন, দাদাগো এবার গা তোল, প্রসাদ পাবে যে। মহারাজসহ আমরা বাড়ীর ভিতরে বসিয়া প্রসাদ পাইলাম। যখন আহার শেষ হইল তখন দেখিলাম আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। কাল-বৈশাখী এমনই হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ তিনরাত্রি কামারপুকুরে বাস করিয়া ২রা বৈশাখ জয়রামবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এখন হইতে মামাদের ভাগ বাটোয়ারার কাজ আরম্ভ হইল। জমিজমা মাপজোখ করাইবার জন্য কোয়ালপাড়া হইতে শ্রীযুত কেদারনাথ দত্তকে (স্বামী কেশবানন্দ) আনাইবার বন্দোবস্ত হইল। যথা সময়ে কেদার বাবু আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

নিত্য সকাল বৈকাল জমি মাপ চলিয়াছে। শরৎ মহারাজ সকাল বেলা চা পান করিয়া জ্ঞানযোগ সম্পাদন করিতেছেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মামারা, কেদারবাবু এবং গ্রামের অপর পাঁচজন আসিয়া শরৎ মহারাজের নিকটে বসিয়া গল্প করিতেন। সে সময় মহারাজের জন্য যে চা হইত তাহাতে বেশী জল দিতে হইত—যাহাতে উপস্থিত সকলেও চা পান করিতে পারেন। শরৎ মহারাজ সকলের সঙ্গে চা পান করিতেন ও প্রাণ খুলিয়া নানা রকম গল্প আরম্ভ করিতেন। রাত একটু হইতেই যে যাহার বাড়ীতে চলিয়া যাইত। তখন কেদার বাবু

মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ঠাকুর কল্পতরু হইয়াছেন এই প্রসঙ্গে একদিন শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—সেদিন ছিল ১লা জানুয়ারী! সকাল বেলা গিরীশ বাবু এলেন। অন্যান্য ভক্তেরাও একে একে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। আমি তখন ওখানে (কাশী-পুরের বাগানে) থাকতেম। হঠাৎ দেখি সেই শীর্ণ দেহ নিয়ে ঠাকুর (চটি) জুতা পায়ে দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন। তারপরে এসে বাইরের উঠানে দাঁড়ালেন। তখন একখানা জল-চৌকী এনে দেওয়া হ'ল, তিনি তার উপরে বসে পড়লেন। এরপর তাঁকে যাঁরা প্রণাম করলে তিনি তাকেই স্পর্শ কচ্ছেন। তার পর দেখ্‌তে পেলাম, কেউ হাস্‌ছে কেউ কাঁদছে কেউ চুপ করে বসে আছে। গিরীশ বাবু কোমরে কাপড় জড়িয়ে ছুটে রাস্তায় যাচ্ছেন আর যাকে পাচ্ছেন এনে ঠাকুরের কাছে হাজির কচ্ছেন, ঠাকুর ছুঁয়ে দিচ্ছেন, তারাও কেউ হাস্‌ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ চুপ করে বসে আছে। আমি তখন ঠাকুরের বিছানা রোদে দিয়ে—উপর থেকে সব দেখে যাচ্ছি।

এই পর্য্যন্ত কথা হইবার পরে কেদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কেন এলেন না সেখানে?' শরৎ মহারাজ—তখন যে তাঁর বিছানা রোদে দিতেছিলাম। কেদার বাবু—ও রকম দেখে আপনার যেতে ইচ্ছা হল না, মহারাজ? মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন—কখন তিনি উঠে আসবেন তাড়াতাড়ি বিছানা করতে হবে। কেদার বাবু বলিলেন,—যেতে আস্‌তে আর কত সময় লাগ্‌ত? এই

কথা শুনিয়া মনে হইল মহারাজ একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। পরে কথার ভঙ্গিতেও বুঝিলাম তাই। তিনি বলিলেন—'পাবার ইচ্ছা তো মনে আসেনি, তা ছাড়া তিনি যে আমাদেরই—ছিলেন।' দেখিলাম, 'আমাদেরই ছিলেন' এই কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কেদার বাবু আর কিছু বলিলেন না চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথের প্রকৃতিতে ছিল ঠাকুর ও শিষ্যগণের সংবাদ যতদূর সম্ভব জানিতে হইবে। এই জন্য তিনি সন্ধ্যার পরে আসিয়া শরৎ মহারাজের নিকট বসিতেন এবং কথা-প্রসঙ্গ তাঁহার অনুকূলে ঘুরাইয়া আনিতে সচেষ্ট থাকিতেন। এই কেদারনাথ কত প্রশ্নই না করিতেন। শরৎ মহারাজও যেখানে নিজের সংবাদ থাকিত না সেখানে উৎসাহের সঙ্গে সকল কথা বলিতেন। যেখানে তাঁহার প্রসঙ্গ আসিত সেখানে চুপ করিয়া থাকিতেন। কখনও কখনও উত্তর দিতেন কিন্তু সে প্রায় না দেওয়ারই সামিল। এ বিষয়ে শুধু শরৎ মহারাজই চুপ থাকিতেন তাহা নহে শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের শিষ্যগণকে এই সনাতন পন্থা অবলম্বন করিতে দেখা যাইত। প্রশ্ন করিলেই গোল হইত। স্বেচ্ছায় তাঁহারা যখন বলিতেন তখন কোন গোলই থাকিত না। সেদিন কেদারনাথ ঠাকুরের কল্পতরু হইবার কথা পাড়িয়াছিলেন—আজ প্রশ্ন করিলেন 'মহারাজ বিপদে পড়িলে আপনার মনের অবস্থা কেমন হয়?'

মহারাজ,—'বিপদে পড়িলে!' কথা শুনিয়া তিনি যেন আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

কেদার—সাধু-জীবনে, সাপ, বাঘ, জল-ঝড় কত কি আছে ?

মহারাজ—না বাপু সাপ বাঘের সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি, তবে জল ঝড়ে দুবার পড়েছিলাম। যেবার স্বামিজীর আদেশে বিলাত (ইংলণ্ড) যাই, সেবারে ভূমধ্য-সাগরে ঝড় উঠেছিল। জাহাজ এই ডোবে তো এই ডোবে, সমস্ত জাহাজে কান্নার রোল উঠল। আমি কিন্তু স্থির হয়েছিলাম।

এই ঘটনার বিষয় অযাচিত ভাবে অনেকবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। নিক্তির কাঁটা যেমন ওজন না থাকিলে কোন দিকে হেলে না, তিনি সেই ভাবে মনের তুলনা দিয়া বলিয়াছিলেন, ঝড় আরম্ভ হল ; জাহাজ এই ডোবে তো এই ডোবে। জাহাহাজশুদ্ধ সাহেব মেমের কান্না শুনতে পাচ্ছি কিন্তু মন তখন ছিল ঠিক নিক্তির কাঁটার মতন। অর্থাৎ মোটেই বিচলিত হয় নাই।

কেদারনাথ—আর একবার কোথায় ঝড়ে পড়েছিলেন ?

মহারাজ—কলিকাতা হতে মঠে যেতে গঙ্গায়। নৌকায় ডাক্তার কাঞ্জিলালও ছিল। মেঘ মাথায় করে দুজনে আহিরীটোলা ঘাট থেকে নৌকায় উঠলাম। নৌকায় উঠে কাঞ্জিলাল মাঝিদের তামাক সাজতে বললে, মাঝিরা তামাক সেজে থেলো হুকায় তামাক দিয়েছে। এমন সময় ঝড় উঠলো। প্রথমটা তত জোরে আসেনি, আমি তামাক টেনে যাচ্ছি, দেখতে দেখতে ঝড় ভীষণ জোরে এলো, নৌকায় জল উঠ্‌তে আরম্ভ হলো। দুঝল্‌কা জল নৌকায় উঠ্‌তে দেখে কাঞ্জিলাল চঞ্চল

হয়ে বললে—'আপনি দেখছি বেশ মজার লোক নৌকা ডুবছে আর আপনি বসে তামাক খাচ্ছেন,' বলেই একটানে কল্‌কেটাকে হুকার মাথা থেকে নিয়ে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আমি চুপ করে হুকা হাতে করে বসে রইলাম। এবার দু ঝল্‌কা জল নৌকায় এসে পড়তেই কাঞ্জিলালকে বল্‌লাম এবার হুকাটা ফেলবে নাত? কাঞ্জিলালের উত্তেজনা তখনও রহিয়াছে। সে একথার উত্তর না দিয়ে বললে,—এদিকে নৌকা ডোবে, আপনি বসে তামাক খাচ্ছেন। আমি তখন বললাম,—তামাক খাব না ত নৌকা না ডুবতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নাকি? কাঞ্জিলাল চুপ করে রইল। ঝড় ঝাপটার মধ্যে নৌকা এসে স্বামিজীর মন্দিরের চড়ায় লাগল, আমরা নেমে পড়লাম। কথাপ্রসঙ্গে শরৎমহারাজের মুখে এ গল্প আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। ঠিক এই কথাই।

কেদার 'মহারাজ! বরানগর মঠে দিন রাত আপনারা কি করিতেন?' শরৎ মহারাজ—কি আর করতেম, যথাসাধ্য চুপ চাপ বসে থাকতেম। কেদার দেখিলেন প্রশ্নটা ঠিক মত করা হয় নাই, সুতরাং এ যাত্রায় আর কিছু উত্থাপন করিলেন না।

কেদার বড়মামার বৈঠকখানায় উঠিয়া গেলেন। তখন যোগীন মা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—মহারাজকে সেই কাশ্মীর যেতে কি হয়েছিল বলতে বল না। তার অর্থ শরৎ তুমি সেই কাশ্মীর যাবার কথা ওকে বল। নতুবা কাশ্মীর যাইতে কি হইয়াছিল আমি কেমন করিয়া জানিব।

মহারাজ বলিলেন,—'সে বছর আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কাশ্মীরে যাচ্ছি। রাওলপিণ্ডি থেকে ডাক গাড়ীতে (টাঙ্গা) উঠ্‌লাম। তখন ডাক গাড়ী ছিল সস্তায় যাবার উপায়। গাড়ী যাচ্ছে। ঘোড়া বদল হচ্ছে, রাত কেটে গেল, সকালে আবার চলেছি পরদিন সকাল বেলা রাস্তার মোড় ঘুরতে ঘোড়াটা ভড়কে গিয়ে এক লাফ মারলে। তার পরে একেবারে ঘুরে ঘোড়াটা ঢালুতে নেমে যাচ্ছে। এ চলা বন্ধ হবার কোন উপায় নাই যখন শেষ হবে তখন কোচ্‌ম্যান, ঘোড়া, আমাদের কোন চিহ্নও থাকবে না। ৪।৫ হাজার ফিট নীচে এসে পড়তে হবে। কি আর করি, চুপ করে বসে আছি, মন ঠিক নিক্তির কাঁটার মত শান্ত হয়ে আছে। হঠাৎ দেখতে পেলাম প্রকাণ্ড একখানা পাথর গাড়ীর ধাক্কায় গড়াতে গড়াতে আমাদের পিছু পিছু নাব্‌ছে। গাড়ী নিয়ে ঘোড়া নাব্‌ছে আগে—পেছনে আসছে পাথরখানা সশব্দে —এমন সময় একটা পুরাণ গাছের গুঁড়িতে এসে ঘোড়াটা আড় হয়ে আটকে গেল। গাড়ীখানা ঐ ভাবে হঠাৎ থামতে কোচম্যান ও মেল ব্যাগ ছিট্‌কে নীচে পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। এমন সময় পাথরখানা এসে মারলে ধাক্কা ঘোড়াটাকে। একদিকে প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আর এ দিক থেকে আস্‌ছে পাথরখানা। এই চাপে তখুনি ঘোড়াটা মরে গেল। গাড়ী থেকে না নেমে যদি বসে থাকতেম তো কোনই গোল ছিল না, তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পায়ে বিলক্ষণ লেগেছিল কিন্তু সে কথা ভাববার সময় তখন ছিল না।

'ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে দেখি কোচম্যান অজ্ঞান হয়ে আছে।, একটু নাড়া চাড়া দিতেই চোখ মেলে চাইলে। তখন তাকে সকল কথা বল্লাম। সে আমার কথা শুনে খুসীই হলো। তারপর সে উঠল। আমরা প্রায় ২ হাজার ফিট নেমে এসেছিলাম। সেই পথ সে কষ্ট করে উঠে নিকটে লোক পেয়ে সামনের গাঁয়ে সংবাদ পাঠিয়ে দিলে। সেখান থেকে ঘোড়া এলো, টাঙ্গা এলো। লোক জন এসে মেল ব্যাগ তুলে এনে টাঙ্গায় তুললে, আমিও এসে গাড়ীতে বসে পড়লাম। ইহারপরে রাস্তায় আর কোন বিপদ ঘটে নাই।'

যোগীন মা—মাগো! গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটা আটকে না গেলে কি হতো গো!

মহারাজ—যা হতো তাত বুঝতেই পাচ্ছ। কিন্তু তা হয়নি। কথা যেমন শেষ হইল, অমনি বড় মামার বালক-ভৃত্য বলিল, —আপনারা খেতে যাবেন যে।

মহারাজ উঠিলেন।

এতদিন ধরিয়া জমি-জমা মাপ হইতেছিল এইবার দলিলের সহিত জমির পরিচয় হইবে। দলিল সকলই কালী মামা হস্তগত করিয়া বসিয়া আছেন। বড়মামার মনোগত ভাব যে দলিল তাঁহার জিম্বায় থাকে। কালীমামা তাহাতে নারাজ।

দলিল বিভাগ উপলক্ষে সেদিন মহারাজ কালীমামার বাড়ীর ভিতরে যাইয়া বসিলেন। হঠাৎ দেখি মহারাজ ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি নিকটে

আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"আমার সঙ্গে এসো খুব সতর্ক থাকবে যেমন বলব তেমনি কাজ করবে কিন্তু।" 'চলুন' বলিয়া আমি শরৎ মহারাজের অনুসরণ করিলাম। তিনি উত্তরের ঘরের বারান্দায় একখানা মাদুরের উপরে যাইয়া বসিলেন। আমি বড়মামার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলাম—মহারাজ আমায় বসিতেও বলিলেন না। একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র।

দেখিলাম—লোহার সিন্দুক খুলিয়া দলিল সহ কালীমামা বারাণ্ডায় আসিলেন এবং সমস্ত দলিলগুলি মহারাজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মহারাজ দলিলগুলি কালীমামার সাহায্যে দেখিতে লাগিলেন। স্থির ছিল, যতদূর সম্ভব জমির সহিত দলিলও ভাগ হইবে। ইতি মধ্যে যোগীন মা আসিয়া বলিলেন,—"শরৎ, এসো, মা তোমায় ডেকেছেন।" মায়ের নাম শুনিয়া মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বড়মামাকে বলিলেন—"দলিলে হাত দিবেন না বড়মামা, যেমন আছে থাক্, আমি এসে দেখবো।" কিন্তু চক্ষু ছিল আমার উপরে। বুঝিলাম একথার অর্থ কি। কিন্তু বড়মামা দলিলে হাত দিলে তখন কি যে হইবে ভাবিয়া মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহারাজও যেমন চলিয়া গেলেন বড়মামাও কথায় কথায় অমনি কালী মামার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। শেষ 'দিবুনি দলিল' বলিয়া চক্ষুর নিমেষে সমস্ত কাগজ হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন পথ রুদ্ধ। বড়মামা কাতর কণ্ঠে বলিলেন 'বাবু পথ ছাড়,

যেতে দাও।' তার পরে দুই ভাইয়ে দলিল লইয়া টানাটানি যাহা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে নিত্য হইতেছে তাহা বলিয়া আর কি হইবে।

গোলমাল শুনিয়া শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই আমাকে এক ভীষণ ধমক 'দাঁড়িয়ে কি দেখছ?' সে ধমকে বড়মামা বসিয়া পড়িলেন কালীমামা যাইয়া যথা স্থানে বসিলেন—বড়মামা দলিলগুলি মহারাজের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

এমনই ব্যাপার প্রায় ঘটে ঘটে করিয়া ঘটিতে পারিত না। লোক জন আসিয়া পড়িত। কিন্তু মামাদের এ সমস্ত বিরোধের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমা ধীর স্থির আছেন—আর আছেন শরৎ মহারাজ।

এই সময় একদিন কথা প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিলেন,—"আমাদের ত দেখছ কেউ ত্রিশবছরের সাধু কেউ পঁচিশ বছরের সাধু—পান থেকে চুণ খসলে চটে আগুন হই। কিন্তু মা কি কচ্ছেন—দেখতে পাচ্ছ? তাঁরই ভায়েরা কি কাণ্ডখানাই না কচ্ছেন। মা কিন্তু যেমন তেমনটিই—ধীরস্থির আছেন।" অতি সত্য কথা। নিত্য দেখিতাম ছল ছুঁতা ধরিয়া একটা কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। আর মা, তিনি যেন সে বাড়ীতেই ছিলেন না. এমন ছিল তাঁহার ভাব।

মানুষের মন আদর্শ পাইলেই অলক্ষ্যে অপরকে সে আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। আমাদের আদর্শ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা। ঠাকুরকে দর্শন করিবার

সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে মাকে দেখিবার সৌভাগ্য যতটা লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে মনে হইত সঙ্ঘ পরিচালনে যে ধৈর্য্য, সহানুভূতি ও আন্তরিক অনুকম্পা আমরা শরৎ মহারাজে দেখিয়াছি, ইহা তিনি মায়ের আশীর্ব্বাদেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সেদিন মহারাজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা কিছু পূর্ব্বে বৈকালে নদীর ধারে গিয়াছেন। নদীর অপর পারে মাঠে কতকগুলি সাঁওতাল দাঁড়াইয়া কুৎসিৎ অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছিল। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালের কুৎসিৎ মত্ততা দূর হইল। পলকের মধ্যে সকলেই ধনুতে তীর যোজনা করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিতে অগ্রসর হইতেছিল। কি সুন্দর শৃঙ্খলা— চমৎকার আক্রমণ পদ্ধতি! ঐ দৃশ্য দেখিয়া ধীরে ধীরে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহারাজ এদেশের ভাগ্যে এত থাকতেও তার পরাধীনতা ঘোচেনা কেন? ধীর গম্ভীর ভাবে তিনি বলিলেন—"সেই একজন লোকের অভাবে, যে সমস্ত জাতের টিকি একসঙ্গে বাঁধতে পারবে" এই কথা যেমন বলিতেছেন তেমন 'বাঁধতে পারবে' বলিবার সময় বাঁ হাতখানা দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেখাইলেন কেমন করিয়া একসঙ্গে টিকি বাঁধিতে হইবে।

মামাদের ভাগ বাটোয়ারার সালিশ ছিলেন—(১) স্বামী সারদানন্দ (২) শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (তাজপুর) (৩) শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র রায় (জিবটা)। যথা সময়ে সালিশী রোয়দাদ্ লেখাপড়া আরম্ভ হইল—তাজপুরের সারদা বাবু মামাদের

দিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—তিনি কোন্ ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করেন। মা উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন,—ঠাকুর বলতেন—'ইঁদুর গর্ত্তকরে—সাপ সেই গর্ত্তে থাকে।' সারদা বাবু সে কথা শুনিয়া পুনরায় মামাদের দিয়া মাকে বলিয়া পাঠাইলেন—প্রসন্ন, কালী, প্রভৃতির ঘর, বাড়ী, জমিজমা যখন ভাগ হইতেছে তখন তাঁহার (মায়ের) জন্য কোন ঘর নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে—মা কেমন করিয়া জয়রামবাটী থাকিবেন ? মা বলিয়া পাঠাইলেন,—'দুদিন প্রসন্নের ঘরে, দুদিন কালীর ঘরে থাকব।' সারদা বাবু আর প্রশ্ন করিলেন না। মা যে ঘরে থাকিতেন তাহা প্রসন্ন মামার ভাগে ফেলিয়া দিলেন।

সালিশদের লেখাপড়া হইয়া গেল। ভাল একদিন দেখিয়া কোতলপুরে যাইয়া দলিল রেজেষ্টারী হইল। তারপর মামারা দলিল অনুসারে জমি ভূমির দখল লইলেন।

শ্রীশ্রীমা কলিকাতা আসিবার ইচ্ছা যোগীন মা ও গোলাপ মার কাছে ব্যক্ত করিলেন। শরৎ মহারাজ যাত্রার দিন স্থির করিলেন—মা সেদিন যাইবেন সম্মতি দিলেন।

ইং ২১শে মে শুক্রবার চারিখানা গাড়ী আসিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা যাত্রা করিলেন। রাস্তায় পথভুল হওয়ায় রাত্রি ১০টার সময় কোয়ালপাড়ায় এক মন্দিরের সম্মুখে গাড়ী আসিতেই শরৎ মহারাজ গাড়ী থামাইতে বলিলেন। গাড়ী থামিল। রাত্রের আহারাদি মন্দিরের বারাণ্ডায় বসিয়া সমাধা হইল—তারপর গাড়ী চলিতে লাগিল। সকাল প্রায় ৮টার সময় গাড়ী আসিয়া জয়পুরে দাঁড়াইল। এখানে স্নানাহার করিয়া

গাড়ীতে উঠা গেল। এইখান হইতে বিষ্ণুপুরের বন (জঙ্গল) আরম্ভ। এস্থানের দৃশ্য বড়ই সুন্দর !

জয়পুর হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনী অসহ্য হওয়ায় নামিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। মাকুর ও (মায়ের ভাইঝি) তেমনই অবস্থা। সুতরাং সে ও আমি মায়ের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। মাকুর বয়স তখন ১০ বৎসর তবুও এতটা পথ সমভাবে হাঁটিয়া আসিতে লাগিল। রাধু (মায়ের ভাইঝি) তখন ছোট ছিল, তাহাকে রাস্তার ধারের গাছ হইতে কুর্চ্চি ফুল তুলিয়া দিতেছিলাম। বিষ্ণুপুরে আসিয়া পৌঁছাইতে সন্ধ্যা হইল, মাকুও গাড়ীতে উঠিল। আমি একটা দোকানের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া জিনিষ কিনিতেছিলাম ; ইতিমধ্যে যে চারিখানা গাড়ীই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে সে দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। ফিরিয়া দেখি গাড়ী কোথাও নাই, তখন মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। একে নূতন দেশ, পথ-ঘাট জানা ছিল না, তার উপর বাক্সের চাবি আমার কাছে রহিয়াছে। যে চারিখানা গাড়ীর কথা বলিয়াছি উহার এক খানাতে মা, রাধু ও মাকু, দ্বিতীয় খানাতে যোগেন মা ও গোলাপ মা, তৃতীয় খানাতে শরৎ মহারাজ একা আছেন চতুর্থ খানাতে আছি আশুতোষ নামক জয়রামবাটীর একজন ভক্ত ও আমি। এমন অবস্থায় পড়িয়া গাড়ী খুঁজিতে না যাইয়া একেবারে ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। ষ্টেশনে আসিয়া বসিয়া আছি কিন্তু মহারাজদের গাড়ী আর আসে না।

প্রথম ঘণ্টা বাজিল। আমি ৬ জন কুলি লইয়া যেখানে গরুর গাড়ী আসিয়া থামিবে সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল্লাম। অল্পক্ষণ পরে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিলাম,—"আশুবাবু!" আমার শব্দ শুনিয়া গোলাপ মা—'কোথায় ছিলে' বলিয়া আর কি বলিতে যাইতেছিলেন, তখন শরৎ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন—"এখন থাম" গোলাপ মা থামিয়া গেলেন। কুলির মাথায় মাল দিয়া আমরা ষ্টেশনে আসিলাম। টিকিট লইয়া ফিরিতেই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রের গাড়ী মাত্র দুই মিনিট বিষ্ণুপুরে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি মাকে এমন এক গাড়ীতে (Inter class) তুলিতে হইল যে গাড়ীতে একজন অতি বৃদ্ধ পশ্চিম দেশীয় মুসলমান ও তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু আমিও নিরুপায়। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি দেখিলাম মহারাজ গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। তিনিই প্রথম কথা বলিলেন,—এবার হাত মুখ ধুয়ে ফেল, খাবে না ? আমি বলিলাম—গড়বেতা (Watering station) গাড়ী ১০ মিনিট দাঁড়ায়, মাকে ভিন্ন গাড়ীতে তুলে দিতে হবে,—বলিয়া সমস্ত অসুবিধার কথা নিবেদন করিলাম। যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া গড়বেতা থামিল। গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া মাকে ভিন্ন গাড়ীতে আনা হইল, সে গাড়ীতে অপর কোন স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত ছিল না।

ফিরিয়া আসিয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলাম। সে সময় শরৎ মহারাজ তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া অপর শ্রেণীতে

চলিতেন না। আমাকে দেখিয়া শরৎ মহারাজ কমণ্ডলু হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিলেন,—জল দিচ্ছি হাত, মুখ ধোও। একি প্রমাদ! কিন্তু সে কথা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। হাত মুখ ধৌত করিয়া যখন বসিলাম তখন মহারাজ বলিলেন, তুমি বস আমি দিচ্ছি। তারপর আমার সম্মুখে শাল পাতা পাতিয়া দিলেন, লুচি, তরকারী ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন। বিলক্ষণ ক্ষুধা পাইয়াছিল, তবুও কতকটা সঙ্কুচিত ভাবে আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। জয়রামবাটী এক সঙ্গে থাকিবার ফলে ভয় অনেকটা দূর হইয়াছিল সত্য কিন্তু যখনই মনে হইত 'অত বড় পুরুষ, ভীষণ গম্ভীর' তখনই সহজ ভাব রক্ষা করা দায় হইত। বলবান্ বলিয়া আমারও অপবাদ ছিল সুতরাং সহজে দমিবার পাত্র কোন দিনই ছিলাম না। মহারাজকে দেখিয়া যে কেমন হইতাম উহার জন্য তাঁহার গাম্ভীর্য্যই দায়ী ছিল। তিনি নিজে কিন্তু অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ ছিলেন। আহার শেষ হইল, তিনি একটি পান দিলেন। এইবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি তিনি যেন কি বলিবার জন্য একটু হাসি মুখ করিয়াছেন। দেখিয়াই বুঝিলাম এইবার ঠাট্টা সহ্য করিতে হইবে। তাই আমিই প্রথমে অভিযোগ আনিলাম—আমাকে ফেলিয়া আপনারা গাড়ী চালাইলেন কেন? তিনি সামান্য হাসিয়া বলিলেন,—'কে জানে বাপু! তুমি যে পথ হারাবে তাকি কখনও জানতাম।' শরৎ মহারাজ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। নতুবা আমার অবস্থার জন্য খুব হাসিতে পারিতেন। তিনি অল্প অল্প হাসিয়া

ছিলেন। আমি কিন্তু সে হাসিতে লেশ মাত্র অবজ্ঞার চিহ্ন দেখিলাম না।

পরের দিন সকালে ২৩শে মে রবিবার ১৯০৯ খ্রীঃ শ্রীশ্রীমা উদ্বোধন বাটীতে প্রথম শুভাগমন করিলেন। সেই দিন উদ্বোধনে থাকিয়া পরদিন মঠে ফিরিয়া আসিলাম। মঠে ফিরিবার ২।৩ দিন পরে শরৎ মহারাজ মঠে আসিলেন এবং বাবুরাম মহারাজের নিকট মায়ের আগমন প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরে আমার পথ হারাইবার কথা বলিয়া দিলেন। বাবুরাম মহারাজ বেশ আনন্দ অনুভব করিলেন এবং বারংবার পথ হারাইবার কথা উল্লেখ করিয়া বালকের ন্যায় হাসিতে লাগিলেন। ধীর গম্ভীর শরৎ মহারাজকে বালকের ন্যায় রঙ্গপ্রিয় দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। আমি আর সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না,—যত গোল তো গাড়ী না থামাইয়া আপনিই বাধাইয়াছিলেন।

আমরা নানাভাবে স্বামী সারদানন্দকে দেখিয়াছি। তাঁহার বাল্য-জীবনের অনেক কথাই শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া হঠাৎ তাঁহার জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল কিংবা তিনি 'নিত্য সিদ্ধ' হইয়াই জন্মিয়াছিলেন এই উভয় ভাবের কথাই অনুমান-সাপেক্ষ। তাই পাঠকগণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তাঁহার বাল্য-জীবনের আলোচনা করিব, যাহা পাঠ করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি বাল্যের সদ্‌গুণের 'পুঁজি' লইয়া পুরুষকার সহায়ে অগ্রসর হইতে পারিয়া-

ছিলেন বলিয়াই—তাঁহার ভাবী জীবন এত উজ্জ্বলশ্রী ধারণ করিয়াছিল।

স্বর্ণ-প্রসূ বঙ্গভূমিতে শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) সন ১২৭২ সালের (ইং ১৮৬৬) ৭ই পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম নীলমণি দেবী। কলিকাতা মহানগরী ইঁহার জন্মস্থান। বর্ত্তমান হ্যারিসন রোড ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলেই গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিজ বাটী। কিন্তু ইঁহাদের আদি বাড়ী ছিল ইছাপুর (মেদিনীপুর) গ্রামে। খানাকুল কৃষ্ণনগর নামে যে প্রসিদ্ধ গ্রাম তাহা ও ইছাপুর —যেন এক গ্রামের এ পাড়া ও পাড়া। তাহাছাড়া ঐ দেশের লোকও ইছাপুর বলিয়া যে পৃথক গ্রাম আছে তাহা জানিত না। সুতরাং সাধারণে ইছাপুরকে খানকুল কৃষ্ণনগর নামেই অভিহিত করিত। ইছাপুর গ্রাম ঘাটাল সবডিভিসনের অন্তর্গত।

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট আমরা তাঁহার বাল্য-জীবনের ঘটনা জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া পত্রে যাহা জানাইয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

"ভর সন্ধ্যার সময় শরতের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনেকেই তখন বলিয়াছিল—এ ছেলে ভাল হইবে না।

"তিন কন্যার পরে শরৎ প্রথম ছেলে বলিয়া খুব আদরের ছিল। তিন চারি বৎসর বয়স হইতে ঠাকুরের (গৃহ দেবতা)

ভক্ত ছিল। এইজন্য শরতকে এক সেট্ পূজার বাসন দেওয়া হইয়াছিল। বালক সেই বাসন লইয়া প্রত্যহ পূজার খেলা করিত। পূজাই তাঁহার খেলা ধূলার সামিল হইয়াছিল। ৭।৮ বৎসর বয়সে একবার কঠিন রক্ত আমাশয় হইয়াছিল, বাঁচিবার আশা ছিল না, সেই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পরে ঘরে থাকিতে আর কোন কঠিন অসুখ হয় নাই। ১৩ বৎসরে উপনয়ন হয়, তখন হইতে বহুদিন শরৎ গৃহ দেবতার পূজা, আরতি নিজে করিয়াছে।

"বাল্যকাল হইতে পিতা-মাতার উপর খুব ভক্তি ছিল। প্রকৃতি বরাবরই খুব ঠাণ্ডা ছিল। কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিত না। শরৎ এলবার্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিত। প্রত্যহ স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাহা জল খাবার থাকিত তাহা ছাড়াও খানিকটা কপি সিদ্ধ বা আলু সিদ্ধ এমন কি কতকগুলি উচ্ছে পোড়াইয়া খাইয়া আনন্দ পাইত। ঐ সকল জিনিষ ভাই ভগিনীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইত। ভেটকী মাছ খুব ভাল বাসিত ও উহার নাম দিয়াছিল,—উত্তম মাছ। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা খুব করিতে পারিত। সেবা করিতে শরৎ ভাল বাসিত। একবার আমাদের পাশের বাড়ীর ঝির খুব ভেদ বমি হয়। বাড়ীর কর্তা ঝিকে খোলা ছাদের একধারে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। শরৎ তাহা দেখিতে পাইয়া নিজ হাতে বাহ্য বমি মুক্ত করিয়া সমস্ত রাত তাহার পাশে বসিয়া সেকৃতাপ দিয়াছিল। পরদিন সকালে সেই

ঝির মৃত্যু হইল। শরৎ তখন বৈষ্ণব ডাকিয়া আনিয়া অনাথার সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

"ছেলে বেলা হইতে দীন দুঃখীর প্রতি তার একটা স্বাভাবিক মমতা ছিল। কেহ কষ্ট জানাইলে যথাসাধ্য তাহাকে কিছু না কিছু দিতই।"

বাল্যকালের কথা বলিতে যাইয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, —"নিত্য ব্যায়াম করিতাম। মুগুর ভাঁজাই ছিল প্রধান ব্যায়াম। সে মুগুর এক একটি ওজনে ছিল পঁয়ত্রিশ সের করিয়া। একটা পাঁঠার অর্দ্ধেক ছিল আমার ভাগে। শুধু পাঁঠা কেন, বাড়ীতে যা রান্না হত তার অর্দ্ধেক আমার জন্য থাকৃত বাকি অর্দ্ধেক সকলে মিলে খেত। কোন হিতকর কার্য্যেই বাবা কখনও বিরোধী হন নাই। বরং সমধিক উৎসাহী ছিলেন। আমরা সকলে মিলে পাড়ায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করি। এই সমিতির সভ্যগণকে সৎচর্চ্চা সংগ্রহের আলোচনা, রোগীর সেবা, শারীরিক বল বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম করতে হত। শশী মহারাজ এই সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। কথার সত্যতা রক্ষার উপরে তাঁহার খুব আঁট ছিল। আমরা কথা দিয়া কখন কথা খেলাপ কর্‌তাম না। একবার আমাদের সমিতির বার্ষিক আনন্দোৎসব উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীতে গমন করি। সেইদিন প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করি। তারপর যখন সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে পড়তাম, তখন নিয়মিত রূপে যাতায়াত আরম্ভ কর্‌লাম। শশীও যাইতেন। কিন্তু তখন শশী না জান্‌তে পারেন এই ভাবে আমি লুকাইয়া ঠাকুরের কাছে যেতাম, শশীও ঠিক এই

ভাবে যেতেন, যাহাতে আমি না জানিতে পারি। অনেক দিন পরে একদিন ঠাকুরের কথায় জান্‌লাম, আমরা উভয়েই ঠাকুরের নিকট এসে থাকি।

"ঠাকুরের সহিত পরিচিত হবার কিছুকাল পরে ঠাকুর স্বামিজীর কথায় বললেন, ঐযে বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, নরেন! তাকে চেন? তার মত ছেলে হয় না। এই ভাবে ঠাকুর ক্রমাগত নরেনের কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন আমি নরেনকে চিনি না, তখন তিনি নরেনের বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলেন।

"আমি স্বামিজীর সহিত যথা সময়ে দেখা করলাম। দেখেই ঠাকুরের সেই কথা মনে হল 'খাপখোলা তরোয়াল।' তারপর একদিন যখন ঠাকুরকে বল্‌লাম—নরেনের সঙ্গে দেখা করেছি এবং নানা কথার মধ্যে যখন ঠাকুর বুঝ্‌লেন শুধু দেখা নয় বেশ ভাবও হয়েছে, তখন হেসে বলেছিলেন,—গিন্নি জানে কোন হাঁড়ির মুখে কোন সরা রাখতে হয়।"

এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিয়াছেন—রাত ১টা বেজে যেত, তখনও রাস্তায় বেড়াচ্ছি। একবার স্বামিজী আসতেছেন আমাকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিতে। বাড়ীর দরজায় এসে আমি চললাম তাঁকে পৌঁছে দিতে, এই ভাবে রাত বেড়ে যেত। শেষ আমিই তাঁকে বাড়ীতে রেখে ফিরে আস্‌তাম। স্বামিজীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই বুঝেছিলাম যতই স্বামিজী আমাদের সঙ্গে সমভাবে মিশুন না কেন, তিনি মানুষের মধ্যে পুরুষ-সিংহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাবসানের পর বরানগরে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ

মঠের প্রতিষ্ঠার সময় শরৎ মহারাজ ডাক্তারী (Medical College) পড়িতে ছিলেন। সে বৎসর ডিসেম্বর মাসে শ্রীমৎ স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ সহ বাবুরাম মহারাজের জন্মভূমি আঁটপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজও সেই সঙ্গে ছিলেন। প্রথম রাত্রিতে ধূনি জ্বালিয়া স্বামিজী ক্রমাগত যীশুখৃষ্টের বিষয় বলিতে লাগিলেন। রাত্র বেশী হওয়ায় যখন আলোচনা থামিয়া গেল তখন স্বামিজী বলিলেন এত ঠাকুর দেবতা থাকৃতে কেন যে আজ যীশুখৃষ্টের আলোচনা হল—কি বল! কিন্তু সে রাত্রে কেহই সে প্রশ্নের কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারিলেন না। পরদিন জানা গেল, গত রাত্রি (Christmas Eve) যীশুর জন্মিবার পূর্ব্ব রাত্রি ছিল, সুতরাং অজ্ঞাতসারে ঐ প্রকার আলোচনা করিবার প্রবৃত্তিকে (Inspiration) প্রেরণা ভাবিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন।

আমাদের কিন্তু মনে হয় ভগবান্ যীশুখ্রীষ্টের আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ প্রভুর পূর্ব্বকার আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিলেন ;— Follow me and I will make you fishers of men (১) নতুবা কলিকাতায় ফিরিবার অল্প সময় পরেই তিনি বরানগর মঠে যোগদান করিবেন কেন ?

তিনি তো ডাক্তার হইবেন বলিয়াই নূতন উদ্যমে পড়া শুনা করিতেছিলেন। কেহ তাঁহাকে পড়া ছাড়িতে বলেন নাই, বা কেহ তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেও উৎসাহিত করেন

---

(১) আমার অনুগমন কর—আমি তোমাদের মানুষ ধরিবার জেলে করিয়া লইব।

নাই। স্বামিজীর ঐ দিনের আলোচনা প্রসঙ্গে নিশ্চিতই এমন কিছু ছিল যাহাতে আত্ম-বিস্মৃত শরচ্চন্দ্রের ভ্রান্তি দূর করিয়া আত্মানুসন্ধানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়াছিল।

আটপুরের উৎসব-আনন্দ গত হইল। শরৎ মহারাজ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার নিকট কলেজে যাওয়া বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। ঠাকুরের নিষেধসূচক কথা শুনিয়াও যিনি চিকিৎসা-বিদ্যা উৎসাহের সঙ্গে শিখিতেছিলেন, তিনি আর কলেজে যাইতে পারিলেন না। ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে?

একদিন ঘরের কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে পরিধানে মাত্র একখানা কাপড়, নগ্নপদে শরৎ মহারাজ বরানগরের মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের শিষ্যগণ 'গুরু মহারাজজীকী জয়' বলিয়া নবাগতকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামী সারদানন্দ এই ভাবে গৃহত্যাগ করিয়া মঠবাসী হইলেন। শরৎ মহারাজের খুল্লতাত-পুত্র স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার পূর্ব্বেই মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। বয়সে শশী মহারাজ শরৎ মহারাজের বড় ছিলেন।

সন্ন্যাস-জীবনের সার্থকতা যাহা উপলব্ধি সহায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার মূলে প্রবল তপস্যা ও তীব্র বৈরাগ্য নিশ্চিত থাকিবে। স্বামী সারদানন্দের সন্ন্যাস জীবনের প্রথম অধ্যায় যখন জানিতে পারিয়াছি তখন পাঠকগণও দেখিতে পাইবেন, শক্তিমন্ত্রের একনিষ্ঠ সিদ্ধ সাধক কি ভাবে সাধনা করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের উপযুক্ত সন্তান হইয়াছিলেন।



১ম লাইন—স্বামী শিবানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, পাচক ব্রাহ্মণ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাষ্টারমহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতিত, তারাপদ মুস্তফী
২য় লাইন—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, গোপাল, স্বামী অভেদানন্দ

বলে দাঁড়ালেম, শব্দ শুনে ভিতর থেকে একটি বর্ষিয়সী মহিলা এসে আমার বলিষ্ঠ দেহ দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন,—"এমন গতর রয়েছে ভিক্ষা করে খাচ্ছ কেন—ট্রামের কণ্ডাক্টারী কর্ত্তে পার না ?" এই কথা বলেই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

একদিন বরানগর মঠ হইতে স্বামিজীর নির্দ্দেশে শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ (শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী) ও ত্রিগুণাতীত স্বামী পদব্রজে নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। রাস্তায় ত্রিগুণাতীত স্বামী কি উপায় "পিত্তি রক্ষা" করিয়াছিলেন, সেই কথা শরৎ মহারাজের কাছে শুনিয়াছি। ঘটনাটী এইরকম,—একদিন স্বামিজী বলিলেন—'পদব্রজে নবদ্বীপ থেকে বেড়িয়ে এসনা শরৎ !' যেমন বলা অমনি প্রস্তুত হইয়া শরৎ মহারাজ বাহির হইবেন এমন সময় মহাপুরুষ বলিলেন 'শরৎ আমিও যাব' শুনিয়া শরৎ মহারাজ দাঁড়াইলেন।

ইতিমধ্যে ত্রিগুণাতীত স্বামী রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। শরৎ মহারাজ ও মহাপুরুষ রাস্তায় আসিয়া সারদা মহারাজকে (ত্রিগুণাতীত) দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে বেলা বাড়িয়া চলিল, সূর্য্য মাথার উপরে আসিয়াছে। বিশ্রাম করিবার জন্য উভয়ে একটা বাগানের সম্মুখে বসিলেন। এমন সময় দেখিলেন সারদা মহারাজ সেই বাগান হইতে বাহিরে আসিতেছেন।

উভয়ে কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই সারদা মহারাজ বলিলেন,—"দুপুর হয়েছে কিনা—তাই স্নান করে পিত্তি রক্ষা করে নিলাম।" পিত্তিরক্ষা ! অর্থাৎ খাবার কোথায় পেলে ? তখন সারদা মহারাজ বলিলেন,—"বাগানের পুকুরে স্নান করে

ভাবলাম কি করে পিত্তিরক্ষা করি—দেখলাম কচি দুর্ব্বা রয়েছে তাই খেয়ে জল খেয়েছি।”

উভয় গুরু-ভ্রাতা পিত্তিরক্ষার সহজ উপায় শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন কিনা ঠিক্ বোঝা গেলনা—তবে সারদা মহারাজের যে এমন ধরণের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প আছে তাহা আমরা পরে শুনিয়াছি। যথা সময়ে তিনজনে নবদ্বীপ পৌঁছিলেন।

জপ-ধ্যান রত স্বামী সারদানন্দ কখনও কর্ম্মের আহ্বান উপেক্ষা করিতেন না। বরানগর মঠে তিনি সকলের অপেক্ষা বেশী কাজ একা করিতে চেষ্টা করিতেন। বলিষ্ঠ দেহ—কর্ম্ম করিয়া নিজে ধন্য হইব, এবম্প্রকার সদ্‌বুদ্ধি তাঁহার চিরদিন ছিল। তিনি কর্ম্ম করিয়া কখনও লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিতে জানিতেন না। সুতরাং যখন স্থির হইল শ্রীশ্রীমা বাবুরাম মহারাজের মা ও দিদি, যোগীনমা, গোলাপমাকে সঙ্গে করিয়া যোগীন স্বামিজী মায়ের স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য শোণ নদীর তীরে কৈলওয়ার গমন করা স্থির করিয়াছেন, তখন শরৎ মহারাজ, সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীত) এবং তুলসী মহারাজ যে যোগীন স্বামিজীর সহযাত্রী হইয়াছিলেন—একথাও তুলসী মহারাজ বলিয়াছেন।

কিছুদিন পরে শরৎ মহারাজ ও তুলসী মহারাজ বরানগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। মা কৈলওয়ারে রহিলেন।

যথা সময়ে মা কলিকাতা আসিলেন। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া জয়রামবাটী (মায়ের জন্মস্থান) যাত্রা করিলেন।

মা জয়রামবাটী থাকিতে শরৎ মহারাজ ও তুলসী মহারাজ

মায়ের দেশে গিয়াছিলেন। তখন হরিপাল পর্য্যন্ত ট্রেণ ছিল। সুতরাং হরিপাল হইতে তারকেশ্বর জাহানাবাদ, হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর হইয়া তাঁহারা জয়রামবাটী পৌঁছিয়াছিলেন। জাহানাবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বরাত্রে শরৎ মহারাজ যে গ্রামে ছিলেন সেই গ্রামে এক 'ডাকাতে কালী' আছেন। মায়ের মন্দিরে বসিয়া শরৎ মহারাজ ভাবের সহিত গাহিয়াছিলেন,—

"তোর মুখ দে'খে কি হয় না লো ভয়,
কোন্ গুণে মা বলে তোরে।
মায়ের কি ধার ধারিস্ বেটী,
মা বলাস্ তুই গায়ের জোরে॥
তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মা'র মত কি জানিস্ যতন,
বল্ আবাগী কাঁদায় কে এমন ;—
পা চেপে তুই মার্‌লি পতি,
মত্ত মাগী নেসার ঘোরে॥
তোর আঁধার বরণ বসন দশদিশি,
কবে কার তুই হলি হিতৈষী,
তোর বরণ ঘটায় পালিয়ে যায় নিশি ;—
(ওলো ও সর্ব্বনাশী)
রাক্ষসী তুই খিদের চোটে সৃষ্টি রাখিস্ উদরে॥"

যেমন ডাকাতে কালী তেমনই ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রের গান,—আর তাহা গাহিয়াছিলেন শক্তি-মন্ত্রের সিদ্ধসাধক স্বামী সারদানন্দ!

তুলসী মহারাজ বলেন—'যাত্রী ও গ্রামের লোক ঐ গান

শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল।' ঐ ঘটনার পর মা যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—তখন স্বামিজী মায়ের সঙ্গে বাবুরাম মহারাজের জন্মস্থান আঁটপুরে গিয়াছিলেন। যোগীন মহারাজ, শরৎ মহারাজ, তুলসী মহারাজ, কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) সন্ন্যাসীর-দল মায়ের অনুগমন করিয়াছিলেন। আঁটপুরের আনন্দোৎসব শেষ হইতে তুলসী মহারাজ ও কালী মহারাজ পদব্রজে ভাগলপুর হইয়া কাশী, পরে লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, হৃষীকেশ গমন করেন।

তারপর তুলসী মহারাজ, কালী মহারাজ ও দক্ষ মহারাজ (স্বামিজীর শিষ্য স্বামী জ্ঞানানন্দ, দেহ রক্ষা করিয়াছেন) এক সঙ্গে কেদার বদরী দর্শনে বাহির হইলেন। কেদার বদরী দর্শন করিয়া তুলসী মহারাজ প্রভৃতি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ও শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল হৃষীকেশে আসিয়াছেন।

ইং ১৯০৯ খ্রীঃ আগষ্টমাসে ঝুলন উপলক্ষে ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র-নাথের প্রার্থনা মত তিন মাসের জন্য পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ আমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া ছিলেন। সে বৎসর (ইং ১৯০৯খ্রীঃ) বৃন্দাবন সেবাশ্রমের ব্যবস্থা লইয়া কমিটির জনৈক সভ্যের সহিত নাদু (হরেন্দ্রনাথ) মহারাজের মতান্তর ঘটিয়াছিল। বৃন্দাবনের সেবাকার্য্য শরৎ মহারাজের আদেশে নাদু মহারাজ মাথা

পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রাণপাত করিয়া সেবা-কার্য্য চালাইয়া শরৎ মহারাজের আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ কমিটি বা সেবক এই উভয়ের মর্য্যাদা দিতেন কর্ম্ম দেখিয়া।—মহারাজ বিশ্বাস করিতেন—যে প্রাণ দিয়া কাজ করিবে তাহার সকল অভাব ঠাকুর পূর্ণ করিয়া দিবেন। কমিটি আইন করিতেন। নাদু মহারাজ রোগীর সেবা হইতে হিসাব রাখা সকল কাজ করিতেন। কমিটির সভ্যগণ কখন রোগী সেবা করিতেন না।

বৃন্দাবনে তিন মাস সেবাশ্রমে কাজ করিতে আসিয়া দেখিলাম—যাঁহারা কাজের ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ স্থানীয় কমিটির সভ্য (Members of the Local Committee) তাঁহারা গৃহী ভদ্র লোক—তাঁহারা নিয়ম করিয়া খালাস থাকেন। হাতে নাতে কাজ করা তাঁহাদের অসাধ্য। অপর দিকে বেলুড়' মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবা করেন—কিন্তু নিয়মগুলি কাজের অনুকূলে কি প্রতিকূলে হইল তাহা বলিবার অধিকারও তাঁহাদের নাই।

এক শ্রেণীর গৃহী আছেন—তাঁহারা মনে করেন—সাধু হইবে 'বামুনের গরু',—খাবে কম—দুধ দিবে বেশী। এই ভাবে ভাবিত জনৈক গৃহী সভ্যের সহিত আশ্রমের পরিচালক সেবক ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথের সহিত মতান্তর ঘটে। সেই মতান্তর মনান্তরে পরিণত হইয়া যখন সকল গৃহী সভ্য এক পক্ষ হইলেন—এবং সময়মত অর্থ সাহায্য না করিয়া সেবা-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেবকগণের পক্ষ হইতে

সমস্ত কথা শরৎ মহারাজকে নিবেদন করা হইল। তিনি সেই নিবেদন পাইয়া অপর পক্ষের কি বলিবার আছে জানিতে চাহিলেন। গৃহী সভ্যগণ তাঁহাদের কথাও জানাইলেন। উভয় পক্ষের কথা জানিয়া তিনি এমন একখানা চিঠি স্থানীয় কমিটির সভ্যগণকে দিলেন—যাহা পাইয়া সভ্যগণ পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—'রোগী নারায়ণের সেবা যেমন চলিতেছিল তেমন চলিবে ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ বা সেবক যিনি বা যাঁহারা ব্যক্তিগত মত বজায় রাখিবার জন্য সেবা-কার্য্যে বিঘ্ন করিবেন—তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে।' এই দৃঢ়তা দেখিয়া স্থানীয় সেবাশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই একযোগে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে কাজ ভালই চলিয়াছিল। সেবায় অক্ষম এমন কর্ত্তৃপক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সেবকগণও কাজ করিয়া তৃপ্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কেন্দ্রের প্রায় সর্ব্বত্রই, স্থানীয় লোকের দ্বারা Local Committee রহিয়াছে। মিশনের ভাগ্যে Local Committeeর সভ্যগণ প্রায় সর্ব্বত্রই কাজে অক্ষম জুটিয়া থাকেন। শুধু সভা করা ও নিয়ম প্রণয়ন করাই যেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যেন সেবা কার্য্যটা সাধুদের অবশ্য করণীয়,—যেন সে কাজ তাঁহারা ভিন্ন গৃহী সভ্যের পক্ষে অনধিকার অর্থাৎ তাঁহাদের কার্য্য তালিকার বাহিরে। অধিকাংশ শাখা কেন্দ্রের সভ্যগণ এই ভাব আশ্রয়ে কর্ত্তব্যের ইতি করিয়া থাকেন। আর তারই জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সেবক-

গণের প্রথমে মতান্তর পরে মনান্তর ঘটিয়া কর্ম্মের অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন বৃন্দাবনে ঘটিয়াছিল।

তিনমাস বৃন্দাবন সেবাশ্রমে থাকিয়া বেলুড় মঠে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ফিরিবার পূর্ব্বে পত্রদ্বারা নিবেদন জানাইয়া শরৎ মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলাম। রাস্তায় ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছিল। সেই জ্বরে কিছুদিন ভুগিয়াছিলাম। তিন চারি মাস বাহিরে থাকিয়া আরোগ্য হইবার পর মঠে ফিরিয়া আসিলাম এবং পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার ভঁাড়ারে কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যখন পূজার জোগাড় দিতাম, তখন পূজক ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী। তিনি অসুস্থ হইলে কিম্বা কলিকাতায় আসিলে, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী পূজা করিতেন। শরৎ মহারাজ যেদিন শিবরাত্রি-পূজা করিয়া পরের দিন ঠাকুর পূজা করিয়াছিলেন সেদিনের পূজার জোগাড় আমিই দিয়াছিলাম।

ইং ১৯০৯ খ্রীঃ নভেম্বর মাসের উদ্বোধনে লীলাপ্রসঙ্গ প্রথম প্রকাশিত হয়। লীলাপ্রসঙ্গ রচনা কালে তিনি যে ভাবে জীবনযাপন করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন কেমন সুনিয়ন্ত্রিত শান্ত জীবন যাপন করা তাঁহার স্বভাব ছিল।

প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া নিত্য প্রাতঃস্নান করিতেন। এই স্নানের জল বালতিতে করিয়া আনয়ন করা, স্নানান্তে গামছা পরিয়া কাপড় ধৌত করা—তৎপরে উপরে (দোতালায়) আসিয়া কাপড় বদলান, নিজ কাপড় রৌদ্রে দেওয়া, এই

সমস্ত কাজ তিনি নিজ হাতেই করিতেন। তারপর ঠাকুর ঘরে যাইয়া ঠাকুর প্রণাম করা, ধীরে ধীরে নীচে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিতে বসিতে কপালের ঘাম মোছা, বসিয়া বসিয়া দপ্তর সাজান, ছোট একখানা জল চৌকির উপরে একখানা ব্লটিং কাগজের প্যাড্ রাখা, দক্ষিণ পার্শ্বে ভাগে ভাগে প্রাপ্ত চিঠি-গুলি বিছানার উপরে সাজাইয়া রাখা, এক কৌটা সিগারেট, কৌটার উপরে এক বাক্স দেয়াশালাই, দুইটী দোয়াত, একটীতে কালী, অপরটীতে লেখার পর কলম ধুইয়া রাখিবার জন্য জল, কলম পুঁছিবার ছোট এক টুকরা ন্যাকড়া আর থাকিত ছোট একখানা ঝাড়ন, যদ্দ্বারা নিত্য চৌকি, প্যাড্, চিঠির তাড়া ঝাড়িয়া রাখিতেন। বামপার্শ্বে শ্রীশ্রীমহারাজের প্রদত্ত গড়গড়া, উহাতে নিয়মিত সময়ে তামাক খাওয়া, এ যেন এখনও পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি।

স্থির আসনে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেখা আর সময় সময় বাঁ হাতের উল্টা দিকে চিবুক ধীরে ধীরে ঘসা কখন দক্ষিণ পাদ লম্বা করিয়া দেওয়া—এ ছিল লিখিবার সময়ে তাঁহার চিন্তা ও বিরামের ভঙ্গী। উদ্বোধনে সকলে যখন চা পান করিত তিনিও সেই সময় চা পান করিতেন।

কোন দিনই শরৎ মহারাজ বেলা দেড়টার আগে খাইতেন না। নিত্য সকলের সঙ্গে বসিয়া খাওয়া তাঁহার ঘটিত না। খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেন। তখন আর তামাক খাইতেন না। পরে লিখিবার স্থলেই একটু গড়াইয়া লইতেন। তাহা দেড় ঘণ্টার বেশী নহে। বৈকালে হাত মুখ



ধুইয়া আবার লিখিতে বসিতেন এবং যথা সময়ে বৈকালের চা পান করিতেন।

সন্ধ্যারতির পূর্ব্বেই শরৎ মহারাজ দপ্তর গুটাইয়া ফেলিতেন। এমন সুন্দর ভাবে তাহা সাজাইয়া রাখিতেন দেখিলে মনে হইত কেমন নিখুঁত হইয়াছে। তারপর ভক্ত সমাগম হইত। তখন যে দিন যেমন সে দিন তেমন প্রসঙ্গ চলিতে থাকিত। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, সে বৈঠকে সকলেই যেন বক্তা আর স্বামী সারদানন্দই যেন শ্রোতা।

শান্ত ভাবে কথা বলিতে, ইংরাজী বাংলা বিশুদ্ধ লিখিতে, সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গলা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে তিনি এমন তৎপর ছিলেন যাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হইত,—ইহাই তাঁহার স্বভাব।

একদা কোন পূর্ব্ব দেশীয় ব্রহ্মচারী যেমন শরৎ মহারাজকে বলিয়াছেন, 'আপনাদের সেবার অধিকার পাওয়া 'ভাইগ্যের' কথা। অমনি তিনি হাসিয়া বলিলেন "ভাগ্‌গ"র কথা বল। তারপর বলিলেন উচ্চারণ হইবে "ভাগ্‌ইয়"।

তিনি অনেক সময় অপরের কথা সহজে ধরিতে বুঝিতে পারিতেন না। ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তেমন কথা কত রকম করিয়া বলিয়া দেখিয়াছি—তবুও যেন মাথায় কিছুতেই প্রবেশ করিতে চায় না। একদিন অনুপায় দেখিয়া বলিয়াই ফেলিলাম—'কেন আপনি এই সামান্য কথাটা ধর্‌তে পাচ্ছেন না?' তিনি যেন প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত হইলেন। পরক্ষণে হাসিয়া বলিলেন—তোমার বলবার যা

ছিরী। আমার রাগ হইল। তখন প্রথম হইতে বলিতে আরম্ভ করিলাম। এবার তিনিও বুঝিলেন আমিও অব্যাহতি পাইলাম৷

পরে শুনিলাম—স্বামিজী নাকি বলিতেন—'শরতের মাথাটা ইংরাজের মাথার মত, সহজে কিছু ধরতে চায়না কিন্তু ধরলে তা কাজে পরিণত না করেও ছাড়বে না।' তখন বুঝিলাম আমাদের ধারণাটা নিতান্ত অমূলক নহে।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—কোন একটা কাজে স্বামিজী তাঁহাকে ও শ্রীশ্রীমহারাজকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কাজ হয় নাই শ্রীশ্রীমহারাজ কলিকাতা আছেন, শরৎ মহারাজকে মঠে আসিয়া সমস্ত কথা স্বামিজীকে বলিতে হইল। কথা শুনিয়া স্বামিজী গরম হইয়া উঠিলেন—'ঐত এক ছটাক বুদ্ধি! রেখেদে সুদে আসলে বাড়ুক এর পরে কাজে লাগবে।' এই ভাবে খুব এক চোট গাল মন্দ করিলেন। এমন সময় স্বামী নির্ভয়ানন্দ আসিয়া শরৎ মহারাজের হাতে এক পেয়ালা চা দিয়া গেলেন। তিনি নির্ব্বিকার ভাবে চা পান করিতেছেন দেখিয়া স্বামিজী হতাশ ভাবে বলিলেন—'শালার যেন বেলে মাছের রক্ত কিছুতে তাতে না।' তিনি বোধ হয় আশা করিয়াছিলেন—শরৎ মহারাজও কিছু বলিবেন। অন্য এক ঘটনায় স্বামিজী শরৎ মহারাজের পরামর্শ চাহিয়া বলিলেন—'কি বল শরৎ?'

নির্ব্বিকার চিত্তে শরৎ মহারাজ বলিলেন—'তুমিইত ভাই বলেছ—"এক ছটাক বুদ্ধি!" স্বামিজী হাসিয়া ফেলিলেন। কানাই মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামিজীর সেবক) বলিয়াছেন—স্বামিজী নাকি বলিতেন,—ঠাকুরের দিক দিয়া

মহারাজের স্থান যেমন অতি ঊর্দ্ধে—জগতের দিক্ দিয়া শরৎ মহারাজের স্থানও তেমনই ঊর্দ্ধে। স্বামিজী শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রেসিডেণ্ট এবং শরৎ মহারাজকে সেক্রেটারী নির্ব্বাচন করিলেন। এবং ইহাও বলিয়াছিলেন—যতদিন রাজা (শ্রীশ্রীমহা-রাজকে স্বামিজী রাখালরাজ না বলিয়া শুধু রাজা বলিয়াই ডাকিতেন) থাকিবেন ততদিন রাজাই প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন শরৎ মহারাজের সম্বন্ধে সে রকম কোন আদেশ ছিল না। কিন্তু তিনি কর্ম্মকুশলতায় শেষ দিন পর্য্যন্ত সম্পাদকের পদে সসম্মানে বর্ত্তমান ছিলেন।

এই বৎসর ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ স্বামিজী দেহ রক্ষা করেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ (গোপালদা) শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য। কিন্তু বয়সে তিনি ঠাকুরের অপেক্ষায়ও বড় ছিলেন। এ জন্য ঠাকুর গোপাল দাকে মুরুব্বি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুরের শিষ্যগণ সকলেই তাঁহাকে গোপাল দা বলিয়া ডাকিতেন।

মানুষ মাত্রেরই দেহ-ধারণ-জনিত কতগুলি সামাজিক সংস্কার প্রবল থাকে। এই প্রবল সংস্কার সাধুদের মধ্যে অনেকেই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ঠিক সেই জন্যই মঠের ২।১ জন সাধু 'পূর্ব্ব বঙ্গের' লোক পছন্দ করিতেন না। শুধু এই অজুহাতে একজন পূর্ব্ব দেশীয় ব্রহ্মচারী যাহাতে মঠে স্থান না পাইতে পারে তার জন্য শ্রীশ্রীমহারাজকে সেই ২।১ জন সাধু ধরিয়া বসিলেন। এই ঘটনা আমি মঠে স্থান পাইবার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। মহারাজ নানা দিক্ লক্ষ্য করিয়া সেই ব্রহ্মচারীকে কাঁকুড়গাছি পাঠাইলেন। যাইবার

পথে কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মচারী বলরাম বাবুর বাড়ীতে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ জানিতে পারিলেন, পূর্ব্ব দেশে জন্ম এই অপরাধে ব্রহ্মচারীকে মঠে রাখা হইবে না। তখন তিনি এক খানা চিঠি দিয়া তাঁহাকে স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকট পাঠাইলেন। পত্রে লিখা ছিল—উদ্বোধনে লোকের প্রয়োজন থাকিলে ইহাকে রাখিতে পার। স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারীকে গ্রহণ করিলেন। ইহা ১৯০৬ খ্রীঃ এর কথা। উত্তরকালে এই ব্রহ্মচারী মিশনের কর্ম্মী, শ্রীশ্রীমহারাজের সেবক এবং বর্ত্তমানে কোন এক আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে ঠাকুর ও স্বামিজীর কাজ করিয়া যে ধন্য হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাহার মূলে কিন্তু স্বামী সারদানন্দই বিদ্যমান। তিনি বলিতেন, 'লোককে তাড়াইয়া, গালি দিয়া কি হইবে—পারত তোমার শক্তির দ্বারা লোকের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দাও—নতুবা চুপ চাপ থাক।'

এক দিন তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"আমি বাপু স্কুল মাষ্টারের মত বেত হাতে করে কে কি কচ্ছে না কচ্ছে দেখতে পারব না। সকলেই তোমরা সাধু হতে এসেছ, কি ভাল কি মন্দ এ জানবার মত বয়স ও বুদ্ধি তোমাদের সকলেরই হয়েছে। যে ভাল ভাবে চলবে সে শান্তিতে থাকবে, যে জেনে শুনে মন্দ পথে চলবে—সে অশান্তি ভোগ করবে।" তবুও পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাদের বেচাল দেখিলে তিনি কিছু কিছু বলিতেন ইদানীং একেবারেই চুপ চাপ থাকিতেন। এক-দিন কথা-প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—"আপনার

শিবত্ব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে (নিত্য সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন) ঠিক সেই অনুপাতে আমাদের ভূতত্বও বেড়ে যাচ্ছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন—'উত্তম 'কথা।'

তৃতীয় বর্ষ

[যেমন দেখিয়াছি]

গোপালদা দেহ রক্ষা করিলেন, ২৮শে ডিসেম্বর ইং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ৪।৫ দিন গত হইল। একদিন পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ উদ্বোধনে আসিলেন—এবং জনৈক গুরুভ্রাতার অশিষ্ট ব্যবহারের কথা শরৎ মহারাজকে বিশদভাবে জানাইয়া—'সে মঠে থাকতে পারবে না—বাইরে যেয়ে তপস্যা করুক' এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। শরৎ মহারাজ নির্ব্বিকার ভাবে সকল কথা শুনিয়া গেলেন। পরদিন সকাল বেলা নৌকাযোগে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া সকল কথা শুনিলেন। তারপর সেই গুরুভ্রাতাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—তেমনভাবে অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করা তাঁর মোটেই শোভন হয় নাই।

বাবুরাম মহারাজ এ সকল কথা জানিতে পারেন নাই। তিনি আসিয়া বার বার শরৎ মহারাজকে বলিতে লাগিলেন—'শরৎ! ওকে যেত বল।' শরৎ মহারাজ চুপ করিয়া আছেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল—মঠে ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে কাহার কোথায় স্থান এবং সেই সূত্রে যে রকম মান্য দিতে হইবে তাহা সকলে শিখিয়াছিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে। ঠাকুর বাবুরাম

মহারাজকে শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহ, দেহে কখন পাপ কর্ম্ম করিতে পারিবে না—মনে কখন কুচিন্তা উঠিবে না (নৈকষ্য, হাড়-শুদ্ধ) ইত্যাদি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন—তাহারই জন্য বাবুরাম মহারাজের স্থান শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসি-সঙ্ঘে খুব উঁচুতে ছিল। শরৎ মহারাজ কথায় কথায় অসঙ্কোচে বলিতেন, 'তোমরা ঠাকুরের (Certificate) প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত। তোমরা হুকুম করিবে—আমরা তাহা পালন করিয়া যাইব। কার্য্যতঃও কিন্তু তাহাই হইত। শক্তি থাকিতে শ্রীশ্রীমহারাজের ইচ্ছা, বাবুরাম মহারাজের ইচ্ছা পূরণ করিতে শরৎ মহারাজ কখন বিমুখ হন নাই। কিন্তু এই ঘটনা সম্পূর্ণ নূতন রকমের। তা'ছাড়া – কাহাকেও মঠ হইতে চলিয়া যাও—এধরণের কথা বলা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। এদিকে বাবুরাম মহারাজ বার বার বলিতেছেন—হঠাৎ শরৎ মহারাজ বলিয়া ফেলিলেন,—বাবুরামদা আমি কি তোমার চাপরাসী যে তুমি যা হুকুম করবে তাই আমাকে কর্ত্তে হবে ? বাবুরাম মহারাজ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিলেন না —তাহা হইলে হাসিয়া বলিতে পারিতেন,—শরৎ! এখন ওকি কথা বলছ ? বাবুরাম মহারাজ তাহা না বলিয়া একেবারে গম্ভীর হইয়া রহিলেন। শরৎ মহারাজও সহজে নিষ্কৃতি পাইয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় মাসেক পরে শরৎ মহারাজ কাশীধামে যাত্রা করিলেন। যোগীনমার একমাত্র কন্যা যিনি বয়সে স্বামিজী ও শরৎ মহারাজদের সমবয়সী ছিলেন তিনি কাশীপ্রাপ্তা (দেহরক্ষা) হইলেন। শরৎ মহারাজ যোগীনমার কন্যার শঙ্কটাপন্ন অবস্থার

কথা শুনিয়া চিকিৎসার সুব্যবস্থাদি করিতেই গিয়াছিলেন—কিন্তু যাহাকে বিশ্বনাথ নিজের পাদপদ্মে স্থান দিবেন—বৈদ্য তাহার কি করিবে!

শরৎ মহারাজ ১৯শে মার্চ্চ কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। পরদিন বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহোৎসব। সকালে মঠে আসিয়াছেন—এবং পশ্চিমের বারান্দায় (চার টেবিলের নিকট বসিয়া আছেন। বসিয়া আছেন ত বসিয়াই আছেন। লক্ষ্য করিলাম বেলা বারটার সময় একবার সমস্ত মঠ বেড়াইয়া আসিলেন। তারপর আবার আসিয়া পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের দক্ষিণ ধারে আন্দুলের কালী-কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। আমি ঠাকুর ঘরের ভাঁড়ারের কাজে ব্যস্ত আছি। ইতিমধ্যে একজন আসিয়া আমায় বলিল—তোমাকে শরৎ মহারাজ ডাক্‌ছেন। তখন বেলা প্রায় একটা। আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম তিনি সেই বারন্দায় বসিয়া আছেন। এক মিনিটের পথ—কিন্তু সে পথ অতিক্রম করিতে পাঁচ মিনিট লাগিল। বেলুড় মঠের উৎসবে লোকের ভিড়—একটা দেখিবার জিনিষ বটে!

অতিকষ্টে শরৎ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি হাত দিয়া ঠাকুর ঘরে উঠিবার সিড়ির রেলিং ও পিলার দেখাইয়া বলিলেন,—'ঠাকুর ঘরে যে এলোমেলো ভাবে লোক উঠ্‌ছে ও নাব্‌ছে আমার ভয় হচ্ছে পাছে পিলার ভেঙ্গে লোক চাপা পড়ে।' আমিও দেখিলাম এবং অতিকষ্টে ফিরিয়া আসিয়া দুইটী বাহিরের ছেলেকে প্রহরী রাখিলাম। প্রায় একঘণ্টা পরে

—'গেল গেল' একটা শব্দ উঠিল। একদিকে কালী-কীর্ত্তন খুব জমিয়াছে তাহার পার্শ্বে 'গেল, গেল' শব্দ ছুটিয়া আসিয়া দেখি শরৎ মহারাজ সেই পিলারকে পিছন করিয়া রাস্তা আটকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া হাত দিয়া ইসারা করিলেন—নীচে লোক নামাইয়া রাস্তা কর। আমি সহকারিদ্বয়ের সাহায্যে লোক নামাইয়া দিতে লাগিলাম। তারপর তিনি ধীর শান্তভাবে হাত ধরিয়া ধরিয়া লোক নামাইয়া দিতে লাগিলেন। লোক নামিয়া গেলে পরে আমাকে বলিলেন,—'চেয়ে দেখ পিলারটা ভেঙ্গে গেছে—পার ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা কর নতুবা ঠাকুর ঘর বন্ধ করে দাও।' আমি ছুটিয়া আসিয়া পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে সকল কথা বলিলাম। তখন মঠ তাঁহার ব্যবস্থাধীনে এবং মঠের সকল সাধুরা তাঁহারই অধীনে। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন,—'তালা বন্ধ করে দাওগে।' আমি ফিরিয়া আসিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিলাম।

উৎসবান্তে সন্ধ্যার সময় শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ছুটে গেলে বা কোথায়—ফিরে এসে তালা বা বন্ধ করে দিলে কেন?

আমি বাবুরাম মহারাজের নিকট ঘটনা জ্ঞাপন ও তাঁহার হুকুম মত তালা বন্ধ করিবার কথা নিবেদন করিলাম।—তিনি বলিলেন,—তা বেশ করেছ।

শরৎ মহারাজ উৎসবের রাত্রি মঠে যাপন করিলেন।

পরদিন সকালে (মঠে) শরৎ মহারাজ চা'র টেবিলের ধারে বসিয়াছিলেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিল—

'মহাশয় আমি এখানে প্রসাদ পাব।' শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'তা বেশ পাবে।' তখন সেই লোকটী বলিয়া উঠিল—'প্রসাদ পাব বটে কিন্তু রামকৃষ্ণকে মানতে পারবো না।' গম্ভীর-প্রকৃতি হইলেও রঙ্গপ্রিয় তিনি খুবই ছিলেন। তাই তিনিও পাইয়া বসিলেন—'আমার তাতে কোন আপত্তি নেই কিন্তু ছেলেরা যে তোমাকে মানিয়ে ছাড়বে।'

'তা মশাই পারব না, খেতে না পেলেও নয়।' "খাবার কথা ত হয়েই গেছে খাবে। মানবার কথা নূতন হল তা ছেলেরা যদি ছেড়ে দেয় ত্যাখ।"

'আমি প্রসাদও খেতে চাইনা—মানতেও পারবনা' বলিয়া লোকটী উঠিয়া হাঁটা দিল।

সকলে ভাবিলেন প্রসাদ পাইবার সময় সে ঠিক আসিবে। কিন্তু খাইবার সময় সে আর আসিল না। শরৎ মহারাজ একবার খোঁজও লইয়াছিলেন। পরে যখন জানিলেন—সে আসে নাই তখন দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"কে জানে বাপু! ওযে খাবেনা তা ত বুঝতে পারিনি তখন—ত্যাখনা একরকম!"

বেলুড়-মঠের উৎসবের পর ২২শে এপ্রেল শরৎ মহারাজের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, দেবব্রত, (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) দেবব্রতের সহোদরা ভগ্নী কল্যাণীয়া সুধীরা এবং ব্রহ্মচারী শচীন কেদার বদরী দর্শনে যাত্রা করিলেন। যাত্রার দিন আমি উদ্বোধনে ছিলাম। শরৎ মহারাজ প্রথমে বলিলেন, গেল ত উৎসাহ করে এখন ভালয় ভালয় ফিরে এলে যে হয়। এই কথা বলিবার সময় তাঁহাকে বেশ চিন্তা-যুক্ত দেখা

গেল। তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার কেদার দর্শনের ধারা বাহিক ঘটনা অনেকটা বলিয়া গেলেন। শরৎ মহারাজের কেদার দর্শনের কথা ইহাই আমার প্রথম শোনা।

জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীযুক্ত কেদার দত্তের সহিত কথাপ্রসঙ্গে যে শরৎ মহারাজকে আমরা ভূমধ্যসাগরে ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া ধীর, স্থির থাকিতে দেখিয়াছি, আমেরিকা হইতে ভারতে ফিরিয়া কাশ্মীর যাইবার পথে ঘোড়াগাড়ীসহ খাদে পড়িয়া নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়াও নির্ভীক, অচঞ্চল দেখিয়াছি, আবার গঙ্গাবক্ষে ডাক্তার কাঞ্জিলালের সহিত মঠে যাইবার সময় ঝড়ে পড়িয়া নৌকা যায় যায় অবস্থার মধ্যেও যাঁহাকে তামাক খাইতে দেখিয়াছি তিনি যৌবনের প্রারম্ভে কঠিন কেদার ও বিশাল বদরী দর্শনে যাত্রা করিয়া হাসিমুখে যে সকল ক্লেশসহ্য করিয়াছিলেন যাহা পরে পূজনীয় হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ও শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকটে ও ধারাবাহিকভাবে শুনিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করা গেল। বলাবাহুল্য কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ কেদার দর্শনের অনেক কথাই বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু হাতের লাঠি গাছটী যে বৃদ্ধাকে দিয়াছিলেন সে কথা কখন তিনি বলেন নাই। সে কথা আমরা প্রথমে শুনিয়াছি হরি মহারাজের কাছে ইং ১৯১৭ সনের শেষভাগে পুরীতে। তারপর শ্রীযুত সান্ন্যাল মহাশয় বলিয়াছেন শরৎ মহারাজের দেহরক্ষার পরে।

গৃহে স্বচ্ছল অবস্থা। তিন ভগ্নীর পরে যাহার জন্ম—পিতামাতার আদর-যত্নে যিনি চিরদিন লালিত-পালিত, জন্ম হইতে

কলিকাতাবাসী—তাঁহার পক্ষে দুর্গম রাস্তা ধরিয়া নিঃসম্বলে কেদার যাত্রা—শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি একান্ত নির্ভরতাই সূচিত করিয়াছিল। সঙ্গী গুরু-ভ্রাতাদ্বয়ের তেমন অবস্থা না হইলেও তাঁহারাও কলিকাতাবাসী, সুখের কোলে লালিত-পালিত—তাঁহাদেরও সহযাত্রী হইবার মত সম্বল সেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর একান্ত নির্ভরতা।

তখন শরৎ মহারাজ হৃষীকেশে আছেন। শুনিলেন—পাহাড়ে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। সরকার প্রশস্ত পথে কোন যাত্রীকে কেদার দর্শনে যাইতে দিবে না বলিয়া পাহারা বসাইয়াছে। তবুও বিশ্বাসিগণ টলিলেন না। স্থির করিলেন—মুসুরী পাহাড় অতিক্রম করিয়া জঙ্গলের পথে তাঁহারা যাইবেন। হরি মহারাজের পাহাড়ে বেড়াইবার এক গাছা লাঠি ছিল—শরৎ মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয়ের তখনও লাঠির যোগাড় হয় নাই।

'জয় রামকৃষ্ণ!' বলিয়া পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় কুটীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও অন্ধকার দূর হয় নাই। সাধুরা কেহই কুটীরের বাহিরে আসেন নাই।

গঙ্গা কল-কলনাদে চলিয়াছে—হাওয়া হর্ হর্ শব্দে হৃষীকেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে। হর! হর! হর! নগ্নপদে তিনজনে যাত্রা করিলেন। কাঁধের উপর দুইখানা কম্বল, কাপড় ও কৌপীন, সঙ্গের সম্বলমাত্র দুই আনা পয়সা। তিনজনে নিঃশব্দে চলিয়াছেন।

হৃষীকেশ হইতে তিনজন যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই গঙ্গার কল-কলশব্দ ও হাওয়ার হর্ হর্ ধ্বনি অস্পষ্ট

হইতে লাগিল। শেষ সেই শব্দও মিলাইয়া গেল। কিছুদূর আসিবার পর, রাস্তার ধারে 'পাহাড়ে লাঠি' দেখিতে পাইয়া সান্ন্যাল মহাশয় দুই গাছিলাঠি দুই আনায় খরিদ করিলেন। একগাছি শরৎ মহারাজকে দিলেন, অপরখানা তাঁহার রহিল।

সমস্তদিন অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া সন্ধ্যার সময় হৃষীকেশ দেরাদুন রাস্তার উপরে একটা গাছের নীচে তিনজনে রাত কাটাইয়া পরদিন সন্ধ্যায় দেরাদুন গঙ্গামন্দিরে আসিয়া ভিক্ষা (খাওয়া-দাওয়া) করিলেন। সেইদিন দেরাদুনে রহিলেন এবং অতি প্রত্যূষে মুসুরী রওনা হইলেন। বেলা দশটার সময় মুসুরী শিবমন্দিরে আসিয়া স্থান লইলেন এবং ভিক্ষা করিলেন। সেই দিন রাত দশটার সময় একদল লোক আসিয়া 'বাবাজী, ওঠ কিছু খাইতে হইবে' বলিয়া তিনজনকে আহার করাইল। এইভাবে রাত্রের আহারও জুটিয়া গেল। শেষরাত্রে তিনজনে আবার চলিতে লাগিলেন। সূর্য্য উদয় হইল, সূর্য্য মাথার উপরে আসিল তবুও তিনজনে অভুক্ত অবস্থায় চলিয়াছেন। বেলা ৩টার সময় ধিনল্টি গ্রামের ধারে আসিতেই অনন্ত তুষার-শোভিত (Perpetual Snow Range) হিমগিরি দেখিতে পাইলেন। সেই অভুক্ত অবস্থায় তিনজনেই প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ধ্যান-ধারণায় কিছুকাল গত হইল। এমন সময় এক বাঙ্গালী বৈষ্ণব বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ঝুলিতে আটা প্রভৃতি খাওয়ার সকল সরঞ্জামই ছিল। তিনি রুটী বানাইলেন এবং শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয়কে দিয়া ভোজনে বসিলেন।

আহারান্তে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। এইবার টিহিরীর রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা গঙ্গার তীর ধরিয়া চলিলেন এবং গঙ্গার ঘাটের উপরে একটী মন্দিরে রাত্রি যাপন করিলেন। তারপর দিন উত্তর কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৈকালে এক মুদীর দোকানে রহিলেন। মুদী তাঁহাদের রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করিল। পরদিন সকালে রওনা হইয়া বেলা এগারটার মধ্যে উত্তরকাশী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্থ দিন গঙ্গোত্রী যাত্রা করিলেন। তিনজনেই নগ্নপদে চলিয়াছেন। শরৎ মহারাজের পায়ের তলা চিরদিন শরীরের মাংসাপেক্ষা নরম ছিল। গঙ্গোত্রী যাইবার পথে পায়ে একটা বড় ফোস্কা পড়িল। চলা-ফেরা একেবারে অসম্ভব হইল। এখন কি হইবে ভাবিতে যাইয়া শরৎ মহারাজ দেখিলেন—নিকটে গ্রাম নাই, এমন স্থলে একজনের জন্য থাকিতে গেলে অপর সকলকেও শীতে, অনাহারে প্রাণ দিতে হইবে। তখন তিনি মিনতি করিয়া হরি মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয়কে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিলেন। নিজে পথের ধারে একটী গুহাতে বসিয়া রহিলেন।

যখন তাঁহারা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেন—তখন গুহা হইতে বাহির হইয়া শরৎ মহারাজ বালকের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গোত্রীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাস্তায় জন-মানব কেহ নাই। এমনই সময় কালীকম্‌লি বাবার লোক-জন সাধুদের খাইবার জিনিষপত্র লইয়া সেই পথে যাইতেছিল। তাহারা ঐ অবস্থায় একজন সাধুকে যাইতে দেখিয়া একটী মোট বহিবার ঘোড়ার পিঠে শরৎ মহারাজকে উঠাইয়া লইল। এবং

প্রথমে যে গ্রাম পাইল সেই স্থানে তাহারা শরৎ মহারাজকে রাখিয়া গন্তব্যপথে চলিয়া গেল। হরি মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় সে সময় সেই গ্রামে ছিলেন এবং কি করিয়া শরৎ মহারাজকে আনা যায় তাহা ভাবিতেছিলেন—তাঁহারা জানেন, শরৎ মহারাজ গুহাতেই বসিয়া আছেন। হঠাৎ গ্রামে বেড়াইতে বেড়াইতে হরি মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় অপ্রত্যাশিতভাবে শরৎ মহারাজকে দেখিতে পাইলেন। কি আনন্দ! তারপর তিনজনে শনিঠাকুরের মন্দিরে তিনদিন যাপন করিলেন। তখন শরৎ মহারাজের পায়ের ফোস্কা ভাল হইয়াছে এবং তিনিও ধীরে ধীরে চলিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতঃপর তিনজনে ধরালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে 'ফাপরকী-পোলা' (এক প্রকার সরু চাকুলী) খাইবার গল্প যে ভাবে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন তাহা এই :—

সেই সরু চাকুলীগুলো—কুইনাইনের চেয়েও তেতো কিন্তু কি করা যায়! খেয়ে যাচ্ছি আর চেয়ে দেখ্‌ছি সান্ন্যাল ও হরিভাই কি কচ্ছেন। দেখলাম—সান্ন্যাল ও হরিভাই মুখ গম্ভীর ক'রে বসে আছেন। অতি সামান্য যা' তাঁরা খেয়েছেন তা' ক্ষিদের জ্বালায় বল্‌তে হবে। নতুবা এমন তেতো যে কেউ কখন খেতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না। আমিও যা' খেয়েছিলাম তা'ও ঐ ক্ষিদের জ্বালাতেই।

পরদিন যাত্রা করিবার কথা স্থির হইল। শরৎ মহারাজ দ্রুত চলিতে পারেন না বলিয়া সঙ্গে সান্ন্যাল মহাশয় রহিলেন। হরি মহাবাজ একা আগে আগে চলিলেন।

হরি মহারাজ দ্রুত চলিয়াছেন। শরৎ মহারাজ ও সান্যাল মহাশয় ধীর মন্থর গতিতে সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় ভৈরবঘাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রে গ্রামে ভিক্ষা মিলিল। কিন্তু হরি মহারাজের দর্শন মিলিল না। পরদিন বেলা দশটার মধ্যে শরৎ মহারাজ ও সান্যাল মহাশয় আসিয়া গঙ্গোত্রী উপস্থিত হইলেন এবং ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া ভিক্ষা ও হরি মহারাজের দর্শন দুইই লাভ করিলেন।

গঙ্গোত্রীতে কালী কম্‌লিবাবার ছত্রে তাঁহারা তিন দিন রহিলেন। গঙ্গোত্রী থাকিবার সময় তিনজনে স্থির করিলেন— পাহাড়ের পথেই যাইতে হইবে। কিন্তু তাঁহারাত পথ ঘাট জানেন না, রাস্তা চিনাইবে কে? খোঁজ করিয়া একজন পাহাড়ের রাস্তা জানে এমন পথপ্রদর্শক পাওয়া গেল। পয়সা সঙ্গে নাই—সুতরাং লোকটীর পারিশ্রমিক ঠিক হইল—একখানা কাপড় ও একখানা চাদর। চতুর্থ দিন পথপ্রদর্শক-সঙ্গে তিনজনে বাহির হইলেন। একটা পাহাড়ের মাথায় আসিয়া দেখা গেল জঙ্গল—পথ কোন্ দিকে স্থির করিবার জন্য পথ-প্রদর্শককে হাঁক্-ডাক করা হইল কিন্তু তাহার খোঁজ মিলিল না। বলা বাহুল্য, পথ-প্রদর্শক কাপড় চাদর প্রথমে আদায় করিয়া লইয়াই পথপ্রদর্শক হইয়াছিল—এবং সেই কাপড় চাদর লইয়াই সে চম্পট দিয়াছে। সুতরাং জনমানবহীন সেই পথে চলিতে যাইয়া দেখা গেল—কতগুলি গাছে কে অগ্নি সংযোগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই অগ্নির পার্শ্বে উন্মুক্ত আকাশ তলে তিন জনেই শয়ন করিলেন। মাঝে মাঝে জানোয়ারের ডাক

শোনা যাইতেছে—সেই ডাক শুনিতে শুনিতে শ্রান্তিবশতঃ নিশ্চিন্ত মনে তিন জনেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন সেই জঙ্গলের মধ্যে তিন জনই চলিতে লাগিলেন। পথের ধারে ছোট ছোট পাহাড়ে ফল রহিয়াছে, তাহা চুষিতে চুষিতে চলিয়াছেন। এক প্রকার নটে শাকের মতন পাতা, হরি মহারাজ খাইয়া বমি করিতে লাগিলেন। সেইদিন অনাহারে গত হইল। আজ তৃতীয় দিন—অনাহারে তিনজনই চলিয়াছেন। বেলা প্রায় দুইটার সময় তাঁহারা একটী পাহাড়ে উঠিতে যাইবেন এমন সময় মেঘ ভাসিয়া উঠিল। সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার জামার পকেটে হাত দিতে ডাল ও মরিচ, পাইলেন, গণিয়া দেখিলেন ৪০।৪৫টী ডাল ও ৪।৫টী মরিচ, তাহাই তিন-জনে ভাগ করিয়া খাইলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টি ও শীলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। উন্মুক্ত আকাশ তলে শীলাবর্ষণ—নিশ্চিত মৃত্যুর আগমন জানিয়া কম্বল মাথায় ও গায়ে চাপা দিয়া তিনজনে ধ্যানে বসিলেন। এদিকে সমস্ত প্রকৃতি সংহার মূর্ত্তি ধরিয়াছে —অপরদিকে তিনজন তরুণ সেই তাণ্ডব লীলাকে অস্বীকার করিয়া ধ্যানে বসিয়াছে। তখন তাঁহাদের মন যেন একই বাণীতে পূর্ণ ছিল—'মন তোর এত ভাবনা কেনে।

(একবার) কালী বলে বস্‌রে ধ্যানে' ॥

দশ মিনিটের মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনজনে উঠিয়া চলিলেন। অগ্রসর হইতেই পাহাড়ের মাথায় কৃষকদের মাথা রাখিবার জন্য এক খানা খোলা চালাঘর দেখিলেন। তখন তিন জনে আসিয়া সেই খোলা চালার

নীচে আশ্রয় লইলেন—এবং সে রাত্রি সেই খানেই অতিবাহিত করিলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া রওনা হইতেই পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ একদলে ৫।৬ জন চলিয়াছে দেখা গেল। তাঁহারা তাহাদের সঙ্গ লইলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতে এমন এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, যেখানে পাহাড় প্রায় খাড়া এক মাইল দাঁড়াইয়া আছে আর এই এক মাইল পথ সকলকে নামিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য রাস্তা নাই।

প্রথমে হরি মহারাজ চলিয়াছেন, অতি সন্তর্পণে লাঠিতে ভর দিয়া। তারপরে চলিয়াছেন সান্ন্যাল মহাশয়। পশ্চাতে শরৎ মহারাজ। পাহাড়ীরা চলিয়াছে শরৎ মহারাজের পিছনে। শরৎ মহারাজ দেখিতে পাইলেন—পাহাড়ী দলের মধ্যে এক বৃদ্ধার লাঠি নাই এবং সে যে ভাবে নামিতেছে, মনে হইতেছিল সে এই বুঝি বা পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায়। শরৎ মহারাজ ধীরে হাতের লাঠি গাছটী বৃদ্ধার দিকে বাঁকাইয়া ধরিলেন; বৃদ্ধা অন্তরের কৃতজ্ঞতা মুখের ভাবে ব্যক্ত করিয়া গ্রহণ করিলেন। হরি মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় কেহই তাহা দেখিতে পাইলেন না। এই ভাবে সেই দুর্গম পথ বিনা লাঠিতে শরৎ মহারাজ অতিক্রম করিয়া আসিলেন। হরি মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় দেখিলেন শরৎ মহারাজের হাতে লাঠি নাই। প্রশ্ন হইল—লাঠি গাছটী কোথায় গেল? শরৎ মহারাজ চুপ করিয়া চলিয়াছেন। যখন ক্রমাগত প্রশ্ন হইতেই লাগিল তখন বলিলেন,—সেই পাহাড়ী বুড়ীকে দিয়েছি, দেখ্‌লাম সে যেন পড়ে যাবার মত হয়ে চলেছিল। হরি মহারাজ চুপ করিয়া

রহিলেন। পাহাড়ে চলিবার সময় প্রাণ হইল লাঠি। সেই লাঠি দিয়া এখন শরৎ মহারাজ কেমন করিয়া চলিবেন ভাবিয়া স্নেহের আতিশয্যে সান্ন্যাল মহাশয় গালমন্দ করিতে লাগিলেন।

শরৎ মহারাজ কিন্তু নির্ব্বাক্। এই লাঠি গাছটী দেওয়ার কথা তিনি কখনও আমাদের বলেন নাই। এই কথা আমরা হরি মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে বহুবার শুনিয়াছি।

পাহাড়ীদল অন্য পথে চলিয়া গেল। ইঁহারাও চলিয়াছেন। সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বেগবতী নদী। নদীর অপর পারে গ্রাম দেখা যাইতেছে। আজ চতুর্থ দিন অভুক্ত অবস্থায় চলিয়াছেন। হরি মহারাজ অতিকষ্টে লাঠির সাহায্যে সে খর-স্রোত অতিক্রম করিলেন। শরৎ মহারাজ তারপর চলিয়াছেন—শুধু হাতে। হঠাৎ স্রোত-বেগে পড়িয়া তিনি গড়াইয়া চলিলেন—তখন হরি মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় দুই পার হইতে লাঠি লম্বমান করিয়া দেওয়ায় উহা ধরিয়া প্রথমে তিনি ভাসিয়া যাওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। তারপর হরি মহারাজের লাঠির সাহায্যে নদী পার হইলেন। শেষ সান্ন্যাল মহাশয় নদী পার হইলেন। সেই খরস্রোতা দশ-বার হাতের বেশী চওড়া ছিল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রামে যাইবার পূর্ব্বে দেখিতে পাইলেন, পাহাড়ীরা খুব হৈ চৈ করিতেছে কিন্তু কি যে হেতু তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সম্মুখে বুড়া কেদার। গ্রামখানা বড়ই। ইতিমধ্যে নিকটে একটী ঝরণা দেখিতে পাইয়া তথায় তিনজনেই দাঁড়াইলেন। ঝরণার ধারে টক্ পালং ও পুদিনার গাছ—পেটের জ্বালায় তিনজনেই উহা

খাইতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে যাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং একটা খোলাঘরে আসন পাতিলেন। অনাহারে যে ভাবে এই কঠিন রাস্তা অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহা মনে করিয়া শরৎ মহারাজ ভাবিলেন,—ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে নাই। থাকিলে কি অনাহারে এত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়! এই কথা ভাবিতে যাইয়া শরৎ মহারাজের মনে অনেক কথা উঠিল। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন—এই বুড়া কেদারে যদি গরম গরম লুচি খাইতে পাই তাহা হইলে মানিব ঠাকুর সঙ্গেই আছেন।

পাঠক, ময়দাকে লুচি বানাইয়া খাওয়া বাঙ্গালীর নিজস্ব চাল। এ চাল ভারতের অন্য কুত্রাপিও দেখা যাইবে না। যেখানে লোকে ভাত খায় না সেখানে আটার রুটী খাইবে বাজরার রুটী খাইবে আটার পুরী খাইবে কিন্তু ময়দার লুচি খাইবে না। সুতরাং শরৎ মহারাজ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা বুড়া কেদারে পূর্ণ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব কথা।

যাহা হউক চারিদিন অনাহারের পর সেই রাত্রে তাঁহারা তিন জনে বেশ পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন বেলা দশটার পরে শরৎ মহারাজ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। তারপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা শরৎ মহারাজের নিকট যেমন শুনিয়াছি নিম্নে তাহাই উল্লেখ করিলাম ঃ—

বুড়া কেদার গ্রামখানা পাহাড়ী গ্রামের তুলনায় বেশ বড়ই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছি—দেখিনা গাঁয়ে বাজারও র'য়েছে ; সেই বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় পেছন থেকে—'এ মহাত্মা!

এ মহাত্মা !!' শব্দ শুনে ফিরে চাইতে দেখি দোকানি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি যেতেই বল্লে—'পা লেও'! অর্থাৎ খেয়ে নেও। আমি বল্লাম—আমার সঙ্গে দু'জন সাধু আছেন, যা' দেবে দাও—তিনজনে ভাগ করে খাব। দোকানী বল্লে—দু'জন আছেন সঙ্গে কি আর হ'য়েছে! তুমি বসে' খাও, তারপর সে দু'জনার জন্য যা দেবার 'তা' দেব'খন। দোকানীর আগ্রহ দেখে খেতেবসে পড়্লেম। বেশ করে দোকানী গরম গরম লুচি খাওয়ালে। খাওয়া দাওয়া হ'য়ে যাবার পর যখন দোকানীকে বল্লেম—কৈ তাদের জন্য যা' দেবে দাও? দোকানী বল্লে—তুমি ত' খেয়েছ আবার কি? যাও আর কিছু হচ্ছে না! আমি দোকানীর ব্যবস্থা দেখে অবাক হ'য়ে গেলেম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাত্রের সেই কথা। তখন সকল কথা সান্ন্যাল ও হরি ভাইকে বল্‌বার জন্য সটান ফিরে এলাম।—তারপর একে একে সকল কথা বল্লাম। তখন হরিভাই ও সান্ন্যালের যা' হাসি! দোকানী যে আমায় বোকা বানিয়ে খাইয়ে বিদায় ক'রেছে, সেই কথাই ওঁরা আমাকে শুনাতে লাগলেন।

কেদার যাত্রার পথে যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাহা বুড়া কেদারেই শেষ হইল। তারপর রাস্তায় কোন রকম কষ্ট উপবাস—কিছুই সহ্য করিতে হয় নাই।—

যথাসময়ে (অক্ষয় তৃতীয়ার দিন) শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, সান্ন্যাল মহাশয় আসিয়া কেদার দর্শন করিলেন। কঠিন কেদার কী জয়!

সুখের কোল হইতে সদ্য বাহিরে আসিয়া যিনি সকল রকম

ক্লেশ অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন—নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়িয়া, যিনি নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় শান্ত রহিয়াছেন তিনি যে জয়রামবাটী গ্রামে একটা গরুর ফোঁস্ ফোঁসানী দেখিয়া ভয় পাইতে পারেন না তাহা জানিয়াও কোন সেবক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। আমি কিন্তু তখনও শরৎ মহারাজের এই সকল ঘটনার সহিত পরিচিত ছিলাম না।

চতুর্থ বর্ষ

যেমন দেখিয়াছি

ইং ১৯১১ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে একটী দুর্ব্বৎসর। এই বৎসর ৮ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য পূজনীয় স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ) দেহরক্ষা করেন। ২১শে আগষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী উদ্বোধনে মহা সমাধিতে মগ্ন হন।

১৩ই অক্টোবর স্বামিজীর শিষ্যা, ভগ্নী নিবেদিতা দার্জ্জিলিঙ্গে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে মিলিত হন।

প্রায় দুই বৎসর যাবত স্বামী সদানন্দ শ্রীমান্ বশীশ্বর সেনের (৮নং বসুপাড়ালেন—বাগবাজার) ভাড়াটিয়া বাড়ীতে রহিয়াছেন। ইদানীং গুপ্ত মহারাজের রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই সময় পূজনীয় শিবানন্দ স্বামিজীও আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া উদ্বোধনে ছিলেন। সঙ্গে আমি ছিলাম,—না থাকারই মধ্যে। চিরদিন শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী নীরোগ, আত্মনির্ভর ছিলেন। সুতরাং সামান্য একটু-আধটু কাজ লইয়া থাকিবার ফলেই দ্বিতীয়বার শরৎ মহারাজের সঙ্গে কিছু দিন থাকিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

একদিন গুপ্ত মহারাজকে দেখিবার জন্য শ্রীমান্ বশী আসিয়া শরৎ মহারাজকে লইয়া গেলেন। শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসিয়া

মহাপুরুষকে (স্বামী শিবানন্দ) বলিলেন—কি হয় বলা যায় না। মহাপুরুষ বলিলেন—দেহের যা পরিণতি তা হবেই, এতে বলাবলির কি আর আছে! শরৎ মহারাজ বলিলেন,—যা হবে তা জানি—কিন্তু আমাদের সাম্‌নে চলে যাচ্ছে—শরৎ মহারাজের কথা শেষ হইল না। মহাপুরুষ বুঝিলেন—শরৎ মহারাজের ব্যথা কোথায়।

মহাপুরুষ বলিলেন—যা 'ব'লেছ! বাড়াবাড়ি ক'রেইত অসুখটা বাড়ালে। তুমিও যেমন, ভেবে আর কি হবে বল?' শরৎ মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন। এই ঘটনার দুইদিন পরে বশী আসিয়া সংবাদ দিল গুপ্ত মহারাজ দেহ রক্ষা করিয়াছেন। শরৎ মহারাজ স্থির হইয়া শুনিলেন; তারপর পঞ্জিকা খুলিয়া তিথি ও নক্ষত্র দোষ পাইয়াছেদেখিয়া প্রতীকারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা তাহাও বশীকে বলিয়া দিলেন। বশী বেলুড়মঠে গুপ্ত মহারাজের দেহরক্ষার সংবাদ পাঠাইতে চলিয়া গেল।

পূজনীয় মহাপুরুষ উদ্বোধনে আছেন। একদিন সন্ধ্যার পর একটী সুপুরুষ ভদ্র লোক সুবেশে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিয়া নানা রকম কথা বলিতে লাগিলেন। কথার সঙ্গে মদের গন্ধ প্রচুর আসিতেছিল কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে কোন বেচাল ছিল না। মহাপুরুষও শরৎ মহারাজের নিকট নীচের বসিবার ঘরে ছিলেন। অসুস্থ শরীরে মদের গন্ধ পাইতেই ধীরে ধীরে মহাপুরুষ উঠিয়া পড়িলেন। আমি অনুসরণ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'শরৎ পারে, আমি কিন্তু বাবা সকল সময় এ সকল বরদাস্ত ক'রতে পারি না!' তারপর উপরে

আসিয়া বলিলেন—'শরতের শরীরে সামর্থ্যও ছিল—সেবা ক'রবার মনও ছিল। বরানগর, আলমবাজারমঠে শরৎ চাইত সকলের হাতের কাজ একা ক'র্‌তে! কাজ কর্‌বার ক্ষমতাও আছে—মাথাটীও বেশ ঠাণ্ডা। তাই পারে নানারকম ঝামেলা পোয়াতে।

গুপ্ত মহারাজের দেহ রক্ষার পর মাস ৩।৪ না যাইতে মাদ্রাজ হইতে বেলুড় মঠে সংবাদ আসিল—পূজ্যপাদ শশী মহারাজ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর সংবাদ আসিল—তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিতেছেন। যথা সময়ে শশীমহারাজ কলিকাতায় আসিয়া উদ্বোধনে রহিলেন। তখন শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) পুরীতে থাকিতেন। তিনি শশীমহারাজের কলিকাতায় আসিবার সময় খুরদা রোডে আসিয়া দেখা করেন ও বলিয়া দেন, 'ডাক্তার বৈদ্য যেমনটী বলবে—তা মেনে চলতে হবে কিন্তু।' মহারাজের এ আদেশ শশীমহারাজ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুর যাঁকে টানিয়া লইবেন কাহার সাধ্য তাঁহাকে বাঁচাইবে!

যথাসম্ভব উত্তম চিকিৎসক দেখাইয়া উপযুক্ত ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াও শরৎ মহারাজ শশী মহারাজকে ফিরাইতে পারিলেন না।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর দেহরক্ষার পরে শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে শশী মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।:—

স্বামী সারদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধি

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রিঃ মহারাত্রিঃ মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥" চণ্ডী।

বিগত ৪ঠা ভাদ্র, সন ১৩১৮—ইংরাজী ২১শে আগষ্ট, ১৯১১ খ্রীঃ—বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময়, সাধারণের সুপরিচিত মাদ্রাজস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের অশেষ গুণালঙ্কৃত অধ্যক্ষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের অন্যতম প্রাচীন প্রচারক রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ, মহারাত্রির নিবিড় অঞ্চলাবরণে মহাসমাধিতে সুখ-শয়ন লাভ করিয়াছেন।

১৭৮৫ শকে স্বামিজী ইহ সংসারে আগমন করিয়াছিলেন এবং ১৮৩৩ শকে অভয়ধাম প্রাপ্ত হইলেন—অতএব একোন-পঞ্চাশ বৎসর মাত্র মনুষ্যলোকে আমাদের সহিত নানাভাবে বিচরণ করিয়াছেন!

গুরুগতপ্রাণতা, উদ্দেশ্যের একতানতা, সেবাপরায়ণতা এবং জ্বলন্ত ত্যাগ ও ঈশ্বরভক্তি একদিকে যেমন প্রিয়দর্শন স্বামিজীকে ভক্তের নিকট আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অন্য-দিকে আবার তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, শাস্ত্রজ্ঞান এবং সহানুভূতি ও সহৃদয়তা তাঁহাকে সংসার-দাবদগ্ধ জীবগণের নিকট আশা ও শান্তিপ্রদ আশ্রয়স্থল-স্বরূপে অবলম্বনীয় করিয়াছিল।

প্রথমে আলবার্ট কলেজে এবং পরে মেট্রোপলিটন কলেজে পাঠকাল হইতেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনে আধ্যাত্মিকতা লাভের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। বাল্যকালে পূজাদি

পরে নিত্য নিয়মিত ভাবে বাইবেল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থপাঠ এবং ভক্তাচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম-বক্তৃতা সকলেও সময়ে সময়ে উপাসনা-মন্দিরে সাগ্রহে যোগদান প্রভৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, ঐ পিপাসা তাঁহার প্রাণে ক্রমে ক্রমে কতদূর প্রবল হইতেছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর, শরৎ ও হেমন্তের মধুর সম্মিলন! পূর্ব্বোক্ত পিপাসার চরম পরিণতিতে স্বামিজীর ও দক্ষিণেশ্বরের চির শান্তিপ্রদ শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হওয়া!

এইবার অনুরাগের প্রবল ঝটিকায় জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন! প্রথম, শ্রীগুরু-সকাশে বাটী হইতে গমনাগমন, পরে, গৃহত্যাগ ও কাশীপুর উদ্যানে গুরুগৃহবাস; পরে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীগুরুর অদর্শনে তাঁহার শ্রীপাদুকার সেবা ও পূজামাত্রাবলম্বনে বরানগর মঠে প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল একভাবে অবস্থিতি!

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূজ্যপাদাচার্য্য স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের প্রথম পাশ্চাত্যবিজয় করিয়া মঠে প্রত্যাগমন এবং গুরু-ভ্রাতাগণের সহায়ে ভারতের নানাস্থানে নানা শুভকার্য্যের লোক-হিতায় সংস্থাপন। ঐ বৎসরের শেষভাগেই স্বামিজীর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও মিশনের কেন্দ্র-স্থাপনে গমন। খ্রীঃ ১৮৯৮—১৯১১, প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর, সাম্প্রদায়িকভাব-সমাকুল দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদানুসরণে শ্রীগুরুনামাঙ্কিত 'যত মত তত পথরূপ' বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণা-নন্দের দীর্ঘকাল বাস।

গুরুপদাশ্রিত বীর শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের সহায়ে মাদ্রাজ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ঐ কালে কোন্ কোন্ মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে? হে পাঠক, জীবনপাতী পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ঐ সকল কার্য্যও এই দেবোপম জীবনের বিবরণ শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের অদর্শনে মুহ্যমান মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্য-নিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে, তাহারাই শতমুখে সহস্রমুখে সে সকল কথা বলিতে বলিতে নয়নধারায় বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতেছে!

অথবা স্বার্থশূন্যতা, অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্যের একতানতা দেখিয়াই যদি বুদ্ধিমান্ তুমি, মনুষ্যজীবন ও তৎকৃত কার্য্যকলাপের গুণাগুণ বিচার করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাক, তবে আইস, আমাদের সহিত যোগদান করিয়া অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে বল,—ঈদৃশ জীবন সংসারে দুর্লভ!—স্বার্থ কলুষতাপূর্ণ পৃথিবীতে উহার আদর নাই দেখিয়াই জগতের আরাধ্যদেব উঁহাকে অল্পকালে নিজ সকাশে সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

রোগ দুঃসাধ্য জানিতে পারিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ স্বামিজীকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আনয়ন করেন। বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তিনি কলিকাতা পৌঁছেন এবং ঐ দিন হইতেই কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজগণের হস্তে তাঁহার চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। এইরূপে প্রায় আড়াইমাস কাল কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর অন্তর্গত ১২।১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণশাখা মঠে রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বামিজী সমাধিতে দেহরক্ষা করেন। সমাধিতেই যে তিনি দেহরক্ষা করেন, তদ্বিষয় তাঁহার ঐ কালে সর্ব্বাঙ্গে অসাধারণ

বহুকালব্যাপী পুলক দেখিয়াই তদীয় গুরুভ্রাতাগণ অনুমান করিয়াছিলেন।

শরীর ত্যাগের পর কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠে লইয়া যাইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শরীর পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দিরের নিকটে অগ্নিসাৎ করা হইল!—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

হরিঃ ওঁ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

পূজ্যপাদ শশী মহারাজ শরৎ মহারাজের খুল্লতাত পুত্র ছিলেন। বয়সে শশী মহারাজই বড় ছিলেন। শশী মহারাজ বাড়ীর লোকজন পছন্দ করিতেন না। শরৎ মহারাজের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্ক হেতু—শরৎ মহারাজ শশী মহারাজের খোঁজ খবর লইতে আসিলে তিনি প্রীত হইতেন না। এ জন্য শরৎ মহারাজ রোগ শয্যায় এক শশী মহারাজকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। শশী মহারাজ ভিন্ন রোগ শয্যায় কি গুরু-ভ্রাতাগণকে, কি শিষ্য স্থানীয় সাধুগণকে বশে আনিতে শরৎ মহারাজের ন্যায় দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না।

মাদাম ক্যালভে

জগতে নানারকম লোক আছে। ভাল লোকের মধ্যেও সকলে একরকম হন না। কাহারও প্রতিভা বিদ্যায়, কাহারও বুদ্ধিতে, কাহারও বা বলে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ খুব কম লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্বামী সারদানন্দ রোগীর সেবায় যেমন তৎপর ছিলেন, সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যেমন অনলস ছিলেন, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতে, আশ্রিতকে আশ্রয় দিতে, জিজ্ঞাসুর সংশয় দূর করিতে, বিশিষ্ট অতিথির আগমনে উপস্থিত থাকিয়া অতিথির আনন্দ বর্দ্ধন করিতে, এক কথায় সকল কাজে তিনি যেমন তৎপর ছিলেন শ্রীযুত সান্যাল মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে,—"এমন সকলগুণের গুণনিধি কখনও দেখি নাই, দেখিব কি না জানি না।"

ইং ১৯১১ খ্রীঃ একদিন বৈকাল বেলায় ফরাসী দেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা গায়িকা মাদাম ক্যাল্ভে বেলুড় মঠ দেখিতে আসেন। যখন স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) প্যারিসে ছিলেন, তখন মাদাম ক্যালভের সহিত পরিচয়। সেই পরিচয় শ্রদ্ধা ভক্তিতে পরিণত হওয়ায় যে বৎসর মাদাম ক্যালভে ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া মিশর দর্শনে যান, সে বৎসর তিনি (মাদাম ক্যালভে) স্বামিজীকে সঙ্গে করিয়া দেশ বিদেশ দেখাইয়া

ছিলেন। সঙ্গে মিস্ ম্যাক্‌লাউডও ছিলেন। ভারতের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামিজী মাদাম ক্যালভেকে একবার ভারতবর্ষ দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ যাত্রায় মাদাম ক্যালভের ভারতে আগমন সেই অনুরোধ রক্ষারই ফল।

মাদাম ক্যালভে ইংরাজী ভাষা জানেন না। সঙ্গে দোভাষী আছেন, তিনি ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়া মাদামের কথা বলিয়া যাইতেছেন।

প্রথমে স্বামিজীর সমাধি মন্দির দর্শন করিলেন। সঙ্গে শরৎ মহারাজ ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামিজীর মধ্যম ভ্রাতা) রহিয়াছেন। ভগবানের মন্দিরে ভক্ত যেভাবে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করেন মাদাম ক্যালভে তাহা করিলেন। তারপর বাহিরে আসিয়া মহিমবাবুকে দেখাইয়া শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইনি স্বামিজীর কেউ হন কি? ইঁহার মুখে স্বামিজীর চেহারার কিছু সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।' দোভাষী কথাটা ইংরাজীতে শরৎ মহারাজকে বলিলেন। শরৎ মহারাজও মহিমবাবুর পরিচয় দিলেন। তখন মাদাম ক্যালভে খুব খুসী হইয়া স্বামিজীর সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে মঠের দিকে আসিতে লাগিলেন।

কথামৃতের পাঠকগণ অবগত আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর বড় পণ্ডিত কিম্বা নাম জাদা কোন লোক আসিতেছে শুনিলে কেমন বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ঠিক তেমনই চঞ্চল হইয়া একবার এঘর একবার ওঘর করিতেছেন। দেখিবার ও ইচ্ছা আছে, অথচ সম্মুখে আসিতে ও অনিচ্ছুক, বালকের ন্যায়

সলজ্জ ভাবে মহারাজ একবার পাখী খুলিয়া দেখিতেছেন একবার বসিতেছেন, এবার যেমন দরজা খুলিয়াছেন, ঠিক সেই সময় শরৎ মহারাজ ও মাদাম ক্যালভে আসিয়া গঙ্গার ধারে বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। মাদাম ক্যালভে মহারাজকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন, যেন বুঝিতে পারিয়াছেন—ইঁহার ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। ইতি মধ্যে শরৎ মহারাজ মহারাজের পরিচয় দিলেন। যেমন পরিচয় শুনা অমনি মাদাম ক্যালভে দ্রুত আসিয়া মহারাজের হাত ধরিলেন। অনেক দিন পরে বাপের বাড়ীতে আদুরে মেয়ে ফিরিয়া আসিলে বাপকে দেখিয়া যাহা করে আমরা মাদাম ক্যালভের মধ্যে সেই ভাবের স্ফুরণ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শ্রীশ্রীমহারাজও আর চঞ্চল নহেন তাঁহার সহজ আনন্দময় ভাবে তিনি এখন ভরপুর।

শ্রীশ্রীমহারাজ চলিয়াছেন, পশ্চাতে মাদাম ক্যালভে তারপরে শরৎ মহারাজ এক সঙ্গে ঠাকুর ঘরের দক্ষিণদিকের উঠানে (বসিবার আসন পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট ছিল) আসিলেন এবং সকলে আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের আদেশে শরৎ মহারাজ মাদাম ক্যালভেকে লইয়া ঠাকুর ঘরে গেলেন। আমি তখন ঠাকুর ঘরের কাজ করিতাম। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে বলিলেন—'দে'খ ঠাকুর ঘরে গিয়ে কেউ যেন ভিড় না করে।' মহারাজ কথা কয়টি একটু জোরে বলায়—আমাকে দরজায় থাকিতে হইল মাত্র। ভরসা করিয়া কেহ আর ঠাকুর ঘরে গেলেন না।

স্বামী সারদানন্দ প্রথমে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। মাদাম ক্যালভে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে দোভাষী ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মাদাম ক্যালভে শরৎ মহারাজকে বলিলেন,—স্বামিজী একটা বৈদিক প্রার্থনা বলিতেন, তাহার অর্থ অন্ধকার হইতে আমাদিগকে আলোকময় পথে লইয়া চল। জানি না আপনি এই প্রার্থনাটী জানেন কিনা। যদি জানেন অনুগ্রহ করিয়া বলুন আমার শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।' দোভাষী ইংরাজীতে মাদামের কথা বলিয়া গেলেন। স্বামী সারদানন্দ সুমধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন,—

'অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়।
আবীরা বিম্মর্´এধি ॥'

বেদ মন্ত্র পাঠ শেষ হইল। সকলে নিঃশব্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে মাদাম নতজানু হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে মাদাম যখন উঠিয়া দাড়াইলেন তখন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মাদামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ঠাকুরকে একটী গান শুনাইবেন কি ?

মাদাম গাহিলেন। কি গাহিলেন বুঝিলাম না কিন্তু জীবনে এমন স্বর-লহরীর খেলা কখনও শুনি নাই। মনে হইতেছিল যেখানে নীলাকাশের বায়ুস্তর কম্পরহিত অবস্থায় রহিয়াছে সেই উর্দ্ধে অতি উর্দ্ধ হইতে পাখী যেন গান করিতেছে।

গান শেষ হইবার পরে ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইবার সময়

শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া মাদাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইনি কে? তখন শরৎ মহারাজ মায়ের কথা বলিলেন। মাদাম এখানেও নতজানু হইয়া মাকে বন্দনা করিলেন। তখন শ্রীযুত শরৎ বাবু মাকে একটী গান শুনাইতে অনুরোধ করেন। মাদাম আনন্দের সহিত আর একটী গান গাহিলেন।

মাদামপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন—যখন প্যারিসে ছিলাম তখন আমাদের বাসস্থান মাদামের বাড়ীর খুব নিকটে থাকায় মাঝে মাঝে বাড়ী হইতেই মাদামের গান শুনিতে পাইতাম।

পঞ্চম বর্ষ

ইং ১৯১২ খ্রীঃ শ্রীশ্রীস্বামিজীর জন্মতিথি পূজার দিন সকালে উপরের বারেন্দায় বসিয়া শরৎ মহারাজ তানপুরা সঙ্গে স্বামিজীর রচিত 'একরূপ অরূপ' গানটী প্রথমে গাহিলেন। তারপর, 'মুঝে বারি বনোয়ারী' 'তা থেইয়া তা থেইয়া নাচে ভোলা' গাহিয়া পরে গিরীশবাবুর 'নাচে বাহু তুলে ভোলা ভাবে ভুলে বব বম্ বব বম্ গালে বাজে' গানটী গাহিলেন। গানেরপর স্বামিজীর বিষয়ে কত কথা চলিতে লাগিল। তাহার মধ্যে 'মানা মানি'-প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন—তাহা যেন এখনও কাণে বাজিতেছে। কথা এই :—"যাঁরা কথায় কথায় বলেন—স্বামিজীকে আমরা মানি—তাঁরা কি অর্থে মানি বলেন, অনেক সময় তা বুঝতে পারিনি। এই মানার অর্থ যদি এই হয় যে, আমরা তাঁহার পট পূজা করি—অবশ্যি সেও এক রকম মানা বটে কিন্তু প্রকৃত মানা হল,—তাঁর আদর্শে জীবন গঠন করা, তাঁর প্রদর্শিত পথে অবিচলিত ভাবে কাজ করা।" দেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পরে বলিতে লাগিলেন,—"দেখছনা দেশটা পূজা পাঠের ব্যভিচার ঘটিয়ে তমোগুণে ডুবে যাচ্ছে। প্রকৃত পূজা যদি হত তবে আমাদের এ অবস্থা কেন? আমরা যদি ঠিক ঠিক মানতেই পারতেম তবে কৃষ্ণভক্ত, রামভক্ত, মহাপ্রভুভক্ত, রামকৃষ্ণভক্ত মিলেই ত দেশটাকে স্বর্গ করে তুলতে পারতেম। নীচের ঘরে দেখলাম একটা ছেলে জ্বরে

পড়ে ভুগছে—কেউ তার কাছে নেই। স্বামিজীর উৎসব—রোগীর সেবা—দরিদ্রের অন্নের ব্যবস্থা—কথা শেষ না হইতে বাবুরাম মহারাজ আসিয়া পড়িলেন এবং শরৎ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'হরি হরি বল—সবাই ত স্বামিজীকে বুঝেছে'—বলিয়াই আমাদের দিকে চাহিয়া—যা যা কুটনোর ওখানে যা। আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। অসম্পূর্ণ অংশ আর আমাদের ভাগ্যে শোনা হইল না। কিন্তু কাজ করিতে করিতে Visitors' Room (অতিথির ঘর) হইতে শ্রীযুক্ত পুলিন বাবুর গান শোনা গেল—"মহেশরাণী গৌরী।"

পূর্ব্বে স্বামিজীর তিথিপূজা ও উৎসব এক দিনে হইত না। সুতরাং উৎসবের পরে—শরৎ মহারাজ যে তিথি পূজার দিন বলিয়া ছিলেন,—'নীচে একটা ঘরে দেখলাম—একটা ছেলে জ্বরে পড়ে ভুগছে—কেউ তার কাছে নেই' এ প্রসঙ্গে কথা উঠিল। তখন পূজনীয় মহাপুরুষ ও বাবুরাম মহারাজ সেবা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া শেষ শরৎ মহারাজের সেবা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ও অনুরাগের কথা বলিলেন। আমরা পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের অদ্ভুত সেবা করিবার ক্ষমতার কথাই শুনিয়াছি কিন্তু কখন সেবা করিতে দেখি নাই। কারণ যখন আমরা মঠে আসিয়াছি তখন শরৎ মহারাজের বয়স ৪২।৪৩ বৎসর ছিল। মঠে তখন ৫।৭ জন ব্রহ্মচারী ছিলেন আর তখন এত রোগ জ্বালাও আমাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু শুনিলাম, শ্রীযুতা গৌর মার একবার দারুণ বসন্ত হইয়াছিল। গৌর মা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত সুতরাং

শরৎ মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। কলিকাতার বাহিরে গঙ্গার তীরে এক খানা খোলার ঘরে থাকিয়া গৌর মা তপস্যা করিতেছিলেন। সেই তপস্যার সময় তাঁহার বসন্ত হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ দেখিলেন—ঘরে একখানা মাদুর মাত্র আছে সেখানা রোগীর বিছানার ধারে বিছাইয়া বসিলেন। তারপর সকল শুনিয়া ঔষধ পথ্য সংগ্রহ করিয়া খাওয়াইতে, সমস্ত রকম সেবা করিতে, রোগিণীকে পরিষ্কার রাখিতে ১০।১২ দিন গত হইল। গৌর মা আরোগ্য হইলেন শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসিলেন। একথা পূজনীয়া গৌর মা আমাদের নিকট বলিয়াছেন।

স্বামিজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত (তখন তিনি বেশী সময় মঠেই থাকিতেন) বলিলেন,—তাঁহাদের বাড়ীতে এক জনের বসন্ত হয়। দিন কয়েক সেবা করিয়া বাড়ীর লোক যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল তখন মহিম বাবু যাইয়া শরৎ মহারাজকে (তখন তিনি বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়িতেছেন) সংবাদ দিলেন। শরৎ মহারাজ রাত্রে আসিয়াই বলিলেন—এত দিন তোমরা রাত জেগেছ আজ তোমরা গিয়ে ঘুমোও—। তিনি একা সমস্ত রাত জাগিয়া রোগীর সেবা করিলেন। দিনে কলেজে যাইতেন—রাত্রে আসিয়া একা রোগীর ধারে থাকিতেন। যখন রাত্রিতে জাগিবার কোন প্রয়োজন রহিল না—তখন তিনি যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের অগ্রজ পরে বলিয়াছেন,—ফকির (তুলসীরাম বাবুদের গুরুপুত্র) যখন দারুণ যক্ষ্মা রোগে দ্রুত মৃত্যুর

দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন শরৎ মহারাজ দিন রাত ফকিরের সেবা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের এক আত্মীয়ের বসন্ত হইয়াছিল। তখন শরৎ মহারাজের হাতে একটা ক্ষত ছিল। ক্ষতস্থানটীতে একটা পটি বাঁধিয়া তিনি রোগীর সেবায় লাগিয়া গেলেন। ১২।১৪ দিন এই ভাবে সেবার পরে রোগী আরোগ্য লাভ করিল। একথা আমরা পরে মঠে শুনিয়াছি।

পূজনীয় কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) শরৎ মহারাজের দেহ রক্ষার পরে বলিয়াছেন,—আমার পায়ে ঘা হইয়াছিল—কি দুর্গন্ধ তাতে আবার পোকা পড়িয়াছিল—শরৎ একটী একটী করিয়া পোকা বাছিয়া বাহির করিত, তিন মাস অক্লান্ত সেবা করিয়া আমার প্রাণ দান করিয়াছিল।

কি নিজ গুরু-ভ্রাতাগণের রোগ-শয্যায়, কি শিষ্য স্থানীয় সন্ন্যাসীদের রোগে স্বামী সারদানন্দের উপস্থিতিই যেন একটা শান্তি —একটা নিশ্চিত আরোগ্যের বার্তা আনিয়া দিত। কেমন করিয়া যে তিনি রোগীকে বশে আনিয়া ফেলিতেন তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয় ছিল।

শ্রীশ্রীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) একবার টাইফয়েড্ জ্বর হয়। মহারাজ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু স্নানের নাম করেন না। বলরাম বাবুর বাড়ী (৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, বাগবাজার) হইতে গঙ্গার ধারে, এই সামান্য পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইবার কোন উৎসাহও দেখান না। তখন শরৎ মহারাজ বলরাম বাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন। শরৎ মহারাজ বলিয়াছেন,

'মহারাজের পেটের চামড়ার ভাঁজে ঘামে পচিয়া ঘা হইয়াছে, কি দুর্গন্ধ! কিছুতেই মহারাজ স্নানের নাম করেন না। একদিন দুই বালতি জল না এনে—মহারাজকে বুঝিয়ে ত নিয়ে এলাম। জল দেখেই মহারাজ বলে উঠলেন—তুমি বুঝচ না শরৎ স্নান করলেই আবার জ্বর হবে। কত বুঝালেম—শেষ কিন্তু হাতে ধরে নিয়ে আসতে হল। সেই চামড়ার ভাঁজে কত সন্তর্পণে সাবান জল দিয়ে ধুইয়ে দিলাম—তখন মহারাজ খুব খুসী। এই ভাবে একদিন অন্তর স্নান চলতে—মহারাজের ঘা সেরে গেল। কিন্তু গঙ্গার ধারে যেতে বললে বলেন,—শরৎ বুঝচ না—গাড়ীতে উঠতে গেলেই heart fail (হৃদযন্ত্র বন্ধ) করবে। বেশত উঠেই দেখ না কেমন heart fail করে বলে যখন হাত ধরে এনে গাড়ীতে বসালেম তখনও মহারাজ বলছেন শরৎ বুঝচ না—গাড়ী চলতে আরম্ভ করলেই heart fail করবে।' এই বালক-সুলভ আতঙ্ক শ্রীশ্রীমহারাজের মধ্যে এমন সুন্দর মানাইত যে, তাহা কেহ nervousness (দুর্ব্বলতা) বলিতে পারিত না। বালকের হাত ধরিলেই যেমন সে ভরসা পাইয়া থাকে, শ্রীশ্রীমহারাজে ছিল সেই বালক ভাব।

শরৎ মহারাজের আন্তরিক যত্নে শ্রীশ্রীমহারাজ স্নানও করিলেন—পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গার ধারেও গেলেন—কিন্তু তাহা আরম্ভ করাইতে রোজ যে কত কাণ্ড উপস্থিত হইত—মহারাজও করিবেন না, শরৎ মহারাজও ছাড়িবেন না—সে এক মজা!

এ কিন্তু বেশী দিনের কথা নয়। স্বামী চিদানন্দ (গোঁসাই) কালাজ্বরে ভুগিতেছে। উদ্বোধনে আছে—চিকিৎসা চলিয়াছে।

হঠাৎ একদিন গোঁসাইর অসুখ বাড়িয়া গেল—সকলেই গোঁসাইর আশা ছাড়িয়া দিলেন। গোঁসাইও তাহা বুঝিয়াছিল। সুতরাং বায়না ধরিল—'হরিনাম করবো আর ডাব খাবো। ইনজেকসনের কথা বলিলে—তার উত্তরে বলে—'ওসব হবে না, হরি নাম করবো ডাব খাব।' শরৎ মহারাজও শুনিলেন। তখন তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া গোঁসাইর পাশে দাঁড়াইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তারপর গোঁসাইর সঙ্গে কত কথা হইল। 'হরিনাম করবো আর ডাব খাব' একথা গোঁসাই ঠিক রাখিয়াছে—আর ইনজেকসন্ ত নিবেই না তাহাও স্থির করিয়াছে। কিন্তু শরৎ মহারাজের কথার মধ্যে 'সাধুর হরিনাম করাই শ্রেষ্ঠ কাজ—আর ডাবের জল তা যখন ভাল জিনিষ তা খাবে বৈকি,—ইত্যাদির সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তির পরে ইনজেকসন নিতে গোঁসাই রাজী হইল। ইনজেকসনে এবার কিন্তু রোগের উপশম হইল,—গোঁসাই আরোগ্য লাভ করিল।

রোগীর সেবায় এবং পরবর্ত্তী সময়ে রোগীর সেবার ব্যবস্থা করিতে স্বামী সারদানন্দের ন্যায় কর্ম্ম-কুশলী খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার হৃদয়বত্তার সহিত অপরিসীম ধৈর্য্য ছিল বলিয়াই তিনি কর্ম্মে জয়শ্রী সহজে লাভ করিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া আরও কিছু ছিল—যার জন্য তিনি উপস্থিত হইলেই রোগী আরাম বোধ করিত।

'আশ্রিত-বৎসল' কথাটী বড় লোকের জন্য চিরদিন রাক্ষিত আছে। কিন্তু নিজের ষোল আনা অসুবিধা স্বীকার করিয়া অপরকে পালন করিব—আশ্রিত-বাৎসল্যের সংজ্ঞায় এমন কোন

ধরাবাঁধা নিয়ম দেখা যায় না। আমাদের যোগীন মার মেয়ের ঘরে•চারিটী নাতি, তাহাদের বড়টীর মাথা খারাপ, বাপ নাই, মা নাই ছেলেদের কেবা দেখিবে, কেবা তাদের পড়ার জন্য যত্ন নিবে—এই সমস্যা যখন যোগীন মার নিকট উপস্থিত হইল—তখন শরৎ মহারাজ ছোট তিনটীকে আনিয়া উদ্বোধনে রাখিলেন। যোগীন মা তাঁহার বাপের বাড়ীতে থাকিতেন। দিনে সকাল বিকাল উদ্বোধনে আসিয়া ঠাকুরদের কাজ কর্ম্ম করিয়া চলিয়া যাইতেন। ছেলে তিনটী দিনের বেলা এঘরে ওঘরে বসিয়া পড়া করিত, রাত্রিতে শরৎ মহারাজের ঘরে শয়ন করিত। বাড়ীতে ছেলে তিনটী দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শুইত—সে কথা শরৎ মহারাজ শুনিয়াছিলেন। পাছে ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগে—অসুখ হয় এজন্য সমস্ত গরমের কালেও শরৎ মহারাজকে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিতে হইত। একে তিনি স্থূলকায় ছিলেন সমস্ত দিন লীলা-প্রসঙ্গ রচনায় ব্যস্ত থাকিতেন—তাহার উপর রাত্রে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ, বৎসরের পর বৎসর চলিয়াছে,—এজন্য কেহ তাঁহাকে কখন বেজার দেখেন নাই। যোগীন মার দ্বিতীয় নাতিটী বড় চাপা প্রকৃতির। একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন,—তাঁকে আমরা সাধু বলে জানতাম না—মার সঙ্গে যেমন করতাম তাঁর সঙ্গেও তেমনই করেছি। একদিন রাত্রে জল হচ্ছিল। আমরা শুয়ে আছি—মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কি ভুলু, জেগে আছ? আমি সাড়া দিলাম। পাখীগুলি বন্ধ করবে? আমি বললাম—আপনি দিন। তিনি উঠে পাখী বন্ধ করে দিলেন। ভুলু কিন্তু তখন এম, এ পাশ করিয়াছিল।

মানবের কল্যাণ-কামনায় কাজ করিতে শরৎ মহারাজের কখন ক্লান্তি বোধ হইত না, ধৈর্য্যেরও কোন অভাব দেখা যাইত না। যখন শরৎ মহারাজ বলরাম বাবুর বাড়ীতে থাকিতেন তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল শ্রীযুত গণেন্দ্রনাথকে সংস্কৃত শিখাইবেন। সুতরাং উপক্রমণিকা আসিল, গণেন দুই চারি দিন পড়িলেন, তারপর আর পড়েন না। তখন গীতা পড়াইতে সুরু করিলেন—এবং সমস্ত গীতাখানা ভাল করিয়া পড়াইয়া দিলেন। এই গীতা তিনি জয়রামবাটিতে আমাকেও পড়াইয়াছিলেন। আর সেবক সাতু (স্বামী অসিতানন্দ) কে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন উদ্বোধনে। এই গীতা পড়াইতে যে ধৈর্য্য তিনি দেখাইয়াছেন তাহার সহস্র গুণ ধৈর্য্য ও পরিশ্রম দেখাইয়াছেন, কোয়ালপাড়ার মঠে সন্ন্যাসীদের আরাত্রিকের গানটী শিখাইতে,—কাশী অদ্বৈতাশ্রমে আদিনাথ প্রণবরূপ গানটী শিখাইতে, পুরীতে স্বামিজীর কায়দায় তাঁহার প্রিয়গানগুলি শিষ্য স্থানীয় সন্ন্যাসীদের শিখাইতে। সেকথা আমরা যথা সময়ে আলোচনা করিব।

শরৎ মহারাজ সুকণ্ঠ ছিলেন—মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি স্বামিজীর অত্যন্ত অনুগত ছিলেন বলিয়া চাল চলন, গান গাহিবার ভঙ্গী অনেকটা স্বামিজীর অনুরূপ হইয়াছিল। এইজন্য গুরুভ্রাতাগণ শরৎ মহারাজকে 'ছোট নরেন' (নরেনের ছোট সংস্করণ) বলিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিতে শুনিয়াছি, দূর হতে বোঝা যেতনা শরৎ গাইছে কি স্বামিজী গাইছেন।

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের কাছে যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শেষ হইত না তেমন শরৎ মহারাজ ও হরি মহারাজের কাছে

স্বামিজীর কথার ও ইতি ছিল না। স্বামিজীর সকল কথা বলিতে শরৎ মহারাজকে উৎসাহিত দেখিয়াছি কিন্তু স্বামিজী যে দিন বলিয়াছিলেন, 'শরৎ, গঙ্গাধর! ঠাকুরকে দেখে ঘর ছেড়েছ— যাতে ভগবান্ লাভ হয় তার জন্য প্রাণপাত তপস্যা আরম্ভ কর— আমার সেবা কাউকে করতে হবে না, কাল থেকে তোমরা চল তোমাদের পথে –আমিও বেরুব,—যে দিকে দুচোখ যায়, এই কথা যতবার শরৎ মহারাজের কাছে শুনিয়াছি ততবারই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,—বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখের চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, স্বর করুণ হইয়াছে। গভীর বেদনার মধ্যে ঐ কথা কয়টী তিনি যেন মুগ্ধের ন্যায় আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন।

স্বামী সারদানন্দ তাঁহার শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিন্দুকে সিন্ধু করিয়া লইতে শিখিয়াছিলেন। যখন শরৎ মহারাজ বলরাম বাবুর বাড়ীতে থাকিতেন তখন হইতে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গী। সেবক বলিলাম না এইজন্য—তখন শরৎ মহারাজ ঘর ঝাঁটান হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের সমস্ত কাজ করিতেন—অধিকন্তু কখন কখন গণেনের পরিত্যক্ত কাপড় খানাও ধুইয়া শুকাইয়া রাখিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যকাল হইতে তিনিটী গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল,—(১) বিশ্বাসী ও মিতব্যয়ী (২) কর্ম্মে পরম উৎসাহী (৩) অতি প্রখর সহজ বুদ্ধি (Strong Common Sense)। যখন ব্রহ্মচারী কপিল (স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ) দক্ষতার সহিত সাত বৎসর উদ্বোধনের কাজে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন—তখন তীর্থাদি পর্য্যটন ও কিছুদিন ধ্যান-ধারণা

করিবেন বলিয়া উদ্বোধনের ম্যানেজারের পদ ত্যাগ করিলেন। শরৎ মহারাজ প্রথমে কপিলকে ছাড়িলে কাজ চলিবে না ভাবিয়া কপিলকে থাকিবার জন্য অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু কপিল যখন শরীরের জন্য আর পরিশ্রম করিতে পারিতেছেন না বলিলেন তখন শরৎ মহারাজ ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথকে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করিলেন। ভগিনী নিবেদিতার সময়ে গণেন্দ্রনাথ স্কুলের কাজকর্ম্ম কিছু কিছু দেখিতেন। সুতরাং ভগিনী নিবেদিতার দেহরক্ষার পরে নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ের কাজ গণেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইলেন। উত্তরকালে শরৎ মহারাজ নিবেদিতা স্কুল পরিচালনের ব্যবস্থাদি গণেন্দ্রনাথের উপরে প্রায় সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়াছিলেন। এ প্রকারে—কর্ম্মের দায়িত্ব প্রদান ও আন্তরিক সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদান করিয়া কর্ম্মীর আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করিতে শরৎ মহারাজ সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন। সেবকগণের আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করিতে যাইয়া শরৎ মহারাজ 'উৎসাহ' 'অনুরোধ' 'ধমকানি' যেখানে যেমন তাহা দৃঢ়তার সহিত প্রয়োগ করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবক কেহ অক্ষম হইয়া থাকে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তা বলিয়া তিনি কাহাকেও কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন না।

এই 'উদ্বোধন' পত্রিকার পরিচালনের ভার স্বামিজী প্রথমে তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীত স্বামীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী উদ্বোধনের বিশেষ উন্নতি করিবার পূর্ব্বেই আমেরিকায় প্রচার কার্য্যে গমন করেন।

তদবধি স্বামী শুদ্ধানন্দ সম্পাদকের পদে থাকিয়া উদ্বোধন

পত্রিকায় স্বামিজীর ইংরাজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ করিয়া যশস্বী হন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ লীলা প্রসঙ্গ ও ভারতে শক্তি পূজা রচনা করিয়া উদ্বোধনের শক্তি বৃদ্ধি করেন। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় উদ্বোধন গ্রন্থাবলী নব কলেবর ধারণ করিল—উদ্বোধনের আর্থিক অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হইল।

ইং ১৯০৯ সনে শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে শুভাগমন করেন। তদবধি স্বামী সারদানন্দ মায়ের বাড়ীর 'দ্বারী' হইয়া রহিলেন।

একদিন উদ্বোধনে আহারের সময় মঠ হইতে আগত একজন সাধু বলিতেছিলেন,—"মঠে ছেলেরা কাজ কর্ম্ম করে না—কথা বললেও শোনেনা ইত্যাদি ইত্যাদি।"

শরৎ মহারাজও আহার করিতেছিলেন আর সেই কথা যখন একটু ভাষ্যাকারে বক্তা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—তখন তিনি একেবারে সোজা হইয়া বসিয়া বক্তার মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"হ্যাঁ হে তুমি যে বল্ছ ছেলেরা কাজ কর্ম্ম কিছু করেনা—তবে মঠের এত কাজ করে কে? এ প্রশ্নের উত্তর কেহ দিলেন না; শরৎ মহারাজও আর বাক্যব্যয় না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নীরবে আহার করিতে লাগিলেন।

একদিন বৈশাখমাসে শরৎ মহারাজ লীলা প্রসঙ্গ লিখিতে ব্যস্ত আছেন এমন সময় পোষাক পরিচ্ছদে একজন ভদ্রলোক বেলা প্রায় ৯টার সময় আসিয়া শরৎ মহারাজের পাশে বসিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—নরেন দত্ত এমন কি কাজ করেছিল যাতে তাকে আপনারা একেবারে আচার্য্য বলতে আরম্ভ করেছেন? শরৎ মহারাজ প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া বাঁহাতের উল্টা পিঠ দিয়া

চিবুক ঘসিতে লাগিলেন। প্রশ্নকর্ত্তা উত্তর না পাইয়া যেন উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"কলেজেও সে খুব ভাল ছেলে ছিল না, বিশ্ববয়াটেইত ছিল। সন্ন্যাসী হ'ল, আর একেবারে আচার্য্য! কোনগুণে এমন হল বলতে পারেন?" এমন ধরণের কতগুলি কথা সেই ভদ্রবেশধারী লোকটী বলিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'যা আমার কাছে বলেলেন তা যেন যেখানে সেখানে বলে না বসেন। আজকালকার ছেলেরা মোটেই সুবিধার নয়। কোথায় এমন লোকের হাতে ঠেকে যাবেন শেষটা একটা কাণ্ড না বাধিয়ে বসেন!' শরৎ মহারাজকে এইভাবে দৃঢ়তার সহিত কথা বলিতে দেখিয়া লোকটী আস্তে আস্তে বিদায় হইল। ভদ্র বেশে এমন অভদ্র এদেশে বিরল নহে জানি। কিন্তু গায়ে পড়িয়া মুখের উপরে এমন প্রশ্ন কেহ করিতে পারে এ ধারণা কখন ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একদা একজন ভক্ত আসিয়া বলিলেন, নরেন যা তা খায়। ভক্ত ভাবিয়াছিলেন ঠাকুর স্বামিজীকে এজন্য নিশ্চয়ই মন্দ বলিবেন।

কিন্তু উল্টা সম্‌ঝিলি রাম! ঠাকুর সেই লোকটীর উপরে বিলক্ষণ খাপ্পা হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"শিবনিন্দা যে করে তার মুখ দেখতে নাই। শাস্ত্রে তার শিরশ্ছেদ করতে বলেছে।" লোকটী মানে মানে বিদায় হইল।

ষষ্ঠবর্ষ

ইং ১৯১৩ খ্রীঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের পরে একদিন শরৎ মহারাজ মঠে আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবার পরে বাবুরাম মহারাজের সহিত কথা বলিতেছেন। এমন সময় আমার ডাক পড়িল। আমি আসিয়া দাড়াইয়াছি, শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'দোলযাত্রার সময় পুরীতে থাকব ভাবছি—তুমি সঙ্গে যাবে, বাবুরামদা মত দিয়েছেন।' কবে আমাকে উদ্বোধনে যাইতে হইবে? তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, —'আচ্ছা তিন দিন পরে যেও।' নত মস্তকে আমি ফিরিয়া আসিলাম।

শরৎ মহারাজ পুরী যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া দেখা গেল—পুরী এক্সপ্রেসে স্থান নাই। তখন তাড়াতাড়ি করিয়া মাদ্রাজ মেলে উঠা গেল। অর্থাৎ সকালে খুরদাতে নামিতে হইবে, তাহার পরে এক্সপ্রেস আসিলে তাহাতে উঠিয়া পুরী যাইতে হইবে। যথা সময়ে শরৎ মহারাজ আসিয়া 'শশী নিকেতনে' উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন—বলরাম বাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বাবুর বড় জামাতা, তাঁহাদের বাড়ীর সকল, শশী নিকেতনে আছেন। শরৎ মহারাজের সঙ্গে যোগীন মা, যোগীন মার মা ও আমি। সুতরাং তাঁহাদের শশী নিকেতনে স্থিতি পর্য্যন্ত শরৎ মহারাজ সহ আমরা তাঁহাদের অতিথি হইয়া

রহিলাম। দুই সপ্তাহ পরে রামবাবুর জামাতা তাঁহার লোকজন সহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অতবড় বাড়ীতে তখন আমরা চারিজন মাত্র রহিলাম।

প্রথম স্বাধীনতার সঙ্গে শরৎ মহারাজ ব্যবস্থা করিলেন,—সকালে চা পান করিয়া মন্দিরে যাইবেন। মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া লেখা পড়ার কাজ করিবেন। বৈকালে চা পান করিয়া সমুদ্রের ধারে যাইবেন। সন্ধ্যার পরে বাড়ীতেই থাকিবেন। বিশেষ পর্ব্ব দিন না হইলে সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে যাইবেন না।

শরৎ মহারাজ পুরী আসিয়াছিলেন—পায়ে বাত বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া। সুতরাং সমুদ্রের জলে পা ডুবাইয়া হাটিতে ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পরে শরৎ মহারাজ সমুদ্রের ধার হইতে ফিরিতেন—আমি মন্দির হইতে ফিরিতাম। নীচের হল ঘরে শরৎ মহারাজ, যোগীন মা আমি বসিয়া থাকিতাম। তারপর শরৎ মহারাজ যে দিন যেমন প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেন—তেমন ভাবের কথা চলিতে থাকিত—যোগীন মা বসিয়া জপ করিতেন।

এক দিন শরৎ মহারাজ প্রথম বয়সে তিনি, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি যে ভাবে পুরীতে থাকিয়া সাধন ভজন করিয়াছিলেন—তাহার বিষয় অনেক কথা বলিলেন।

অন্য একদিন শ্রীচৈতন্য দেবের কথা আরম্ভ হইল। মহাপ্রভুর ভীষণ কঠোরতার কথা তিনি বলিয়া গেলেন—মুগ্ধ হইয়া

ছিলেন। পাণ্ডারা তাঁকে মন্দিরে ঢুক্‌তে দেয় নি। তখন তিনি বাইরে বসে এই গানটি গেয়েছিলেন। আর সেই গান শুনতে লোকের ভিড় লেগে গেল—তখন কে দেখে মন্দিরে আরতি হচ্ছে কি হচ্ছে।'

যোগীন মা বলিলেন—ঠাকুরবল্‌তেন না—ভক্ত, ভগবান্, ভাগবত তিন অভেদ ?

শরৎ মহারাজ—হ্যাঁ—তিনি কতবার বলেছেন,—"ভক্ত, ভগবান্, ভাগবত তিন এক—একই তিন।"

ঘড়িতে টং টং করিয়া ৯টা বাজিল। আমি উঠিয়া মহারাজের আহারের জন্য আসন হইয়াছে কি না দেখিতে গেলাম।

পুরীতে অবস্থান কালে শরৎ মহারাজের কোন রকম অসুবিধা না হয়, এইজন্য রামকৃষ্ণ বাবু (বলরামবাবুর পুত্র) পাচক ও চাকরের বন্দবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পরে এক দিন শরৎ মহারাজ বলিলেন,—তুমি ত রোজ মন্দিরে যাচ্ছ—ভাল করে মন্দিরের সকল দেখে তোমার কি ধারণা বলতে পারবে ?

আমি—কোন লাইনে দেখব বলুন—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে ভাবে মন্দিরের বিষয় লিখেছেন সেই ভাবে—না যখন বেল পাতা দিয়ে পূজা হত ; জগন্নাথ ছিলেন ভৈরব, বিমলা ছিলেন দেবী গরুড় স্তম্ভের ওখানে—অথবা বাল-গোপাল মন্ত্রে যে এখন তুলসী দিয়ে পূজা হচ্ছে সেই লাইনে ?

শরৎ মহারাজ—তুমি তা হলে সকল কথাই কিছু কিছু জেনেছ, কে বল্লে তোমায় ?

আমি—একদিন আপনিই ত কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

বলরাম, সুভদ্রা, জগন্নাথ বৌদ্ধদের ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, বুদ্ধের (symbol) প্রতীক। তারপর থেকে সেই বিষয়ে বেশী কিছু জানতে পারি নাই। তবে পাণ্ডাদের নিকট থেকে শঙ্করাচার্য্যের সময় যে জগন্নাথ ভৈরব বিমলা দেবী ছিলেন—এবং বেলপাতায় যে পূজা হত, নবরাত্রে (দুর্গোৎসবের সময়) মেড়া বলি হত—এই সকল কথা শুনেছি। তখন সেই যে মুক্তি মণ্ডপের পূবের দেয়ালের গায়ে সিঁদুর মাখান কুকুর মূর্ত্তি রয়েছে তা জগন্নাথের বেদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল—ভৈরবের বাহন বলে।

শরৎ মহারাজ—তারপর?

আমি—বৈষ্ণবরা আপত্তি তুললেন আমরা শিবের প্রসাদ না হয় গ্রহণ করলেম কিন্তু কুকুরের প্রসাদ কেন খেতে যাব? তারপর আচার্য্য রামানুজ স্থাপিত এমার মঠ হতে নানা প্রকার আন্দোলন হ'তে লাগলো। তখন রাজাকে হাত করতে পারলেই যেমন ইচ্ছা অদল বদল ঘটান যেত। এমার মঠ হতে মন্দির মেরামতের জন্য অনেক টাকা দেওয়া হল, রাজা নানা রকম বাধ্য বাধকতায় পড়ে ভৈরবের বাহন কুকুর জগন্নাথের বেদী-গাত্র হইতে স্থানান্তরে রক্ষা করলেন। ইং ১৯১৩ খ্রীঃ ঠিক ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম তুলসী পাতা দিয়া জগন্নাথ বাল গোপাল মন্ত্রে পূজিত হ'তে আরম্ভ করলেন—বিমলার জন্য নূতন মন্দির হ'ল—তাহার স্থানে গরুড় স্তম্ভ স্থাপিত হ'ল—শেষ মন্দিরের কপালে রামানুজী তিলক শোভা পেল।

শরৎ মহারাজ—৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রথম তুলসী দিয়ে পূজা আরম্ভ হয়েছিল কে বল্লেন তোমায়?

আমি—বুড়ো গোবিন্দ পাণ্ডা বলেছেন। তার বাবার সময়ে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল।

শরৎ মহারাজ—তোমার কি বিশ্বাস বৌদ্ধ মন্দির হিন্দুরা নিজস্ব করে নিয়েছে?

আমি—সে সম্বন্ধে ত্রিপিটকের ছবি না দেখা পর্য্যন্ত কেমন করে বলব। আমি যে ধর্ম্ম সঙ্ঘ বুদ্ধের symbol এমনও দেখি নাই।

যোগেন মা—ও তোমাদের কেমন এক স্বভাব, কথা বলতে বলতে ইংরাজী না বলে পার না!

শরৎ মহারাজ—ও আজকালকার ছেলেদেরই স্বভাব। দেখতে পাও না ভুলু, মণ্টে, কেতো—কেমন বলে।

যোগীন মা—তা আর বলবে না!

এ বিষয়ে সে দিন আর কোন কথা হয় নাই। অন্য অন্য দিন মন্দির সম্বন্ধে যা যা কথা হইয়াছিল তাহা অন্য রকম কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

পুরীতে শরৎ মহারাজ পাঁচ মাস ছিলেন। এই সময় পুঁটের মহারাণী শ্রীমতীহেমন্তকুমারীদেবীর দৌহিত্রগণ শরৎ মহারাজের নিকট আসিত। তাহারা তিন ভাই তখন ছেলে মানুষ ছিল। শরৎ মহারাজ এই নাবালক পলটনের সঙ্গে বসিয়া বেশ গল্প জমাইতেন। তখন কে বলিবে যে তিনি এত গম্ভীর!

পুরীতে শরৎমহারাজ শশী নিকেতনেই আছেন। সেদিনও বৈকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন। আমি মন্দিরে গিয়াছি। প্রায় একই সময়ে আমরা শশী নিকেতনের সম্মুখে

আসিয়াছি তখন রাত্রি প্রায় ৮টা। ফটকের ধারে আসিতে দেখি—সমস্ত বাড়ী খানা বন্দুক হাতে সিপাই শান্ত্রীতে ঘিরিয়া রহিয়াছে। উঠানে তাম্বু পড়িয়াছে সমস্ত বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছে। দ্বারী কাহাকেও বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিতেছেনা। আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া এমন সময় ঐ বাড়ীর রক্ষক কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল—মহারাজ দেখুন দেখি কি বিপদ! প্রথমে আমরা বুঝিতেই পারি নাই প্রবল ইংরাজের রাজ্যে আসিয়া সামান্য বুঁদির এক ভূঁইয়া রাজা এমন উৎপাত কি করিয়া করিতে পারে! মহারাজ ধীর স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় রাজার (Private Secretary) প্রাইভেট্ সেক্রেটারী আসিলেন এবং শরৎ মহারাজকে ইংরাজীতে বলিলেন—আপনারা আপনাদের মালপত্র লইয়া যাইতে পারেন। উত্তরে মহারাজ বলিলেন—আপনি বোধ হয় ভুল করিয়া থাকিবেন—এ বুঁদি নয়—খাস ইংরাজের রাজ্য। কথার ভঙ্গীতে রাজার সেক্রেটারী দুইহাতে মহারাজের পাদস্পর্শ করিয়া পাণ্ডার কীর্ত্তির কথা বলিয়া মহারাজকে ভিতরে লইয়া গেলেন। আমরাও অনুসরণ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে শশীনিকেতনের কর্ম্মচারী মহাশয় চারিখানা গরুর গাড়ী আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার দুই খানাতে আমাদের জিনিষ পত্র উঠিল। আমরা রামকৃষ্ণ বাবুদের সমুদ্রের ধারে একখানা দোতালা বাড়ী খালি ছিল সেখানে রওনা হইব এমন সময় রাম বাবুর কর্ম্মচারী আসিয়া শরৎ মহারাজকে বলিলেন,—মহারাজ আমাকে ত যেতে দচ্ছে না—ওদের এনে কি করে গাড়ীতে তুলি এখন?

শরৎ মহারাজ তখন বুঁদি রাজের সেক্রেটারীকে—হাসিয়া বল্লিলেন,—"তোমার সান্ত্রী এঁকে এর পরিবার লইয়া যাইতে দিতেছেনা।" তখন সেক্রেটারী আসিয়া সান্ত্রীকে আদেশ করিলেন—কর্ম্মচারী তার পরিবারকে উদ্ধার করিতে পারিয়া 'দুর্গা নাম' স্মরণ করিতে করিতে এক বন্ধুর বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

বুঁদির রাজার জন্য মন্দিরের নিকট এক ধর্ম্মশালা স্থির ছিল। রাজা সেই বাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসায় জানিলেন—উহা ধর্ম্মশালা। তখন পাণ্ডাকে বলিলেন,—দ্বিতীয় বাড়ী দেখ। পাণ্ডা রামকৃষ্ণ বাবুর কর্ম্মচারীকে কিছু না জানাইয়া—রাজাকে লইয়া আসিয়া একেবারে শশীনিকেতন দেখাইয়া দিল।

এই ভাবে শশীনিকেতনে রাজ আগমন পর্ব্ব সাধিত হইল।

মহারাজ সমুদ্রের ধারের বাড়ীতে আসিলেন এবং সেই রাত্রে মন্দির হইতে প্রসাদ আসিল। প্রসাদ পাইতে বসিয়া মহারাজ প্রসন্ন ভাবে বলিলেন,—রাজার উৎপাতে 'প্রসাদ' পাওয়া, এ বড় কম কথা নয়।'

সাতদিন থাকিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। বাড়ীঘর পরিষ্কার করিতে আর সাতদিন গত হইল। শরৎ মহারাজ ইহার পর শশীনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। যদিও সেই ঘটনায় আমি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিলাম, তবুও ঐ আগন্তুক উৎপাতের মধ্যে মহারাজকে চমৎকার শান্তভাবে প্রত্যেকটী কথা ও কাজ করিতে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের 'গৌরবে' যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিয়াছিলাম।

সে দিন ছিল জগন্নাথের রথযাত্রা। শরৎ মহারাজ, যোগীন মার মা, যোগীন মা আমরা একখানা গাড়ী করিয়া বাহির হইলাম। এবং জগন্নাথদেবকে রথে উঠিতে দেখিয়াই অন্য পথে মন্দির ও গুণ্ডিচা বাড়ীর মধ্য স্থানে আসিয়া রথ টানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। বেলা প্রায় ১টায় রথ আসিল—ততক্ষণ শরৎ মহারাজ মহাপ্রভু রথের সময়ে কি করিতেন তাহা বলিতেছিলেন—আমরা তিন জনে শুনিতেছিলাম। শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'রথের দিন মহাপ্রভু প্রথমে রাস্তা ঝাড়ু দিতেন। তারপর রথের সম্মুখে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যখন রথ টানা আরম্ভ হবে তখন তিনি রথের পিছনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা দিয়ে রথকে ধাক্কা দিতেন ঠিক সেই সময় লক্ষ ভক্তের জয়ধ্বনির মধ্যে রথ টানা আরম্ভ হ'ত। তখন মহাপ্রভু সদলবলে এসে রথের সম্মুখে নৃত্য করতেন। কখন বা একাই নাচতেন কখন বা অদ্বৈতকে নাঁচবার জন্য আদেশ করতেন। এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, এমন সময় রথ আসিতেছে দেখিতে পাইয়া শরৎ মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরাও উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে রথ আসিয়া দাঁড়াইল। এখানে একবার জলযোগ করিয়া তবে জগন্নাথ রথ চালাইবার আদেশ দিবেন। সুতরাং যতক্ষণ তাঁহার ভোগ হইতেছিল ততক্ষণে মহারাজ সহ আমরা আসিয়া রথের দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভোগ শেষ হইলে রথটানা আরম্ভ হইল। ধীরে ধীরে রথ চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে মহারাজও চলিয়াছেন। আমি যোগীন মার

মার হাত ধরিয়া চলিয়াছি। যখন রথের বেগ বৃদ্ধি হইল তখন মহারাজ দড়ি ছাড়িয়া দিলেন। আমি যোগীন মার মাকে রাস্তার ধারে রাখিয়া ছুটিয়া গিয়া দড়ি ধরিলাম ও কিছুক্ষণ রথ টানিয়া ফিরিয়া আসিলাম। শশী নিকেতনে ফিরিতে দুইটা বাজিয়া গেল।

রাত্রিতে পূর্ব্বের ন্যায় শরৎ মহারাজ ও আমি চুপ করিয়া বসিয়া আছি। যোগীন মা জপ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে শরৎ মহারাজ প্রথমে রথের কথা তুলিলেন। ভারতে এই রথের উৎসব নাকি বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রথমে প্রচলন হইয়াছিল। তারপর শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধ বিজয়ের পরে বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তিগুলিকে কোথাও কৃষ্ণ, কোথাও ধর্ম্ম, কোথাও বা বিষ্ণু প্রভৃতি নাম দিয়া হিন্দুরা গ্রহণ করিল—সঙ্গে সঙ্গে রথ ও উৎসবের জন্য রহিয়া গেল।

'শরৎ'—যোগীনমা শরৎ বলিতেই মহারাজ কথা বন্ধ করিলেন। যোগীনমা বলিলেন,—শরৎ, মহাপ্রভু জগন্নাথের অঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন—না ?

মহারাজ—শুনেছি মহাপ্রভুর দেহরক্ষার পরে রাজা ও ভক্তগণ মহাপ্রভুর দেহ মন্দিরের মধ্যে এনে দরজাগুলি বন্ধ করে দেন। অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে তাঁরা বাইরে এসে প্রচার কল্লেন মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ জগন্নাথের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার মনে হয়—মন্দিরের মধ্যেই মহাপ্রভুকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল।

যোগীনমা—তোমার বাপু ইংরেজী পড়া মন—তাই অমন ভাবতে পার। শরৎ মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন।

জুলাই মাসের শেষভাগে শরৎ মহারাজ কলিকাতা ফিরিলেন। আমি বেলুড়মঠে ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পনর দিন পরে কাঁথি বন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে সেবা কার্য্যে আমাকেও যাইতে হইয়াছিল—১৯১৩ সালে আগষ্ট মাসে। কাঁথির বন্যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন থানা ভগবানপুরে আটমাস সেবা কার্য্য করিয়াছিলেন।

সপ্তম বর্ষ

ইং ১৯১৪ খ্রীঃ পৌষ মাস গত হইতেই সরকারী ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ইচ্ছা, সরকারী-রিলিফ (সাহায্য) বন্ধ করিয়া দেন। সেই ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ন্যায় সৎ, কর্ম্ম প্রিয়, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ লোক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত মিশনের সেবকের মধ্যে একদলের কর্ম্ম বন্ধ (Work close) করিবার সময় লইয়া দ্বিমত ঘটে। কিন্তু মিশনের অপর একদল ছিলেন কর্ম্ম বন্ধ করিবার পক্ষে তাঁহারা শরৎ মহারাজের নিকট গোপনে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, দেশে অভাব এখন নাই কর্ম্ম চালাইলে সাধারণের অর্থের অপব্যয় হইবে। শরৎ মহারাজ দোটানায় পড়িয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে স্বামী উমানন্দের সহিত আমি আসিয়া উদ্বোধনে উপস্থিত হইলাম। শরৎ মহারাজ ও শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় সকল রকম প্রশ্ন করিয়া দেশের অবস্থা জানিয়া লইলেন। তারপর শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এখন কি কত্তে চাও?' সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিতে পারিয়াছি ভাবিয়া নিবেদন করিলাম—যা বলবেন। তিনি ধমক দিয়া বলিলেন, —"দূরে থেকে আমি কি বলব? কাজে শ্রদ্ধা থাকলে যা বল্লে—একথা কেউ বলতে পারে না।" ধমক খাইয়া রক্ত আমারও গরম হইয়া উঠিল। আমিও বলিয়া ফেলিলাম,

—"শ্রদ্ধা আছে কিনা জানিনা কিন্তু অবস্থায় পড়ে বাধ্য হয়ে যে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত কাজ চালাতে হবে সে কথা ত পূর্ব্বেই চিঠিতে নিবেদন করেছি—"

শরৎ মহারাজ শান্ত ভাবে বলিলেন—'বেশ ত চৈত্র মাস পর্য্যন্তই কাজ চলবে।' আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি ও লীলাপ্রসঙ্গ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

কর্ম্ম শেষ করিয়া (ইং ১৯১৪) বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে ফিরিয়াছি। একদিন শরৎ মহারাজ আমাকে ও অপর একজন সাধুকে ডাকিলেন। আমরা উভয়ে যাইয়া তাঁহার নিকট বসিলে তিনি সেই গোপন অভিযোগের কথা সংক্ষেপে বলিয়া, শেষ—'তুমিই না সেই চিঠি লিখেছিলে' বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় অপর সাধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাত্র তখনই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম গোপনে একটা পক্ষ দাঁড়াইয়াছিল এবং কে তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদিন সেবাকার্য্য চলিয়াছিল তিনি সে কথা ঘুণাক্ষরে কাহাকে জানান নাই। এমনই ছিল তাহার কথা গোপন রাখিবার অদ্ভুত ক্ষমতা।

কাঁথি হইতে ফিরিয়া যেমন মঠে ছিলাম—তেমনই বেলুড়ে আছি। সহসা একদিন মঠে সংবাদ আসিল মূত্রাশয়ের (kidney) ভীষণ যন্ত্রণায় শরৎ মহারাজ শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। ৩।৪ দিন পরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমাকে শরৎ মহারাজের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তখন শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে আছেন।

উদ্বোধনে আসিয়া প্রথমে মাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দেখিলাম মায়ের সেই ধীর স্থির ভাব নাই। আমাকে দেখিয়া ব্যাকুলভাবে মা বলিলেন,—"কি হবে গো—আমার স্বষ্টিধর যে অসুখে পড়েছেন।" ইতিপূর্ব্বে এমন অস্থির হইতে আমি কখন মাকে দেখি নাই।

শরৎ মহারাজ শুইয়া আছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তখন শ্রীমান্ নির্ম্মল (স্বামী মাধবানন্দ) বুঝাইয়া বলিল। ১০।১২ দিনে শরৎ মহারাজ আরোগ্য হইলেন। এইবার সেবার মধ্য দিয়া প্রকৃত শরৎ মহারাজের দর্শন পাইয়া ভয় দূর হইয়া গেল। দূর হইল বলিয়া এমনই দূর হইল যে পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের উৎপাতে সময়ে অসময়ে তাঁহাকেই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত।

নমুনা স্বরূপ মাত্র একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীমা ৪।৫ বৎসর হইল দেহ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার ভক্ত পরিবার মধ্য হইতে কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াছেন পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শরৎ মহারাজকে ইতিপূর্ব্বে আমরা দীক্ষা দিতে দেখি নাই। একদিন আমি যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমুক অমুক আপনার নিকট দীক্ষা প্রার্থী হয়ে আমাকে পত্র দিয়েছেন —তাঁদের কি লিখব? শরৎ মহারাজ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যোগীন মা বলিলেন—'না শরৎ! দীক্ষা দিও না রক্ত হেগে মরতে হবে।' যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিবার পূর্ব্বেই

যখন অন্য একজন অমন কথা বলিলেন—তখন আমি ও বলিলাম শশী মহারাজ, গোপাল দাদা, বাবুরাম মহারাজ এঁরা'ত দীক্ষা কখন দেন নাই তবুও এঁদের রক্ত হাগতে হয়েছিল কেন ?

ভক্তেরা ঠাকুরের কথা শুনিতে চায়—মহারাজ (শরৎ মহারাজ) বলুন আর নাই বলুন রক্ত এঁকেও হাগতে হবে" বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। এই কথা হইয়াছিল ফাল্গুণ মাসে। পরের বৎসরে চাঁদপুরে আসাম চা বাগিচা প্রত্যাগত আড়াই হাজার কুলির সেবাকার্য্যে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিযুক্ত ছিলেন তখন সংবাদ পাইলাম শুভ রথ যাত্রার দিন শরৎ মহারাজ পুনরায় দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বামিজী জীবিত থাকিতে শরৎ মহারাজ কখন কখন দীক্ষা দিতেন। দুই জনকে সন্ন্যাস ও দিয়াছিলেন। তারপর উহা অনেক বৎসর বন্ধ ছিল। শেষ ১৯২১ সালে যে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন উহা এই রথ যাত্রার শুভ দিন উপলক্ষ্য করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল।

একদিন শ্রীশ্রীমা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ভাল ছেলের মা ত সকলেই হতে পারে মন্দটিকে কে নেয় ?" শ্রীশ্রীমায়ের অযাচিত কৃপা দেখিয়া আমাদিগকে নিত্য স্মরণ করাইয়া দিত —তিনিই মন্দটিকে গ্রহণ করিবার জন্য যেন আসিয়াছেন, আর মায়েরই সঙ্গে আসিয়াছেন স্বামী সারদানন্দ। যে সাধুকে কেহ আশ্রমে রাখিতে চাহেন না, যাহাকে লইয়া সকলে অতিষ্ঠ, শরৎ মহারাজ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন,—এদৃশ্য নূতন ও নহে, বিরল ও নহে।

আজ মনে পড়িতেছে শ্রীশ্রীমহারাজ শরৎ মহারাজকে (ইং ১৯১৯) বলিয়াছিলেন,—'দেখ শরৎ, তুমি উদ্বোধনে যেয়েই * * কে দূর করে দিবে।' সে কথা কিন্তু শরৎ মহারাজ রক্ষা করিতে পারেন নাই। যাহাকে মহারাজ দূর করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন ইতি পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট শরৎ মহারাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা লাগাইয়া, যাহাতে শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে না থাকিতে পারেন, সেই চেষ্টা করিতেছিলেন। ধৃষ্টতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া ভক্তদের দেয় প্রণামীর টাকার হিসাব শরৎ মহারাজের নিকটে চাহিয়াওছিলেন। শ্রীশ্রীমা ও স্বামীসারদানন্দ এ বিষয়ে সম নির্ব্বিকার ছিলেন। মা শুনিয়া যাইতেন, কথা কানে তুলিতেন না। শরৎ মহারাজ সকল জানিয়াও তাঁহাকে কিছু বলিতেন না। কিন্তু কাল বলবান্! পরে কোন গর্হিত কার্য্য করিয়া সেই সাধুকে স্বেচ্ছায় সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। এই ঘটনায় আন্তরিক দুঃখিত ছিলেন মা ও শরৎ মহারাজই বেশী। কারণ মা ও শরৎ মহারাজের আশ্রয়েই যে সেই সাধু দিন যাপন করিতেছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ কিরকম অভিমান শূন্য ছিলেন তাহা এরকম ঘটনা না ঘটিলে আমাদের বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। নানাদিক দিয়া সেই সাধু, শরৎ মহারাজের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা যখনই মনে হইত সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর যে শরৎ মহারাজের কোলে বসিয়াছিলেন সে কথাও মনে আসিত। ঘটনাটি এই,—একদিন দক্ষিণেশ্বর শ্রীশ্রীঠাকুরের

ঘরে শরৎ মহারাজ বসিয়া আছেন, ঠাকুর বেড়াইতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর আসিয়া শরৎ মহারাজের কোলে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া তিনি উঠিয়া আবার পাইচারী করিতে লাগিলেন। তখন উপস্থিত ভক্তগণ ঠাকুরকে শরৎ মহারাজের ক্রোড়ে উপবেশন করিবার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—'দেখলাম ও কতটা ভার সইতে পারবে।' এই কথা আমরা জনৈক প্রাচীন ভক্তের নিকট প্রথম শুনিয়াছিলাম।

পরে একদিন শরৎ মহারাজকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা বশতঃ ক্রোড়ে উপবেশন করা স্বীকার করিলেন সত্য কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর নাকি বলিয়াছিলেন—'দেখলাম ও কতটা সইতে পারবে' সে কথা জানিতে চাহিলে তিনি,—'তা হবে' বলিয়া বাঁ হাতের উল্টা দিক্ দিয়া চিবুক ঘসিতে লাগিলেন। বাঁ হাতের উল্টা দিক্ দিয়া ধীরে ধীরে চিবুক ঘসার অর্থ—চুপ করিবার লক্ষণ। দুই আঙ্গুলে নখের চামড়া ঘসার অর্থ কথা বলিতেছেন আর ভাবিতেছেন। আমরা এ লক্ষণের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলাম। সুতরাং ধীরে ধীরে অন্য প্রসঙ্গে কথা আরম্ভ করিলাম। জানিনা ঠাকুর সেদিন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরিয়া শরৎ মহারাজের কোলে বসিয়াছিলেন কি না! নতুবা মনুষ্য শরীরে এত ক্ষমা, এত ধৈর্য্য এত সহ্য—জীবনে ত কম মানুষ দেখিলাম না!

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে ভাবিতে যাইয়া একসঙ্গে কত কথাই না মনে জাগিতেছে। আজ বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে

সকল মঠ কর্ত্তৃপক্ষের মতের বিরুদ্ধে কেমন করিয়া তিনি স্বামী প্রজ্ঞানন্দকে (দেবব্রত বসু) আশ্রয় দিয়াছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সেই দিনের ঘটনা সম্বন্ধে একজন দ্রষ্টা আমি ছিলাম পরে আর একজনও অল্প সময়ের জন্য সেই ঘরে আসিয়াছিলেন।

১৯০৯ সালে একদিন গোয়েন্দা পুলিসের নরেন মল্লিক মঠে আসিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে দেবব্রত বসু বা ব্রহ্মচারী দেবব্রত মঠের পুস্তকাগারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। তৎসঙ্গে মঠ মিশনের চিঠি পত্রাদিও কিছু কিছু তিনি লিখিতেন। একখানা টাইপ করা fools Cap কাগজ বোধহয় সাড়ে এগার আনার টিকিট সহ ডাকে আসিয়াছিল। উহা বিপ্লববাদের লেখাতে পূর্ণ ছিল। তখনও মানিকতলার বোমার মামলার ত্রাসের জের চলিয়াছে। পুলিশ নানা মূর্ত্তিতে মঠে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সে দিনে মঠে আসিয়া গুপ্তভাবে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মহাপাত্রকেও শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামীর কাছে স্বেচ্ছায় আত্মপরিচয় দিতে হইয়াছিল। তবুও মঠের প্রতি নজর। পূর্ব্বে বলিয়াছি গৃহে থাকিতে শুনিয়াছিলাম "যুগান্তর" মঠে বসিয়া লেখা হয়। কিন্তু আমরা সদ্য মঠাগত অথচ মঠে বিপ্লবের কোন গন্ধ নাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। পুলিশ কিন্তু তাহা জানিয়াও জানিত না। তাহা হইলে T. A. প্রভৃতিতে তবুও যা কিছু আয় তাহা যে থাকেনা। বোধহয় এজন্যই তাহারা ক্রমাগত হানা দিত। ইহা ছাড়া অন্য কারণ কিন্তু আজও আমরা আবিষ্কার

করিতে পারি নাই। নিশ্চিত পুলিশও পারে নাই। পারিলে আমাদের আজ সকলকেই শ্রীঘরে থাকিতে হইত। সত্যমেব জয়তে—নানৃতং। বিপ্লববাদীদের প্রেরিত কি কাহার প্রেরিত না জানিলেও সেই (Fools cap) কাগজ খানার কি গতি হইবে ইহা লইয়া যে ২।৩ দিন জল্পনা চলিতেছিল সেই সময়ের মধ্যে একদিন নরেন মল্লিক মঠের লাইব্রেরীতে বসিয়া ব্রঃ দেবব্রতের (পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) সহিত কথা বলিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ব্রঃ দেবব্রত সেই কাগজ খানা নরেন মল্লিককে দেখান এবং ইহাতে কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করেন। কথাটা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট উঠিল,—দেবব্রত মঠের কাগজ পত্র পুলিশকে দেখাইয়াছে। এই সংবাদের উপরে নির্ভর করিয়া মঠ কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন, আপাততঃ দেবব্রতকে ছয় বৎসর বাহিরে থাকিয়া তপস্যা করিতে হইবে। তারপরে তাহাকে মঠের কাজে দেখিয়া শুনিয়া নিযুক্ত করিলেই চলিবে। যথা সময়ে এই ঘটনার সম্বন্ধে আমি যাহা জানিতাম তাহা শরৎ মহারাজকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা লইয়া তখন তিনি দেবব্রতের পক্ষে দাঁড়ান নাই। এখন মনে হইতেছে, ঘটনা স্রোত কোন দিকে কি ভাবে যায় তাহাই বোধহয় তিনি দেখিতেছিলেন। শেষ একদিন দেবব্রতকে উদ্বোধনে দেখা গেল। তারপর উদ্বোধন সম্পাদক রূপে প্রায় ৩ বৎসর কাটাইলেন। ইতি মধ্যে শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত পুরী দেখা করিতে যাইয়া স্থির করিয়া আসিলেন, তিনি দেবব্রতের জামিন থাকিবেন। এই কথা যাহা এখন

বলিতেছি তাহা শুনিতে যত সহজ—কাজে কিন্তু তত সহজ ছিল না। শ্রীশ্রীমহারাজের সামান্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কখনও দাঁড়াইতেন না। সেই মহারাজের মনে সামান্য আঘাত যাহাতে না লাগে এমন ভাবে কাজ উদ্ধার করিতে এক স্বামী সারদানন্দই সক্ষম ছিলেন। শুধু দেবব্রতেরই তিনি জামিন ছিলেন তাহা নহে শচীনেরও (স্বামী চিন্ময়ানন্দ) ছিলেন এবং পুলিশ যাহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত এমন কয়েকজনেরও শরৎ মহারাজই জামিন হইয়া মঠে স্থান দিয়াছিলেন।

দেবব্রত ও শচীন মানিকতলা বোমার সম্পর্কে ধৃত হন। পরে আদালতে নির্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াই বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবব্রত উদ্বোধনের সম্পাদক রূপে প্রায় তিন বৎসর এবং মায়াবতীর প্রেসিডেণ্ট রূপে প্রায় চারি বৎসরকাল কাজ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে লীন হন। শচীনও দেবব্রতের দেহরক্ষার অল্পকাল পরে দেহরক্ষা করে।

ইহা ছাড়া যাহারা ধৃত বা অভিযুক্ত না হইয়াও পুলিশের সন্দেহের পাত্র ছিল—আজ তাহারাও শরৎ মহারাজের কৃপায় মঠের অধীনে দায়ীত্বপূর্ণ কাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশের সেবা করিয়া ধন্য হইতেছেন।

স্বামী সারদানন্দ ইহাদের জন্য না দাঁড়াইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে যে ইহাদের ভাগ্যে স্থান লাভ হইত না, ইহা বলাই বাহুল্য। এমন আশ্রয়-প্রার্থীকে আশ্রয় দিতে—বিন্দুকে সিন্ধুতে পরিণত করিতে বিশ্বাসের দ্বারা বিশ্বাসীর দল সৃজন করিতে স্বামী সারদানন্দ অদ্বিতীয় ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যে সকল শাখা কেন্দ্র বেলুড় মঠ হইতে যত বেশী দূরে অবস্থিত তাহার জন্য শরৎ মহারাজকে তত বেশী চিন্তিত দেখিয়াছি। বৃন্দাবনের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যে নাছু মহারাজ ছিলেন তাঁহাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। নাছু মহারাজের ঘরের নাম ছিল হরেন্দ্রনাথ রায়। মঠের নাম ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ। হরেন্দ্রনাথ স্বামিজীর সেবা করিয়াছেন—পরে কাশী সেবাশ্রমে প্রেরিত হন। তার পরে শ্রীধাম বৃন্দাবনে নাছু মহারাজের স্বভাব ছিল যে কাজ মাথা পাতিয়া লইতেন তাহা ছাড়িয়া কখন পলাইতে জানিতেন না কিম্বা কর্ত্তব্যে সামান্য অবহেলার ভাবও তাঁহার ছিল না। দোষ আমাদের অনন্ত কিন্তু শরৎ মহারাজ দোষের দিকে নজর না দিয়া দেখিতেন গুণের দিকটা। নাছু কাজে অদম্য উৎসাহ দেখাইয়া তাঁহার স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনে যখন হরেন্দ্রনাথ রায়কে বিবাহ করিতে হইল তখনও শরৎ মহারাজের নিকট সে সম স্নেহ লাভ করিয়াছে। একবার হরেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক কলিকাতায় আসে। সস্ত্রীক মঠে যায়—উদ্বোধনেও আসে। শরৎ মহারাজ, বাবা যে স্নেহে পুত্রবধূকে দর্শন করেন তিনি তেমন কাপড় টাকা দিয়াছিলেন—এবং সেই দিন নাছুর স্ত্রীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পরম পরিতোষের সহিত খাওয়াইয়াছিলেন। উত্তর কালে বৃন্দাবনে নাছু পৃথক বাড়ীতে স্ত্রীসহ থাকিত—একটী অনাথ ব্রাহ্মণের ছোট ছেলেকে পালিত। সে সময় তাহার যক্ষ্মা হয়—যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আসে—তখন হইতে মহারাজ নাছুকে অর্থ সাহায্য করিতেন। নাছু যখন দেখিল দিন আগত তখন বৃন্দাবনে ফিরিল—

গাড়ীভাড়া প্রভৃতি শরৎ মহারাজ দিয়াছিলেন মায় যত দিন সে জীবিত ছিল সংসার খরচের টাকা পর্য্যন্ত। তার পর নাহু দেহ ত্যাগ করিল,—বৃন্দাবনের রজপ্রাপ্ত হইল। তখন তাহার স্ত্রী ও পালক পুত্রটিকে শরৎ মহারাজ আনাইয়া নিবেদিতা বিদ্যালয়ে রাখিলেন। দ্বিপ্রহরে স্কুল—ছেলেটি খুব অশান্ত সুতরাং সে সময় স্কুলের দরোয়ান আনিয়া উদ্বোধনে ছেলেটিকে রাখিয়া যাইত।

শরৎ মহারাজ প্রথম প্রথম আহারের পরে বিশ্রাম না করিয়া ছেলেটিকে লইয়া খেলা করিতেন। শ্রীমান্ সাতু (স্বামী অসীতা-নন্দ) তখন শরৎ মহারাজের সেবক ছিল—। সে দেখিল ছেলেটির জন্য আহারান্তে শরৎ মহারাজের ভাগ্যে বিশ্রাম লাভ ঘটিতেছে না। সুতরাং সাতু, মহারাজকে যাইয়া বলিল ছেলের ভার আমার রহিল। মহারাজ স্বেচ্ছায় সাতুকে ছেলের ভার গ্রহণ করিতে দেখিয়া সুখী হইলেন। তদবধি ছেলেটিকে দ্বিপ্রহরে সাতুই দেখিত শুনিত। শরৎ মহারাজও বিশ্রাম করিতে পারিতেন।

একদিন শরৎ মহারাজ খাইতেছেন তখন ছেলেটি আসিয়াছে। শরৎ মহারাজ দুধভাত খাইতেছিলেন, কতকটা থাকিতে ছেলেটিকে দিলেন। ছেলেটি সেই বাটি গ্রহণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়াছিল, কতদিন দুধ খাই নাই। মহারাজ শুনিয়া ছিলেন,—নাহুর গরু ছিল তখন এই ছেলে পেট ভরিয়া দুধ খাইত। ছেলেটির কথা শুনিয়া মহারাজ ছেলেটির জন্য দুধ রোজ করিয়া দিলেন। জুতা জামা কাপড় দিয়া ছেলেটিকে যে ভাবে তিনি সাজাইয়াছিলেন—এ যেন ঠিক ঠাকুরমার নাতি প্রীতি—বলিয়া মনে হইত। কিছুদিন নিবেদিতা স্কুলে থাকিবার পরে

নাত্নর স্ত্রী, পালকপুত্র সহ তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ কিন্তু তখনও তাঁহাদের সাহায্য করিতেন ছেলেটির দুধের জন্য অর্থ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচর—স্বামী সারদানন্দের অর্থ দিয়া এমনভাবে অপরকে সাহায্য করা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সেদিন চুনি বলিয়া একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন। এই চুনি এক সময় শরৎ মহারাজের সঙ্গে কল্যানীয়া রাধুর বিবাহোপলক্ষ্যে জয়রাম বাটিতে গিয়াছিল এবং খুব পরিশ্রম করিয়াছিল—সেকথা তিনি কখন ভুলেন নাই। চুনি যখন অসুস্থ হইয়া পড়িল তখন দফায় দফায় টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। কর্ম্ম দ্বারা যে যেমন তাঁহার স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছে তাহার কথা উজ্জ্বলভাবে তাঁহার চিরদিন মনে থাকিত। সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাহার জন্য সাধ্য মত করিতে কখন বিরত হইতেন না। বৈষ্ণব কবির গানে আছে,—"যেজন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে"। স্বামী সারদানন্দেরও মূল মন্ত্র এই রকম ছিল। তিনি সে কথা কখন মুখে বলেন নাই কিন্তু প্রতি কাজে তিনি তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ও কাজে যে তৎপর সেই তাঁহার আপনার জন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন,—'সহস্র ফণা বিস্তার করে শরৎ সঙ্ঘকে ধরে রেখেছেন।' এই কথা শুনিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম—কেমন করিয়া মা, শরৎ মহারাজের কর্ম্ম তালিকা জানিলেন! শুধু কর্ম্ম তালিকা জানিলেই এই রকম কথা বলা চলে না। মায়ের কথা বলিবার রকম দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল

তিনি এমন কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—যাহা ভাষায় বলিতে যাইয়া তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, 'সহস্র ফণা বিস্তার করে শরৎ সঙ্ঘকে ধরে রেখেছেন।'

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের কর্ম্ম তালিকা জানিতে যাইয়া আমরা অনেক কথাই শুনিয়াছি। বিস্তারিত ভাবে তাহার আলোচনা করিতে হইলে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হইবে॥ এই অপ্রিয় সত্য কথা না জানিলে কেহই বুঝিতে পারিবেন না, শরৎ মহারাজ কোন ক্ষেত্রে কি ভাবে কাজ করিয়াছেন। কেমন করিয়া তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও কর্ম্ম-আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন, শত বাক্য যন্ত্রণার মধ্যেও কেমন করিয়া তিনি এক একটি করিয়া প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করাইয়াছেন। এই জন্য (ইং ১৮৯৬ খ্রীঃ হইতে ইং ১৯০৭ খ্রীঃপর্য্যন্ত) * আমরা শরৎ মহারাজের কর্ম্ম ধারার সকল দিক সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(১) ইং ১৮৯৬ খ্রীঃ কামাখ্যা দর্শন মানসে শ্রীমৎ অখণ্ডানন্দ স্বামী মঠ হইতে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে ভাবদা (মুর্শিদাবাদ) ও তাহার আশে পাশের গ্রামে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ভাবদা গ্রামে থাকিয়া অর্থ সংগ্রহ ও সেবা দুই কাজ এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বুঝিয়া তিনি সকল কথা খুলিয়া মঠে লিখিলেন। সে দিনে মঠের প্রায় সকলেই আত্মনো মোক্ষার্থং (নিজের মুক্তির জন্য) জপ, ধ্যান লইয়া দিন

* এই সময়ের মধ্যে তিন বৎসর তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

যাপন করিতেন। কর্ম্ম,—বন্ধনের কারণ, সুতরাং অশুভ বলিয়া সহসা কেহ কর্ম্মে লিপ্ত হইতে চাহিতেন না। শ্রীমৎ অখণ্ডানন্দ স্বামীর পত্র সকলেই পড়িলেন কিন্তু কেহই যখন এ কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য কোন উৎসাহ দেখাইলেন না, তখন শরৎ মহারাজ দুর্ভিক্ষে বিপন্ন নরনারীর জন্য অর্থ সংগ্রহের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের রিলিফ (সেবা) কার্য্য শ্রীমৎ অখণ্ডানন্দ স্বামীকে প্রথম সেবক রূপে গ্রহণ করিয়া আত্ম প্রকাশ করিল।

(২) ইং ১৮৯৯ খ্রীঃ কিষণগড়ে (রাজপুতনা) ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সংবাদ পত্রের সাহায্যে দুর্ভিক্ষের করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী পাঠ করিয়া স্বামী সারদানন্দ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মঠ হইতে শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ স্বামী, নিত্যানন্দ স্বামী, কল্যাণানন্দ স্বামী এবং ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্রনাথকে সেবক রূপে কিষণগড়ে প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে যে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা শরৎ মহারাজ ধার করিয়াছিলেন। সেই ধার করা অর্থে সেবকগণকে পাঠাইয়া সংবাদ পত্রে সহৃদয় দেশবাসীর নিকট সেবা কার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন।

(৩) যে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় আজ প্রাচ্য স্থপতি শিল্পে শোভিত হইয়া শত শত শিল্পির প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছে তাহার প্রথম পত্তন শরৎ মহারাজ ঋণ করিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঋণ করিয়া (ইং ১৯০৪ খ্রীঃ) বিদ্যালয়টি খুলিয়া দিয়া তিনি এমন ভাবে অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন যাহাতে বিদ্যালয়ের কার্য্য মোটামুটি চলিয়া যাইতে

পারে। তিনি তখন অগ্রণী হইয়া ঋণ করিয়া এই বিদ্যালয় না খুলিলে কখনও এই বিদ্যালয়ের উদ্ভব হইত কি না কে বলিবে ?

(৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র পাক্ষিক উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীত স্বামী। তখন উদ্বোধন পত্রিকার নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রও ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের কাজ আশানুরূপ না দেখিয়া স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) আদেশে মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয় করা হইল।

কিছুদিন পরে মঠ হইতে স্থির হইল স্বামী ত্রিগুণাতীতকে প্রচার কার্য্যে আমেরিকায় যাইতে হইবে। এবং ইহাও স্থির হইল যে, উদ্বোধন পত্রিকা বন্ধ করিতে হইবে। নানা কারণে স্বামী ত্রিগুণাতীত একসঙ্গে উদ্বোধন ছাপাইয়া এমন বন্দোবস্ত করিলেন যেন গ্রাহকগণের বৎসরের বাকী মাসের উদ্বোধন পাইতে বাধা না হয়। এই ভাবে উদ্বোধন ছাপা হইয়াছিল বলিয়াই বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠাতা, সঙ্ঘের নায়ক স্বামিজীর দেহ রক্ষার সংবাদ নূতন করিয়া ছাপাইয়া ৪র্থ বর্ষের উদ্বোধন শ্রাবণ সংখ্যায় যুক্ত করিয়া দিতে হইয়াছিল। উদ্বোধন পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিবার সকল ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও শরৎ মহারাজ উদ্বোধন পরিচালনে যে অর্থের প্রয়োজন তাহার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া ভক্তগণের সহৃদয়তার উপরে মাসিক চাঁদা দ্বারা একটা তহবিলের সংস্থান করিলেন যাহাতে ধীর মন্থর গতিতে উদ্বোধন অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

অধিকাংশ কর্ম্মের মধ্যে মানুষ আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে পারে কিন্তু অর্থ সংগ্রহ ব্যাপদেশে অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এ কাজে কিন্তু শরৎ মহারাজ কখন কাহাঁরও অপ্রিয় হন নাই। বরং কাহারও পীড়ন না হয়, এমন ভাবে এক টাকা, দুই টাকা ধার্য্য করিয়া দিয়া মাসে মাসে তাহা আদায় করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ভক্তগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অধিক লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই উদ্বোধন পরিচালন কার্য্যে অর্থ দ্বারা যাঁহারা শরৎ মহারাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ, কম্বুলেটোলার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, গোয়েন্দা পুলিশের শশীভূষণ দে, লক্ষ্মী নিবাসের শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, বড়বাজারের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র শেঠ, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৫) তখনকার দিনে কলিকাতা সহরে আদর্শ ছাত্রাবাস ছিল না। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণও ছাত্রাবাস-গুলির উপরে নজর রাখিতেন না। এই অভাব কিঞ্চিৎ দূর করিতে শরৎ মহারাজের ব্যবস্থায় কলিকাতা নগরীতে বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির নামে এক ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছিল। এ কার্য্যে শরৎ মহারাজ বুড়ো বাবা (স্বামী সচ্চিদানন্দ), প্রিয়নাথ সিংহ এবং যজ্ঞেশ্বর চন্দ (দম্ দম্ মাষ্টার ঠাকুরের সময়ের লোক) মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে শরৎ মহারাজকে অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল। তবুও স্মৃতি-মন্দিরের কাজ চলিতেছিল। যখন দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আইনের আমলে আনিয়া ছাত্রাবাস গুলির

সুব্যবস্থার দিকে নজর দিয়াছেন তখন শরৎ মহারাজ স্মৃতি-মন্দির বন্ধ করিয়া দিলেন। এ বিষয়ে শরৎ মহারাজকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, 'দেশের লোক দেশ সেবা করেনি বলেই আমরা স্বামিজীর আদর্শে দেশের অভাব দেখে তার প্রতিকার কল্পে কাজ আরম্ভ করেছি। যখন দেখ্‌ব ঐ সকল কাজ দেশবাসী নিজেরা গ্রহণ করেছেন তখন সেই কাজটি ছেড়ে দিয়ে অপর একটি অভাব মোচনে আমরা নিযুক্ত হব। কিন্তু কতকগুলি কাজ আমাদের কর্‌তেই হবে যা আমাদের জীবনী শক্তিকে বলশালী করে তুল্‌বে, তপস্যার সহায়ক হবে, যাতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি বাড়তে থাকবে।'

(৬) কাশীধামে শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী খাজাঞ্চীর বাগানে ভাড়া বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম স্থাপন করেন। সেবাশ্রম তখন রামাপুরাতে ছিল। সেবাশ্রমের জন্য ঐ খাজাঞ্চীর বাগান যখন খরিদ হইল তখন মঠের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন, অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রম পাশাপাশি থাকিবে এবং যে মূল্যে খরিদ হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেক টাকা মহাপুরুষ সংগ্রহ করিয়া সেবাশ্রমকে দিবেন। কিন্তু মহাপুরুষ অনেক দিন গত হইলেও ঐ টাকা সেবাশ্রমকে দিতে পারিলেন না তখন সেবাশ্রম হইতে মঠে শ্রীশ্রীমহারাজকে ঐ টাকার জন্য নিবেদন করা হইল। ট্রাষ্টিগণ সকলেই এ সংবাদ শুনিলেন কিন্তু কেহই এত টাকার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তখন শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত, কবি

গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত একযোগে ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া সেবাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। তখনও কথা ছিল ঐ টাকা মহাপুরুষ সংগ্রহ করিয়া শরৎ মহারাজকে দিবেন। টাকা সংগ্রহের জন্য মহাপুরুষ কাশী হইতে বেলুড় মঠে আসিলেন। ইহার কিছু দিন পরে মিঃ এম, এন, ব্যানার্জ্জির অসুখের সংবাদ পাইয়া মহাপুরুষ দার্জ্জিলিংএ চলিয়া গেলেন। টাকা সংগ্রহ পর্ব্ব এইখানে ইতি হইল। মহাপুরুষ তারপর বহুদিন বেলুড় মঠেই ছিলেন। সুতরাং আজ কাশী অদ্বৈতাশ্রমের সাধুগণ নিজ বাড়ীতে বসিয়া জপ, ধ্যান, উৎসবাদি করিবার যে সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাহা কিন্তু শরৎ মহারাজের তৎপরতার জন্যই হইয়াছে বলিতে হইবে।

(৭) শ্রীশ্রীঠাকুর মহাসমাধিতে মগ্ন হইবার পরে গৃহী-ভক্তগণ স্থির করিলেন,—পরমহংস মহাশয়ের (তখন ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরমহংস মহাশয় বলিয়া অভিহিত করিতেন) স্ত্রীকে খোর-পোষের বাবদ মাসিক দশটাকা দিলেই চলিবে। মা দেশে (জয়রামবাটী কিম্বা কামারপুকুর) থাকিবেন। কখন যদি কলিকাতায় আসেন, বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিলেই চলিবে। কিন্তু মানুষের সুখ সুবিধা বলিয়া একটা জিনিষ আছে, যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে না পারিলে সকলকেই অপ্রিয় হইতে হইবে। সুতরাং যখন মা কলিকাতায় আসিতে ইচ্ছা করিবেন তখনই বলরামবাবুর বাড়ীর সকলে নিরোগ থাকিবেন এমন কখন হইতে পারে না। তাই দুই তিনবার কলিকাতা ও জয়রামবাটি আসা যাওয়ার পরে যখন মা

কলিকাতায় আসিবেন স্থির হইত তখন সন্ন্যাসী ভক্তগণ অগ্রণী হইয়া মায়ের জন্য বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন।

এদিকে গতপ্রায় উদ্বোধন পত্রিকা যখন শরৎ মহারাজের উৎসাহে স্থায়ী হইতে চলিল, তহবিলেও পাঁচ হাজার টাকা জমিল, ভাড়া বাড়ীতে নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ না করিয়া যাহাতে উদ্বোধনের নিজবাড়ী হয় সে অভাবও উদ্বোধনের পরিচালকগণ বোধ করিতে লাগিলেন তখন বাগবাজারের খড় বিক্রেতা ভক্ত কেদারনাথ দাস আসিয়া শরৎ মহারাজকে বলিলেন,—গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার প্রায় চারিকাঠা জমি আছে তাহা তিনি মঠের নামে লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন যদি মঠ স্বীকার করেন ঐ জমির উপরে যে বাড়ী হইবে তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজাদি হইবে। শরৎ মহারাজ এই সংবাদ শ্রীশ্রীমহারাজকে জানাইলেন। তখন শ্রীশ্রীমহারাজ ও শরৎ মহারাজ একযোগে স্থির করিলেন, একতালায় উদ্বোধন কার্য্যালয় থাকিবে। যখন দোতালা হইবে তখন উহাতে শ্রীশ্রীমা আসিয়া থাকিবেন। উদ্বোধনে ঠাকুর ঘর হইবে এবং উদ্বোধনের পরিচালকগণই ঠাকুর পূজা করিবে। যথাসময়ে শরৎ মহারাজ মঠের সম্মতি কেদারনাথ দাসকে জানাইলেন। তিনিও সানন্দে অর্পণনামা দ্বারা জমি মঠের নামে লিখিয়া দিলেন।

তখন প্রায় পাঁচ হাজার টাকা উদ্বোধনের তহবিলে ছিল। শরৎ মহারাজ এই টাকা দ্বারা বর্ত্তমান উদ্বোধন বাড়ীর একতালা নির্ম্মাণ করাইলেন। একতালা নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত স্বামী শুদ্ধানন্দও খুসী ছিলেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ দেখিলেন একসঙ্গে কাজ

না হইলে দোতালা শীঘ্র হইবে না, সুতরাং মা কলিকাতায় আসিলে দুইদিক দেখিতে যাইয়া তাহাকেই বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এইজন্য শরৎ মহারাজ পাঁচহাজার সাতশত টাকা আপনা আপনির মধ্যে কর্জ্জ করিয়া দোতালার কাজ ঐ সঙ্গেই আরম্ভ করাইয়া দিলেন।

শরৎ মহারাজের ১৯০৯ খ্রীঃ রোজ নামচায় লেখা আছে,—Home a/c debts অর্থাৎ বাড়ী নির্ম্মাণের দরুণ দেনার হিসাব :—

মহিতোষ (১)—২০০০৲
পর্ব্বত (২)—১৩০০৲
গণু (৩)—১০০০৲
যোগীন মা (৪)—৬০০৲
যোগীন মার মা (৫)—৫০০৲
কুসুম ও নিরোদা (৬)—৩০০৲

মোট—৫৭০০৲

উপরোক্ত সকলেই শরৎ মহারাজকে এতবেশী শ্রদ্ধা বিশ্বাস করিতেন যে, টাকার জন্য তাঁহাদের কোন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু স্বামী শুদ্ধানন্দের এজন্য অতি মাত্রায় ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং বেলুড় মঠে ট্রাষ্টির সভায় শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট এই দেনার কথা উত্থাপন করিয়া শরৎ মহারাজকে

(১) স্বামী মহিমানন্দ, (২) মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী, (৩) যোগীনমার কন্যা, (৪) শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা, (৫) ও (৬) শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের অনুগত ভক্ত।

বিব্রত করিয়া তুলিতে স্বামী শুদ্ধানন্দ সর্ব্বদার জন্য সচেষ্ট রহিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যতদিন উদ্বোধনের অর্থে একতালা বাড়ী হইতেছিল ততদিন সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) খুসীই ছিলেন। তারপর দোতালার কাজ যে পরিমাণে অগ্রসর হইতে লাগিল সুধীর মহারাজও সেই অনুপাতে বাধাদিতে আরম্ভ করিলেন। দোতালা শেষ হইয়া যখন তেতালায় ঘর আরম্ভ হইল তখন সুধীর মহারাজ দেনার অছিলা করিয়া শরৎ মহারাজকে বিব্রত করিবার জন্য শ্রীশ্রীমহারাজের কাণে নানা কথা তুলিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে আমাদের সম্মুখে শরৎ মহারাজকে বলিয়াই ফেলিলেন,—ছাখ শরৎ, সুধীর যখন বলে তখন মনে হয় ঋণ করে একাজ করা ভাল হয় নি, কিন্তু তুমি যখন বল তখন কিন্তু কোন ভাবনা আসে না।

আমাদের কিন্তু মনে হয় 'দেনা করিয়া বাড়ী করা' অজুহাতটা নিতান্তই অসার। কারণ যিনি এ ঋণ করিয়াছিলেন তিনি উত্তমর্ণগণের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তা ছাড়া এ টাকা শোধ না হইবার কোনই হেতু ছিল না। তখন স্বদেশীযুগ— উদ্বোধন গ্রন্থাবলী (বঙ্গ বিভাগের পর হইতে) বাঙ্গলা দেশে অতি মাত্রায় আদৃত হইতে ছিল। সুতরাং পাঁচ-হাজার সাতশত টাকা সুদ শুদ্ধ শোধ করা খুব কঠিন বলিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ বা অন্যান্য ট্রাষ্টিগণ মনে করিতেন না। এই ঋণের জন্য সুধীর মহারাজ স্বয়ং বা উদ্বোধন কার্য্যালয়ও দায়ী ছিলেন না। তবু তিনি এত অতিষ্ঠ হইয়াছিলেন কেন?

ইহার মীমাংসা করিতে তখন কেহ অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইতেন, স্বামী শুদ্ধানন্দ জানিতেন শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে থাকিলে প্রাচীনগণের মধ্যে একজনকে উদ্বোধনে থাকিতেই হইবে। আর প্রাচীনগণের মধ্যে শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামীর দেহাবসানে স্বামী সারদানন্দই শ্রীশ্রীমার কাজ কর্ম্ম যখন দেখিতেন তখন তাঁহাকেই থাকিতে হইবে। সুতরাং স্বামী শুদ্ধানন্দের মনোভাব ছিল যাহাতে শরৎ মহারাজ কোন হেতুতে উদ্বোধনে তাঁহার মাথার উপরে না থাকিতে পারেন। পরবর্ত্তী যুগে রাগের মাথায় স্বামী শুদ্ধানন্দ একদিন ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন,—'যে 'উদ্বোধন' আমি বুকের রক্ত দিয়া গড়ে তুললাম, তোমরা বুঝি ভেবেছ সে উদ্বোধনে শরৎ মহারাজ আর তুমি কর্ত্তা হয়ে থাকবে, তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।' শরৎ মহারাজ একথা শুনিয়া চুপচাপ ছিলেন কিন্তু একথা প্রাচীনগণ যখন শুনিলেন তখন স্বামী শুদ্ধানন্দের 'শুদ্ধবুদ্ধিতে' অনেকেরই সন্দেহ উপস্থিত হইল। স্বামী শুদ্ধানন্দ শরৎ মহারাজকে উদ্বোধনে থাকিতে না দিবার কে তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। স্বামী শুদ্ধানন্দকে প্রাচীনগণ, স্বামী শুদ্ধানন্দের সমসাময়িকগণ বা যুবাগণ কেহই শরৎ মহারাজের সমকক্ষ বলিয়া কোনদিন মনে করিতেন না। বরং মঠের সকলে তাঁহাকে শরৎ মহারাজের শিষ্য স্থানীয় বলিয়াই জানিতেন। সেই শিষ্য স্থানীয় স্বামী শুদ্ধানন্দের অনধিকার চর্চ্চার কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজ রাগ করা ত দূরের কথা বরং স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত কথায়, কাজে তিনি পূর্ব্বের ন্যায়

সহানুভূতি, স্নেহ দেখাইয়াছেন, যেন সে কথা কখন শোনেন নাই।

(৮) এই সময়ের মধ্যে স্বামিজীর আদেশে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে কাথিওয়ারে (রাজপুতানা) ধর্ম্ম-প্রচারে ও মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে যাইতে হইয়াছিল। পরে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানেও শরৎ মহারাজকে প্রচার কার্য্যে গমন করিতে হইয়াছিল।

(৯) কলিকাতার নানা স্থানে প্রতি সপ্তাহে চার পাঁচদিন শরৎ মহারাজ বক্তৃতা করিতেন। জটীল বিষয়কে সরল করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্টই ছিল। একদিন মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে বক্তৃতার সময় একজন শ্রোতা বিড়্ বিড়্ করিতে ছিল। পার্শ্বে জনৈক ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তিনি শ্রোতাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বিড়্ বিড়্ কচ্ছেন? কথা শুনিয়া শ্রোতা সেই ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁর নামটি জানতে পাই কি? ভদ্রলোকটি বলিলেন,—স্বামী সারদানন্দ। লোকটি 'সা—র—দা—ন—ন্দ, সা-র-দা-ন-ন্দ মুস্কিলানন্দ' বলিয়া উঠিয়া পড়িল। খুব সম্ভব বক্তৃতার বিষয় তাহার ভাল লাগিতে ছিলনা—বোধ হয় তাহার গীতাখানা পর্য্যন্ত পড়া ছিল না। নতুবা 'মুস্কিলানন্দ' বলিবার অন্য কোন হেতু পাশের ভদ্রলোকটি কিন্তু দেখিতে পাইলেন না।

(১০) উদ্বোধন পত্রিকার জন্য সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করা।

সকল কাজের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, (ক) কাজে পরিশ্রম যতই বেশী স্বীকার করিতে হউক না কেন তাহার জন্য শরৎ মহারাজ কোন ক্লেশ বোধ করিতেন না। (খ) কোন কাজের ভার অপরের উপর অর্পণ করিয়া সে কাজ ঠিক ঠিক হইল কিনা তাহা না দেখিয়া বা জানিয়া পাশ কাটাইতে জানিতেন না।

হুকুম সকলেই করিতে পারে কিন্তু হুকুম মত কাজ হইল কিনা তাহা দেখিবার মত ধৈর্য্য খুব কম লোকেরই আছে। তাহারই জন্য যাহারা হুকুম করিয়া খালাস থাকে তাহাদের কাজ কোন দিনই ভাল হয় না। কিন্তু যাঁহারা হুকুম করিয়া কাজ আদায় করিয়া লইতে পারেন, কাজে সফলতা তাঁহারাই লাভ করিয়া থাকেন।

অষ্টম বর্ষ

ইং ১৯১৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে গঙ্গাসাগর মেলায় সেবা কার্য্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যাইবেন স্থির ছিল। শরৎ মহারাজের ইচ্ছা হইল,—সেই কাজে আমিও যাই। বিদ্বান বা বিদ্যাহীন, বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিহীন, বলবান বা বলহীন মঠ মিশনের সকলেই যাহাতে সকল রকম কর্ম্মের সহিত পরিচিত হইতে পারে ইহা ছিল শরৎ মহারাজের আন্তরিক ইচ্ছা।

পূর্ব্ব বৎসর মিশনের সেবকরূপে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ সাগর মেলায় গিয়াছিলেন। শ্রীমান্ প্রিয়নাথ (স্বামী আত্ম-প্রকাশানন্দ) ও শ্রীমান্ হেমেন্দ্র (ব্রঃ রূপ চৈতন্য,) শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথের সহ কর্ম্মী ছিলেন। শ্রীমান্ প্রিয়নাথ ও হেমেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য তালিকা (Plan of work) প্রস্তুত করিলাম এবং যথা সময়ে তাহা শরৎ মহারাজকে নিবেদন করিলাম।

গঙ্গাসাগরে স্নানের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সেই স্থানের সহিত পরিচিত নহেন, কখন 'দুঃখ সাগরে' (গঙ্গাসাগর স্নানকে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখ সাগর-স্নান বলিতেন) স্নান করেন নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য সাগর দ্বীপ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। নতুবা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না, মিশন এত ঘটা করিয়া সেবক পাঠাইতেন কেন!

গঙ্গা যেখানে সাগরে মিলিয়াছেন, সে লবণাম্বুরাশীর মধ্যে ছোট বড় কতকগুলি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে একটি জনহীন দ্বীপে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে যাত্রীগণ সমবেত হইয়া স্নান, দর্শন, পূজা, দান প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া পূণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। সাগর দ্বীপে দর্শন যোগ্য—কপিল মুনি ও শ্রীশ্রীগঙ্গার প্রস্তর মূর্ত্তি এবং পানীয় জলের তুইটি পুষ্করিনী আছে।

সাগর দ্বীপে মেলার মাঠের একদিক বালীতে আবৃত, অপর দিক ছোট ছোট আগাছায় পূর্ণ। এই আগাছা কাটাইয়া, পোড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হোগলা ও পাল সহায়ে সহরের আদর্শে রাস্থা ঘাট বজায় রাখিয়া যাত্রীর মাথা রাখিবার স্থান নির্ম্মান করিতে ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কনট্রাকটর নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ঐ সকল ঘরে যাত্রীগণকে ভাড়া দিয়া থাকিতে হয়।

সাগর মেলায় কমপক্ষে ত্রিশ হাজার যাত্রী নৌকা ও জাহাজ যোগে ঐ দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক লোকের সমাগমও হইয়াছে।

পৌষ মাসের দারুণ শীতে বালী বা মাটির উপরে শয্যারচনা করিয়া যাত্রীগণ শয়ন করিয়া থাকে। দোকান হইতে নানা রকম খাবার খাইয়া অনেকে তিন রাত্রি যাপন করে, কেহ কেহ ভাত রান্না করিয়া খাইয়া থাকে। এই সকল অনিয়ম ও অসুবিধার মধ্যে যাত্রীগণ সহজেই, জ্বর, কাঁসি, পেটের অসুখ এবং কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

সে দিনের ডিঃ-বোর্ড এই সকল রোগীর জন্য মাত্র এক

জন সব এ্যাসিষ্টাণ্ট সারজন ও কিছু ঔষধ ও খান কতক তুলার কম্বল পাঠাইয়া কর্ত্তব্যের ইতি করিতেন। ডাক্তারের সহকারী হিসাবে থাকিত মেথর, ডোম, ধাঙ্গড় প্রভৃতি। সুতরাং কাহারও সাগর মেলায় কলেরা হইলে বাঁচিবার কোন আশা প্রায় থাকিত না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইং ১৯১২ খ্রীঃ হইতে ১৯২৫ খ্রীঃ (বাদ ১৯১৩ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত তের বৎসর সাগর মেলায় সেবা কার্য্য করিয়া যে সকল সুবিধা এখন যাত্রীগণ পাইয়া থাকেন তাহার হেতু হইয়াছিলেন।

কম পক্ষে ত্রিশ হাজার, উর্দ্ধে লক্ষাধিক যাত্রীর মধ্যে যদি অসুখ আরম্ভ হয় সে অসুখ কত ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে তাহা উপলব্ধি করিয়াই মিশন 'ঘটা করিয়া সেবা' করিবার জন্য ৬০ হইতে ৮০ জন সেবক পাঠাইতেছিলেন। আমরা কিন্তু মোট ৬০ জন সেবক সহায়ে সাগর মেলায় কাজ করিব স্থির করিলাম।

এই সকল সেবকের আহারের সুব্যবস্থা, শয়নের বন্দোবস্ত, এক কথায় যাহাতে সেবকগণ সুস্থ থাকিতে পারেন তাহার জন্য এই বৎসর হইতে স্থির হইল, পাচক, চাকর, রান্নার বাসন পত্র, ভাল চাউল, ডাইল তরকারী প্রভৃতি আহারের সরঞ্জাম জাহাজ সাগরদ্বীপে পৌঁছাইবার পূর্ব্বে পাঠাইতে হইবে।

আমাদের কার্য্য তালিকায় ছিল এই কাজ গুলি সম্ভব হইলে কাঁথি (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দ্বারা করাইতে

হইবে। কিন্তু খরচ পত্র দিবেন মিশন। কাঁথি সেবাশ্রমকে এই কাজে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে যে টাকা বরাদ্দ আছে তাহার উপর প্রায় ৪০৲ টাকা বেশী খরচ হইবার কথা। যেহেতু সেবাশ্রম সক্ষম হইবে কিনা তাহা তখন অনিশ্চিত ছিল। সুতরাং যদি সম্ভব হয়, কাঁথি সেবাশ্রমের সেবকগণ—সাগর মেলায় সেবকগণের আহারের ব্যবস্থায়, যাত্রী পথ ভুলিলে খুঁজিয়া তাহাকে বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে, যাত্রীগণের স্নানের সময় ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া যাতায়তের সুব্যবস্থা করিতে, হঠাৎ কেহ ডুবিয়া গেলে তাহাকে উদ্ধার করিতে, কপিলমুনি দর্শন ও গঙ্গা পূজার সময় সুব্যবস্থা করিতে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে নিযুক্ত থাকিবেন। এই জন্য কাঁথি সেবাশ্রমকে প্রতি বৎসর ২৫ জন করিয়া সেবক সাগর মেলায় উপস্থিত রাখিতে হইবে। মিশনের সন্ন্যাসীগণ সহ ৩৫ জন মেডিকেল স্কুল ও কলেজের ছাত্র, এম, বি পাশ করা ডাক্তার কলিকাতা হইতে জাহাজে যাইবেন। তাঁহারা কলেরা ওয়ার্ডে ও বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র করিয়া ঔষধ পথ্য দিবেন ও সেবা করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর জাহাজে সেবক, ঔষধ ও আহারের যাবতীয় জিনিষ ও রান্নার সরঞ্জাম, আলো প্রভৃতি কলিকাতা হইতেই যাইত।

আমরা যে ভাবে কাজের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম তাহা শরৎ মহারাজকে জানাইবার কোন হেতু ছিলনা। কারণ মঠের শিক্ষা দীক্ষায় ছিল—যে কর্ম্মে আদিষ্ট হইবে তাহাকে সেই কর্ম্মের সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া করিতে হইবে। সেবক-

গণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করিতে হইবে বলিয়া স্বামিজীর আদেশ ছিল,—সূচনা হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত সকল দায়ীত্ব কর্ম্মকুশল সেবকগণের উপরেই অর্পণ করিতে হইবে।

এখানে অতিরিক্ত ৪০৲ টাকা খরচ মঞ্জুর করাইতে হইবে বলিয়া কার্য্য তালিকা শরৎ মহারাজকে জানাইতে হইল। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'এ আর আমায় বলছ কেন; প্রিয়, হেমেন্দ্র ও তুমি পরামর্শ করে যা ভাল বুঝবে করে যাবে।' কিন্তু আমরা যখন বরাদ্দের অতিরিক্ত ৪০৲ টাকা খরচের কথা তুলিলাম তখন তিনি অন্য ভাবে কথা আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন,—'অনিশ্চিতের উপরে এত গুলি টাকা খরচ করবে, তাইত!' তখন আমরা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, যাত্রী পূর্ণ জাহাজে এক সঙ্গে জিনিষ পত্র সহ সকলকে যাইতে ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হয়। অসময়ে জাহাজ গিয়া উপস্থিত হইলে সেবকগণের আহারের ব্যবস্থা করিতে দম বাহির হইয়া যায়। ইহা ছাড়া স্বামিজীর আদর্শে দেশময় কর্ম্ম প্রবাহ চালাইতে হইলে অনিশ্চিতের উপর এই রকম খরচ কিছু কিছু না করিলে 'Be and make' (নিজেরা হও এবং অপরকে কর্ম্মে প্রবুদ্ধ কর) কখন কার্য্যে পরিণত হইবে না। কাঁথি সাগর দ্বীপের নিকটে, সুতরাং তাহাদের যেমন করিয়া হউক সাগর মেলাতে যোগদান করাইতেই হইবে। তাহা না হইলে কাজে শৃঙ্খলা ও আসিবে না অযথা পরিশ্রমের হাত হইতে নিষ্কৃতিও পাওয়া যাইবে না।

মহারাজ বলিলেন,—'পারলে ত পরিশ্রম কমবে, না পারলে?' এইবার নিরুপায় হইয়া বলিলাম—"থাক তবে এখান (কলিকাতা) হতেই সব যাবে। আমরাই সব কাজ করব, 'Be and make' স্বামিজী বলেছেন তা করবার সময় উপস্থিত হলে ও যদি টাকার জন্য না হয় তবে Be হতে পারে make কোন দিনই হবে না কিন্তু।" কিছুক্ষণ চিন্তার পরে তিনি বলিলেন,—'এভাবে যদি যাও তা হলে আমাদের মাল নিয়ে যেতে যে কষ্ট হ'ত তা কমবে বলতে পার? আর তোমার কাঁথির দল পূর্ব্ব হতেই গঙ্গাসাগরে যেয়ে প্রস্তুত থেকে যেমন কলিকাতা হতে জাহাজ যাবে তখনই ছেলেদের খেতে দিতে পারবে বলতে পার?' উত্তরে বলিলাম—আজ্ঞা হাঁ পরিশ্রম ও কমবে খেতেও দিতে পারবে। তখন তিনি বলিলেন.—"বেশ কথা কিন্তু ৪০৲ টাকার বেশী যেন খরচ না হয় দেখবে।"

আজ্ঞে তাই হবে, বলিয়া আমরা উঠিয়া আসিলাম। এই ৪০৲ টাকা বেশী মঞ্জুর পাইয়া আমাদের খুব আনন্দ হইল। শরৎ মহারাজ সর্ব্বদার জন্য কাজে উৎসাহ দেখাইলেও সাধারণের অর্থের যাহাতে কোন অপব্যয় না হয় তাহা দেখিতে যাইয়া এক এক সময়ে এমন কঠিন হইতেন তখন প্রমাদ গনিতে হইত। সে কথার উল্লেখ পরে করিব।

কাজের পূর্ব্বে আমরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদলে চারিজন চলিলাম কাঁথি পথে। অপর দল উদ্বোধনে রহিলেন তাঁহারা জাহাজে সকল লোকজন লইয়া যাইবেন। আমরা কাঁথি আসিয়াছি। আমাদের প্রস্তাব সেবাশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত

করিলাম। সেবাশ্রম সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে সকলে রওনা হইলাম। কাঁথি হইতে রসুলপুরের মোহানা প্রায় নয় মাইল পথ, জিনিষ পত্র গরুর গাড়ীতে আসিল। আমরা পদব্রজে আসিয়া নৌকায় উঠিলাম। সকাল ৯টায় নৌকা খুলিল এবং রাত্রিতে আসিয়া সাগর দ্বীপে উপস্থিত হইল। এই পথ নিকট হইলেও খুব নিশ্চিত নহে। অনুকূল বাতাস পাইয়াছিলাম বলিয়া একদিনে আমরা যাইতে পারিয়াছিলাম। বাতাস না থাকিলে দুইদিনে যাওয়া যাইতে পারে কিন্তু বাতাস প্রতিকূল হইলে ৩ হইতে ৫ দিন ও লাগিতে পারে।

ডিঃ, বোর্ড, পূর্ব্ব হইতে মিশনের প্রধান কেন্দ্র বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাঁথি সেবাশ্রমের সেবকগণ ঘর সংসার গুছাইয়া জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষায় রহিল। বালীর উপরে বিছাইবারজন্য যথেষ্ট পরিমানে খড় ছিল। এই খড়ের উপর কম্বল বিছাইয়া শুইতে পাইয়া সেবকগণ শীত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়া খুসী হইলেন। পরদিন সকালে জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেবকগণ জাহাজ হইতে নামিয়া আসিয়া চা পান করিতে পারিয়া আনন্দে 'শ্রীগুরুমহারাজজীকী জয়' বলিয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিতে লাগিল।

এক এক করিয়া তিন রাত্রিগত হইল—কাজও শেষ হইল। কলিকাতার জাহাজে কলিকাতা হইতে আগত সেবকগণ ফিরিলেন, কাঁথির সেবকগণ নৌকা পথে ফিরিলেন। আমরা দুইজন ডায়মণ্ড-হারবার পথে কলিকাতায় আসিলাম। পরদিন সকল কথা শরৎ মহারাজকে নিবেদন করিলাম এবং বিশেষ

ভাবে জানাইলাম নৌকায় ২৮৲ টাকা মাত্র খরচ হইয়াছে। তিনি শুনিয়া গেলেন—কোন মন্তব্য করিলেন না কিম্বা এমন ভাব ও কিছু প্রকাশ করিলেন না যাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম তিনি খুসী হইয়াছেন।

কাজ কি ভাবে করিতে হইবে এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন,—"কাজ করবে ঠাকুরের মুখ চেয়ে, কাজ করবে স্বামিজীর মুখ চেয়ে। আমেরিকায় বক্তৃতা দিবার সময়ে আমার ভাব ছিল আমি—ঠাকুরকে শোনাচ্ছি। মিশনের কাজ ঠাকুরের মুখচেয়ে—স্বামিজীর মুখচেয়েই করে যাচ্ছি। লোকে কি বললে না বললে তা শুনে কখন কাজ করি নাই। তা করলে সবভাব গুলিয়ে যেত।"

যে সাগর মেলা সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা শরৎ মহারাজ করিয়াছিলেন, উহা শ্রীশ্রীমহারাজের আদেশে ইং ১৯১২ খ্রীঃ প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। মিশন অনেক বৎসর সাগর মেলা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন যাঁহা পরে বন্ধ হইয়া গেল। সাগর মেলার কাজ বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভাপতির সহিত কলেরা ওয়ার্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লইয়া মিশনের সেবকগণের মতান্তর উপস্থিত হয়। কিন্তু মিশন কর্ত্তৃপক্ষের সহকারীগণ বুঝিতে পারিলেন না অথবা চেষ্টাও করিলেন না যে, যে কার্য্যের জন্য ডিঃ-বোর্ডকে সরকারের নিকট জবাবদিহি, প্রতি কার্য্যের জন্য কৈফিয়ত দিতে হইবে সে কাজ সে কেমন করিয়া মিশনের হাতে তুলিয়া দিতে পারে? মিশন কি পারিতেন?

বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারত, বহুশতাব্দী ধরিয়া আত্মকলহে লিপ্ত থাকিয়া বলহীন হইয়াছে। এই বলহীন জাতিকে বলশালী করিবার জন্য, বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একতাস্থাপনের জন্য নানা উপায়ের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে স্বামিজী সেবাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সেবাধর্ম্মে কোন মতলব নাই, কেহ কর্ত্তা হইয়া অপরকে হুকুম করিবে তাহার স্থানও নাই; ইহাতে আছে,—নিষ্কাম ভাবে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে, সেবা পাইবার অধিকারীকে, সেবা করিয়া ধন্য হইবার কথা। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবার মধ্যে কেহ কোন প্রকার মতলব দেখিতে পান নাই। সকলেই দেখিয়াছেন, মিশনের সেবকগণ শত সহস্র অসুবিধার মধ্যেও দরিদ্র, আর্ত্তকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কারণ স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী-সঙ্ঘকে সনাতন ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবকের আসনে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুজাতির সঙ্গে বিভিন্ন জাতিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে, সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করিয়া দেশের সেবা করিতে হইবে এইরূপ অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি বিধানও (item) দৃষ্ট হইবে।

শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামিজী কোন দিনই বিষয়ের ঝঞ্ঝাট ভালবাসিতেন না। অথবা অনিচ্ছুক কর্ম্মীদের কোন কাজে নিযুক্ত করিতেন না। ইদানীং বয়স ও অনেক হইয়াছে সুতরাং স্বামী—বেলুড়মঠকে যখন শুনাইল, No control, no Co-

operation অর্থাৎ সাগরদ্বীপে ডিঃ-বোর্ড কলেরা ওয়ার্ডের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব মিশনের হাতে না দিলে মিশন সেবা করিবেন না। তখন ডিঃ-বোর্ড তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। সুতরাং মঠ হইতে সাগর মেলা সেবা কার্য্য বন্ধ করা হইল।

যে দিন বেলুড় মঠে প্রথম চাকর নিযুক্ত করা হইয়াছিল সেই দিন স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—'মঠের কাজ সকলে মিলে চালিয়ে নিতে পাচ্ছ না বলে যদি লোক রাখতে চাও—রাখ, আমি কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি না সন্ন্যাসীর আবার চাকর কি!' No control, no Co-operation শুনিয়া আমাদের ও কিন্তু মনে হইয়াছিল, যে সন্ন্যাসী—সেবাব্রত, সে control করিবে কাহাকে?

বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সাগরদ্বীপে সেবা কার্য্যে গমন অত্যন্ত পরি-শ্রমের কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন এই রকম কর্ম্ম বেলুড় মঠের কর্ম্ম তালিকাভুক্ত থাকিবে ততদিন মঠের সাধুগণ অভ্যাসের দাস হইবেন না। যে দিন হইতে চালকের দূর দৃষ্টির অভাবে পরিশ্রমের কাজ গুলি কাটিয়া ছাটিয়া বাদ দেওয়া হইবে সেইদিন হইতে আমাদের মধ্যে আরাম বিরামের ভাব বৃদ্ধি পাইবার লক্ষণও দেখা যাইবে। জর্ম্মান জাতিকে দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, কর্ম্মকুশল রাখিবার জন্য যে হেতুতে নিট্‌সে ও ট্রিসকে যুদ্ধ সমর্থন করিয়াছিলেন ঠিক সেই হেতুতে রামকৃষ্ণ মিশনের জীবনী শক্তিকে সজাগ রাখিবার জন্য আমরাও দিকে দিকে অস্থায়ী কর্ম্মের প্রসারতা বৃদ্ধির কামনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা আগত। নানা কেন্দ্র হইতে উৎসব দেখিবার জন্য মঠে সাধুর সমাগম হইতেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ আনন্দ ঘন মূর্ত্তিতে মঠে বিরাজ করিতেছেন। আনন্দের মধ্যে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন।

আজ ঠাকুরের তিথি পূজা। সকালে সানাইয়ের শব্দে মঠ মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রায় সমস্তদিন ধরিয়া, পূজা পাঠ, হোম চলিল। তারপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন। সন্ধ্যার পরে নিত্য আরত্রিক আরম্ভ হইল। স্তোত্র পাঠের পরে শরৎ মহারাজ ঠাকুর ঘরে বসিয়া তানপুরা সহযোগে গান ধরিলেন,—

"দুঃখিনী ব্রাহ্মনী কোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুঠির ঘরে॥" ইত্যাদি।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শ্রীশ্রীকালী পূজা চলিল। শেষ রাত্রিতে হোমের অগ্নিতে বিরজা হোম আরম্ভ হইল। ব্রহ্মচারী বিশ্ব চৈতন্য, রুদ্র চৈতন্য, জ্ঞানানন্দ এবং দেবব্রত শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতির সম্মুখে বসিয়া অহুতি প্রদান করিতেছিলেন। বিরজাহোম শেষ হইবার পরে ব্রহ্মচারীগণ দণ্ড ভঙ্গ করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। যথাক্রমে তাঁহাদের নাম হইল, স্বামী হরিহরানন্দ, ধ্যানানন্দ, ভূমানন্দ এবং প্রজ্ঞানন্দ।

শ্রীশ্রীমহারাজ সেই সকালে বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। সেই পংক্তিতে বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও বসিয়া প্রসাদ পাইতেছিলেন। আমরা সকলে এদিক ওদিক করিতেছিলাম।

সন্ন্যাসের জন্য পূর্ব্বের দিন অভুক্ত ছিলাম বলিয়া বেজায় ক্ষুধা পাইয়াছিল। সুতরাং যখন প্রসাদ পাইবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইলাম তখন শরৎ মহারাজ প্রসাদ ধারনান্তে হাত মুখ ধুইয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। আমার হাতে ভিক্ষার ঝুলি দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন এবং শ্রীশ্রীমহারাজের থালা হইতে ভুক্তাবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা তুলিয়া বলিলেন,—'এসো মহারাজের প্রসাদ আমি তোমায় ভিক্ষা দিচ্ছি।' অপ্রত্যাশিত ভাবে সন্ন্যাস জীবনের প্রথম ভিক্ষা শরৎ মহারাজের হস্তে লাভ করিয়া উহা আনন্দে মস্তকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গার ধারে বসিয়া ভোজন করিলাম। শরৎ মহারাজ সমস্ত দিন মঠে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা যোগে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব গত হইয়াছে। কিছু দিন পরে পূর্ব্ববঙ্গে কালের ভেরী বাজিয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার স্থানে স্থানে হাহাকার আরম্ভ হইল। যে দিন মঠে, পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ সেবাকেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল, সেই দিন স্বামী সারদানন্দের পক্ষে পরম শুভদিন ছিল বলিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বে এই প্রকার সেবা কার্য্য আরম্ভ করিতে এবং সে কাজ চালাইতে শরৎ মহারাজকে কত কথা ও অসুবিধা উভয় সহ্য করিতে হইয়াছে। যদিও শ্রীশ্রীমহারাজ শরৎ মহারাজের উপরে মিশনের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন কিন্তু মঠ ছিল বাবুরাম মহারাজের ব্যবস্থাধীনে। বাবুরাম মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা, ভোগ, আরত্রিক মঠের বাগানের কাজ, এই সমস্তই সাধুদের সাহায্যে সম্পন্ন

করিতে হইত। নূতন নূতন ব্রহ্মচারিদিগকে কাজ কর্ম্ম বাবুরাম মহারাজকেই শিখাইতে হইত। সে দিনে লোক বল মঠের খুব কমই ছিল। তারই জন্য সময় অসময়ে মিশনের কাজের জন্য লোক চাহিলে বাবুরাম মহারাজ ও ফাঁপরে পড়িতেন। এই সকল অসুবিধার জন্য মিশনের কাজে লোকের প্রয়োজন হইলেও বাবুরাম মহারাজ সকল সময় সহানুভূতি দেখাইতে পারিতেন না। কি অতীতের মঠে, কি বর্ত্তমান যুগের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সময়ে মঠ যাঁহার ব্যবস্থাধীনে, তিনিই লোক বল সম্বন্ধে মিশন ও শাখা কেন্দ্রের কাজের ভাগ্য বিধাতা।

তাহা ছাড়া প্রাচীনগণের মধ্যে একদল শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে জগৎ দেখিতে ভালবাসিতেন, অপর দল জীব জগতের মধ্য দিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে ভালবাসিতেন। উভয় পক্ষই ঠাকুরকে ভালবাসিতেন। এক পক্ষের ভালবাসার প্রকাশ হইত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও মঠে দরিদ্র নারায়ণের সেবাতে। অপর পক্ষের ভালবাসা প্রকাশ পাইত দীন, দরিদ্র আর্ত্তদের মধ্যে যে ঠাকুর আছেন তাহার সেবাতে। শরৎ মহারাজের মধ্যে এই দুই ভাবেরই সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইত তিনি বাহিরের কাজেই যেন সমধিক যত্নশীল।

শরৎ মহারাজ থাকিতেন কলিকাতায়, উদ্বোধন কার্য্যালয় ছিল তাঁহার অধীনে। বাবুরাম মহারাজ ছিলেন মঠে, বেলুড় মঠ ছিল তাঁহার অধীনে। কাজের জন্য সে দিনের উদ্বোধনে

মাত্র দুই তিন জন সাধু থাকিতেন। সে দিনে ১৫।২০ জন সাধু মঠে থাকিতেন। বর্ষাকালে ৫।৭ জন মাত্র। তারই মধ্য হইতে যদি কাহাকেও কাজে পাওয়া যায় এই জন্যই শরৎ মহারাজকে ছুটিয়া মঠে আসিতে হইত।

আজও তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের জন্য লোক সংগ্রহ করিতে মঠে আসিয়াছেন। পূর্ব্বের তুলনায় এ সময়ে লোক সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। শরৎ মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে পূর্ব্ব বঙ্গের কথা বলিয়া সেবকের কথা তুলিতেই বাবুরাম মহারাজ সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—পূর্ব্ব বঙ্গে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, শরৎ মহারাজ এসেছেন সেবক সংগ্রহ কত্তে, কে যাবে বল? এই আহ্বানে তরুণ দল প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল—'আমি যাব, আমি যাব।' দুই চারি জন চুপ করিয়া ছিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, 'তোদেরও যেতে হবে ঠাকুরের কাজ আমি একাই চালিয়ে নিতে পারব।' তখনই স্থির হইয়া গেল দশজন মঠ হইতে সেবা কার্য্যে গমন করিবে।

শরৎ মহারাজ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন আর তামাক খাইতেছিলেন। লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া বাবুরাম মহারাজও অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। তখন শরৎ মহারাজ আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বাইরের কাজের ভারও যখন বাবুরামদা নিয়েছেন—তখন জানলেম, স্বামিজীর কাজ এখন থেকে ঠিক চলতে থাকবে। আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত।'

নবম বর্ষ

মিশন দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলাতে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিলেন। আস্‌ধান্য (আউস ধান) কাটা আরম্ভ হইবার পর হইতে চাউল বিতরণও কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময় দিন পনর খুব বৃষ্টি হইল। সেই বৃষ্টির জল পাহাড় হইতে নামিয়া প্রথমে কাছাড় জেলা পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা (ত্রিপুরা) ভাসাইয়া দিয়া গেল। উদ্বোধন হইতে শরৎ মহারাজ লিখিলেন,—'বন্যায় দেশ ভেসে গেছে, ঐ সকল স্থান তোমাদের কর্ম্মস্থলের নিকটে, তোমরা ওখানকার অবস্থা যেমন বুঝবে তেমন কাজ আরম্ভ করবে এ জন্য নূতন করে আর তোমাদের অনুমতি চাইতে হবে না। ঠাকুরের কৃপায় টাকা আসবেই।'

শরৎ মহারাজের আদেশ পাইয়া বন্যার অবস্থা দেখিবার জন্য মঠের সেবকগণ থানায় থানায় যাইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্র খুলিতে আরম্ভ করিলেন। সিলচরেও (আসাম) একটি কেন্দ্র খোলা হইল। ঠাকুরের কৃপায় ১৪টি কেন্দ্রে যে কাজ হইয়াছিল তাহা শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে মতান্তর লইয়া যে মনান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে বেলুড় মঠ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সেই এক তরফা কথা শুনিয়া পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া মঠ

কর্ত্তৃপক্ষ কাজের ব্যবস্থা ভাল হয় নাই বলিয়া যে কথা তুলিয়াছিলেন, তাহার বিষয় আজ কিছু বলিব না, কালস্রোত পার না হইলে বলিব না, কিন্তু একদিন বলিব। শরৎ মহারাজ কিন্তু এক তরফা শুনিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তাই একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'তুমি সকল কথা আমায় বলে যাও—দেখবে যেন কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনার কথা বাদ না পড়ে।' আমি সকল কথা, যতদূর জানাছিল, শরৎ মহারাজকে বলিলাম। তিনি সকল কথা শুনিয়া গেলেন কিন্তু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না।

পূর্ব্ববঙ্গের কাজে যে গোল উঠিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে নানারকম কথা শুনিয়া স্থির করিয়াছিলাম,—ভবিষ্যতে আর কাজ করিব না।

ইং ১৯১৬ খ্রীঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব হইবার পরে একদিন (উদ্বোধনে) শরৎ মহারাজ আমাকে ডাকিলেন। আমি আসিয়া বসিলাম। তিনি গম্ভীর অথচ চির মধুর ভাষায় বলিলেন,—'তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, আজ রাতের গাড়ীতে তোমাকে বাঁকুড়া যেতে হবে, সেখানে কাজ কেমন হচ্ছে, কতদিন কাজ চলা প্রয়োজন দেখে শুনে একটা রিপোর্ট লিখে তা হরিহরকে (স্বামী বাসুদেবানন্দ) দেখিয়ে তার সঙ্গে মিললে তাকে দিয়ে দস্তখত করিয়ে এনে আমায় দিবে। যদি না মিলে হরিহরকে পৃথক রিপোর্ট লিখে পাঠাতে বলে আসবে। সময় ১৪ দিন। তুমি যে দিন আসবে তার

পরের দিন আমরা গয়া রওনা হব। গয়ায় যোগীন মা তাঁর মার৽ কাজ করবেন।' শরৎ মহারাজের বলিবার রকম দেখিয়া 'না' বলিতে পারিলাম না। 'যাব' বলিয়া আমি উঠিয়া আসিলাম।

এতদিন ধরিয়া মঠে দেখিয়া আসিতেছিলাম,—যে যত প্রাণপাত ক'রে, যত বেশী কাজ করে, তার বিপক্ষে বিরুদ্ধপক্ষ তত বেশী। শ্রীমান্ হরিহর বাঁকুড়ায় প্রাণপাত শ্রম স্বীকার করিয়া কাজ করিতে ছিল। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য মঠ হইতে এমন জনকয়েক সেবক পাঠান হইল যাহারা কর্ম্মের গতি বুঝিবার অপেক্ষা না করিয়াই ক্রমাগত হরিহরের বিরুদ্ধে মঠে অভিযোগ করিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া শরৎ মহারাজও এমন একজনকেই পাঠাইলেন যাহার উপর কর্ম্মবিমুখ সাধুগণ ভীষণ খড়্গ হস্ত ছিলেন। শরৎ মহারাজ এই কথা বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু তিনি ইহাও বলিতেন যে,—"বৃহৎ কাজে একটু আধটু মতান্তর হওয়া অস্বাভাবিক নহে; তা বলে কাজ করব না বলা ভাল দেখায় কি?"

যাঁহারা মনে করেন গৈরিকধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনের বিকার দূর হইয়াছে, সকল কর্ম্মে তাহাদের তৎপরতা জন্মিয়াছে, ধর্ম্মের মীমাংসায় 'সর্ব্বজ্ঞত্ব' লাভ হইয়াছে তাঁহারা জানেন না যে, মন সহসা পরিবর্ত্তন নেয় না, সকল কর্ম্ম করিবার মত শক্তি সকলের জন্মায় না, আর সর্ব্বজ্ঞত্ব ও যার তার ভাগ্যে লাভ হয় না।

বেলুড়মঠে কর্ম্মাশ্রয়ে যে কোলাহল তাহা 'রজ' বনাম 'তম'র

বিরোধ। একশ্রেণীর লোক কর্ম্ম করিতে সর্ব্বদার জন্য প্রস্তুত, অপরদল কর্ম্ম না করিয়া অলস জীবনযাপন করিতে বদ্ধপরিকর। এই শেষোক্তদলের লোককে যখনই কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠান হইয়াছে তখনই কোলাহল উঠিয়াছে। ঠাকুর বলিতেন, 'এক গোয়ালের গরু না হলে গুতোগুতি করবেই।'

একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বলিয়াছিলাম,—'যে কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির উপায়, সেই কর্ম্ম করিবার নিশ্চতই একটা প্রণালী আছে। সরকারের এতবড় সাম্রাজ্য চালাইবার জন্য Code (ধারা) আছে। আমাদের Guide (প্রদর্শক) নাই, Code (ধারা) নাই; নাই বলতে কিছুই নাই, তাই কর্ম্ম আমাদের চিত্তশুদ্ধির উপায় না হয়ে তিক্ত হবারই কারণ হয়েছে। মঠ মিশনের কর্ম্মধারা নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে যাঁর যেমন ভাব তিনি তেমন কাজ করে যাচ্ছেন, আর সকলেই মনে কচ্ছেন my doxy is heterodoxy and your doxy is orthodoxy অর্থাৎ আমি যা করেছি তাই মিশনের নিয়ম কিন্তু তুমি যে ভাবে কাজ করেছ উহা মিশনের ভাব নহে।' উত্তরে শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'তুমি যে Guide, Code এর কথা বলছ তা আমাদের নেই সত্য কিন্তু আমাদের যা আছে তা তোমরা পালন কর না বলেই এত গোল হয়ে থাকে।'

আমি বলিলাম,—কোন বিষয়ে বলছেন?

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—

"সকল বিষয়ে। তোমরা কি তোমাদের বড়দের তেমন

মান্য করে থাক যেমন আমরা স্বামিজী, মহারাজ, যোগীন স্বামী, বাবুরামদাকে মেনে চলেছি? তা ছাড়া তোমরা কাজে নেবে ভাব কেমন করে আমাদের খুসী রাখবে? আমাদের মঠের ভাব ত তা নয়। আমরা কাজ করব ঠাকুরকে সামনে রেখে, তিনি দেখ্‌ছেন আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তবে তুমি যে Code, Guideএর কথা বলছ তারও আবশ্যক আছে। তবে এ সকল গুলো যত কম হয় ততই ভাল। বেশী হলে 'আইন' চলবে। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস তখন আর থাকবে না।"

আমি বলিলাম—

"আমরা যখন প্রাচীনদের মানতে পারিনা আর Guide, Code হলে যখন ভালবাসা কমে যাবে ব'লে আপনার বিশ্বাস তখন কেন আপনারা কর্ম্ম আরম্ভ করেন এবং সেই সকল কর্ম্মে আমাদের পাঠান?"

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—এতে যদি তোমাদের সুবুদ্ধি হয়।

সেদিন আর কথা হইল না।

যথা সময়ে বাঁকুড়া হইতে ফিরিয়া আসিলাম এবং শরৎ মহারাজকে রিপোর্ট খানা দিলাম। তিনি খুলিয়া দেখিলেন এবং হরিহরের দস্তখত দেখিয়া খুসী হইলেন। তিনি রিপোর্ট পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। রিপোর্ট পাঠ শেষ হইলে উহার উপরে মন্তব্য লিখিয়া মহারাজ আমাকে বলিলেন,—'এ খানা বিকেলে মঠে দিয়ে আসবে।

কাল আমরা রওনা হব সে সংবাদটাও জানিয়ে আসবে।' 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রিপোর্ট খানা গ্রহণ করিয়া উঠিয়া আসিলাম।

স্থির ছিল বোম্বে মেলে শরৎ মহারাজ রওনা হইবেন। পরদিন ষ্টেসনে আসিয়া দেখা গেল মধ্যমও তৃতীয় শ্রেণী গাড়ী রক্ষিত(Reserved) আছে। ঐ সকল গাড়ীতে যুদ্ধের জন্য এক দল বাঙ্গালী কর্ম্মচারী মেসোপোটেমিয়ায় যাইতেছেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া শরৎ মহারাজকে রাত্রি ১০টার প্যাসেঞ্জারে গয়া রওনা হইতে হইল। পরদিন বেলা ৩টার সময় শরৎ মহারাজ গয়া ধামে উপস্থিত হইলেন এবং পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (স্বামী-শিষ্য প্রণেতা) মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন। পরদিন গয়ালীকে পুরোহিত পাঠাইবার সংবাদ দেওয়া হইল। গয়ালীর লোক আসিয়া সকল কথা পাকা করিয়া গেলেন। যোগীনমা গয়ার কাজ করিবেন তাহার দিন স্থির হইল।

যথা সময়ে যোগীনমা প্রথম দিন ফল্গুতে পিণ্ডদান করিলেন। এদিনে কমপক্ষে শতাধিক পিণ্ড দিলেন, প্রায় দুই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল।

পরদিন বিষ্ণুপদে—এদিন ও প্রায় তত সংখ্যক পিণ্ড দান হইল, সময় ও প্রায় পূর্ব্বের দিনের ন্যায় গত হইল।

পরদিন অক্ষয় বটমূলে—শেষ পিণ্ডদান। একখানা গাড়ী করিয়া শরৎ মহারাজ যোগীনমা কলিকাতা হইতে আগত শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক ভক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় ও আমি সকাল ৮টায় অক্ষয়

বটে আসিলাম। গয়ালীর লোক অর্থাৎ পুরোহিত, গাড়ীর উপরে বসিয়া আসিয়াছিল। টাকা পয়সা আমার নিকট যেমন থাকিত তেমনই আছে। এইবার যোগীনমা কাজে বসিবেন।

সম্মুখে পাহাড়ের উপর ঐ ছোট মন্দিরটি কেমন সুন্দর! একবার দেখিয়া আসিলে হয় না? যোগীনমা যেমন পিণ্ড দিতে বসিলেন আমিও মহারাজকে কিছু না বলিয়া দ্রুত যাইয়া পাহাড়ে উঠিলাম। উপরে উঠিয়া ভাবিলাম—নিত্যই ত প্রায় এক ঘণ্টা করিয়া পিণ্ড দানে গত হইয়াছে। আজও কেন তাহাই না হইবে সুতরাং ঐ ছোট পাহাড়টাও দেখিয়া আসিলে হয় না! যেমন মনে হওয়া অমনি ছুট্! শেষ অর্দ্ধ ঘণ্টা ঘুরিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন দেখি কেহ কোথায়ও নাই। মনটা বড়ই দমিয়া গেল। ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা মনে রাখিতে না পারা আমার রোগ বিশেষ—সুতরাং বুদ্ধি খরচ না করিয়া চলিতে লাগিলাম। বিশ্বাস ছিল—পোষ্ট আফিসে পৌঁছাইতে পারিবই। হঠাৎ সম্মুখে সেই পুরোহিত আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় গিয়াছিলে?" সকল কথা সংক্ষেপে বলিলাম। পুরোহিত বলিলেন,—মহারাজ বড্ড খাপ্পা হইয়াছেন—গয়ালীর বাড়ীতে আছেন—চল। আমিও 'চল' বলিয়া নানা কথার মধ্যে জানিয়া লইলাম—আজ মাত্র ১৩টি পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহাই নাকি নিয়ম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা চলিবার পরে গয়ালীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম মহারাজ উপরের ঘরে আছেন। মুখ হাত ধুইয়া উপরে

গেলাম। আমাকে দেখিয়া শরৎ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "হনুমান! কোথায় ছিলে?"

আমি বলিবার পূর্ব্বেই পুরোহিত আমার পাহাড়ে বেড়াইবার কথা বলিতে লাগিল আমি চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পুরোহিতের কথা শেষ হইলে মহারাজ তেমনই স্বরে বলিলেন— "টাকা পয়সা সব রইল ওর কাছে—উনি গেলেন পাহাড় বেড়াতে!" তখন অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "পরশুত দেখলাম একশ পিণ্ড দিলেন—দুঘণ্টা গেল। কাল'ও তেমনই পিণ্ড দিলেন। আজ যে মাত্র ১৩টি পিণ্ডই দিবেন—এত জানতাম না"—আর বলিতে পারিলাম না—ততক্ষণে তিনি "বাঁদর! তোমাকে আর পিণ্ডির হিসাব দিতে হবে না—আগে পুরুতের পয়সা দাও" বলিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন। যোগীনমা বলিলেন "আহা বাছার আমার মুখখানা রোদে লাল হয়ে গেছে।"

বুঝিলাম এযাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছি। প্রণামী পাইয়া গয়ালী 'সুফল' বলিল। মহারাজ সহ আমরা পোষ্ট আফিসে ফিরিয়া আসিলাম। গয়ার কার্য্য শেষ হইল।

গয়াধামে শরৎ মহারাজের অবস্থান কালে ডাক্তার কাঞ্জিলালের এক আত্মীয় মহারাজকে নিমন্ত্রণ করেন। সন্ধ্যার পর মহারাজ নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য চলিলেন। সঙ্গে শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও আমি ছিলাম। গৃহস্বামী সাদরে মহারাজের অভ্যর্থনা করিলেন।

কিছুক্ষণ নানা কথার পর গৃহস্বামী মহারাজকে বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলেন,—'মহারাজ! মানুষের কার্য্যকরী শক্তি সীমাবদ্ধ না সীমাশূন্য?'

গৃহস্বামী বলিলেন,—'তা হলে আমাদের কর্ম্ম করতেই হবে, যদিও আমরা ইচ্ছা করলেই কর্ম্মে সুফল লাভ করতে পারি না। আচ্ছা মহারাজ! আমরা যদি কাজ না করে চুপ করে বসে থাকি?'

মহারাজ বলিলেন,—'একথার উত্তর শ্রীভগবান্ যিনি অর্জ্জুনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দেখতে পেয়েছিলেন তিনিই অর্জ্জুনকে বলে গেছেন,—"আমি কর্ত্তা এই বুদ্ধি নিয়ে যদি তুমি বল আমি যুদ্ধ করব না—সে জানবে তোমার মিথ্যা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ তোমার স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে (১)।" আসল কথা হল—তিনি সর্ব্বঘটে বিরাজিত, যাকে আশ্রয় করে তিনি যেমন খেলাবেন তাকে তেমন খেলতেই হবে।'

অতঃপর গৃহস্বামী আর প্রশ্ন করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে আহারের জন্য আহ্বান আসিল। মহারাজ গাত্রোত্থান করিলেন। * * *

ইহার পরে মহারাজ কাশীধাম যাত্রা করিলেন। গয়াধামে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সেবায় মহারাজ পরম তৃপ্ত ছিলেন।

যথা সময়ে শরৎ মহারাজ কাশী আসিলেন। এখান হইতে বৃন্দাবনে গেলেন। সেদিন বাঁকেবিহারী দর্শনে গিয়াছিলেন। গাড়ীতে শরৎ মহারাজ যোগীনমা ও আমি। ফিরিবার সময় তিনি (cigar) ধূমপান করিতেছিলেন। আর বলিতেছিলেন, "পূর্ব্বে কোন ও ঠাকুরের বাঁয়ে রাধিকা ছিল না—যাঁরা স্থাপন করেছিলেন তাঁরা (নিজকে প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রীরাধা মনে করিয়া)

(১) গীতা, ১৮শ অধ্যায়, ৫৯ শ্লোক।

প্রকৃতি ভাবে সাধনা করতেন। আমি বলিলাম—'পুঁথিতে যে পড়েছি,—এ সকল স্বপ্নে পাওয়া ঠাকুর!' তিনি বলিলেন, 'উহা পরবর্ত্তী যুগের লেখকেরা লিখেছিলেন—যাঁদের ঠাকুর তাঁরা বলেছেন—একথা তুমি কোথায় পড়েছ?" ব্যস্! যেমন এই কথা মহারাজ বললেন,—যোগীন মা আর কোথায় আছেন, —"নিজেরা ত উচ্ছন্নে গেছ আবার ছেলেগুলো যাতে উচ্ছন্নে যায় তাই শেখান হচ্ছে" বলিয়া আর কত কি বলিতে লাগিলেন শরৎ মহারাজ 'উত্তম বালকের' ন্যায় এমন নিবিষ্ট মনে ধূম পান করিতেছিলেন যেন কিছু শুনিতেই পাইতেছেন না।

জ্যৈষ্ঠমাসের গরমে বৃন্দাবনে অসিয়াছি। নাতু মহারাজ (ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ) এক রামানুজী দর্জ্জি, তার কপালে প্রকাণ্ড তিলক তাহাকে দিয়া মহারাজের জন্য ২টা ও আমার জন্য ২টা জামা করাইয়া দিলেন। ইহাই আমার মঠ-জীবনে বারমাস জামা ব্যবহার সূত্রপাত। পরবর্ত্তী সময়ে একদিন শরৎ মহারাজকে বলিয়াছিলাম,—'বারমাস জামা গায়ে দিবার অভ্যাসটা ত করিয়ে দিলেন এখন—জামা যোগাবে কে?' তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমিই যোগাব।' পরে কিন্তু সে অভ্যাস দূর হইয়াছিল। সুতরাং মহারাজকে আর জামা যোগাইতে হয় নাই।

সে অনেক পূর্ব্বের কথা যখন কোন আমেরিকান মহিলাকে সঙ্গে করিয়া শরৎ মহারাজ বৃন্দাবনে মাত্র ২।৩ ঘণ্টার জন্য আসিয়াছিলেন। তাই এ যাত্রায় বৃন্দাবন আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—রাধাবাগে মিশন সেবাশ্রমের কাজ আরম্ভ হয়েছে,

"নাহু ত দিন রাত কাজে ব্যস্ত—তুমি আমাকে সকল ঠাকুর দেখাইতে পারবে ত ?"

আমার ও প্রায় সেই অবস্থা। আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম তখন নাহু মহারাজ কলিকাতায় আসিয়াছেন। স্বামী গোকুলানন্দ বনভ্রমণে গিয়াছিল এবং ফিরিয়া আসিয়া কলেরায় মরণাপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সেই তিনমাস আমার ভাগ্যে দিন কয়েক শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউ দর্শন হইলেও শ্রীশ্রীমদনমোহন দেখা হয় নাই। গোপীনাথ, রাধারমণ, বাঁকেবিহারী মাত্র একবার দর্শন করিয়াছিলাম। পথঘাট সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তবুও ভরসা করিয়া বলিলাম 'তা হবে'খন।'

একদিন মহারাজ গোপেশ্বর শিবদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে এক সন্ন্যাসী আছেন। শরৎ মহারাজকে দেখিয়া তিনি যত্ন করিয়া নিকটে বসাইয়া প্রথমে পরিচয় গ্রহণ করিলেন, তারপর বৈষ্ণব বাবাজীদিগকে বেদবিরোধী বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। শরৎ মহারাজ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। শেষে শান্তভাবে সেই সাধুকে বলিলেন, "একবার গোবিন্দ জিউ দর্শনে যেতে হবে মহারাজ—উঠি তবে।" কথাবার্ত্তা উভয়েই হিন্দিতে বলিতেছিলেন। সন্ন্যাসী গোবিন্দ জিউ দর্শনে যাইতেছেন শুনিয়া সাধু তেমন প্রসন্ন হইলেন না। মহারাজ কিন্তু প্রায়ই গোপেশ্বর শিব দর্শনে যাইতেন। ইহার পরে কোন দিনই সেই সাধুকে শরৎ মহারাজের সহিত কোন কথা বলিতে শুনি নাই। কিন্তু শরৎ মহারাজ হাত জোড় করিয়া সেই সাধুকে প্রণাম করিতে কখন ভুলিতেন না।

শরৎ মহারাজের কাছে শিখিয়াছিলাম বৃত্তাকারে (cricle) ঘুরিয়া কখন শিব প্রদক্ষিণ করিতে নাই। অর্দ্ধ বৃত্ত ঘুরিয়া তারপর ফিরিয়া আসার নামই শিব প্রদক্ষিণ।

বৃন্দাবনে থাকিতে শরৎ মহারাজ রাধাকুণ্ড দেখিতে গিয়াছিলেন। রাস্তায় কুসুম সরোবর, গিরি গোবর্দ্ধনও দর্শন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিবার পথে মথুরাতে দুই দিন থাকিয়া সকল দেখিয়া লইলেন। আদি-কেশব যে দিন দেখিতে গেলেন—কতকগুলি বালক বালিকা 'দে শেঠ পয়সা দে' বলিয়া মহারাজের পেছু লইল। মহারাজ নির্ব্বিকার চিত্তে আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ও ভারি শেঠ! দেখছ ত আমি সাধু, (হিন্দিতে বলিলেন) দানত ঐ শেঠই কচ্ছে।" আর যায় কোথায়! গম্ভীর স্থূলকায় দেহ দেখিয়া ভয়ে বালক বালিকার দল যাহা করিতে সাহস পায় নাই, এইবার আমার উপর সেই অত্যাচার আরম্ভ হইল। কেহ হাত চাপিয়া ধরিল কেহ কোমর জড়াইয়া ধরিল, 'কেহ পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল আর সমস্বরে 'দে শেঠ পয়সা দে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেদিন ধৈর্য্যটা আমার ও বাড়িয়া গিয়াছিল—আমার ও ইচ্ছা হইয়াছিল ছেলে মেয়েদের জানাইয়া দিতে হইবে—ভারি শেঠ্ কে। শেষ শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'ওদের দিয়ে দাও না' আমি দিতে দিতে বালকদের চুপিসারে বুঝাইয়া বলিলাম ভারি শেঠ্ হচ্ছেন উনি আর আমি হচ্ছি ওঁর নোকর (ভৃত্য) মাত্র।' ব্যাস! এইবার বালকের দল কেহ আর সম্হি করিল না। একেবারে শরৎ মহারাজকে পাইয়া

বসিল। তখন প্রত্যেককে আরও কিছু দিতে আদেশ হইল। ছেলের দল বিদায় হইলে মহারাজকে বলিয়াছিলাম;—হিন্দি না জানিলেও ছেলেদের বুঝাইতে পারিয়াছিলাম,—কে ভারি শেঠ।

শরৎ মহারাজ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"তাকি আর বুঝতে পারিনি!" মথুরার দর্শনাদি শেষ হইল। শরৎ মহারাজ হাতরাস্ পথে কলিকাতা রওনা হইলেন। রাত্রিতে অনেক ক্ষণ হাতরাস্ ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সেই সময় শরৎ মহারাজ, গুপ্ত মহারাজ যে এই হাতরাস্ ষ্টেশনে কাজ করিতেন, তখন স্বামিজীর সহিত যে এই ষ্টেশনে দেখা হইলে স্বামিজীকে গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) যে যত্ন সেবা করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া গেলেন। যথা সময়ে গাড়ী আসিল। শরৎ মহারাজ এলাহাবাদে নামিয়া কলিকাতায় যাইবেন স্থির ছিল বলিয়া এলাহাবাদের টিকিট করা হইল। গাড়ী সমস্ত রাত্রি চলিয়া সকাল বেলা এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎ মহারাজ আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (হরিপ্রসন্ন মহারাজ) এলাহাবাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। যৌবনে হরিপ্রসন্ন মহারাজ ও শরৎ মহারাজ এক সঙ্গে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তারপর ঠাকুরের কাছে আসা যাওয়া, ঠাকুরকে দেখিয়া সকল ছাড়িয়া সাধু জীবন যাপন করা এই সকল কথা মঠে থাকিতেই শুনিয়াছিলাম। হরিপ্রসন্ন মহারাজের যত্নের মধ্য দিয়া শরৎ মহারাজ তিনরাত্রি আনন্দে কাটাইলেন। চতুর্থ দিন কোথায়ও না নামিয়াই একেবারে কলিকাতায় পৌঁছাইবার জন্য রওনা

হইলেন। এলাহাবাদ হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত শরৎ মহারাজ, যোগীন মা ও আমি গরমের জন্য যে কি পরিমানে জলপান করিয়াছিলাম তেমন জলপান বোধ হয় জীবনে কখনও করি নাই। ২৫শে মে সকাল বেলা শরৎ মহারাজ কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন।

শরৎ মহারাজ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন সেই সময় জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার বাড়ী প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠা উৎসবের সংবাদ স্বামী অরূপানন্দ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নানা সংবাদের পর ইহাও লিখা ছিল, বাড়ী প্রতিষ্ঠার সময় আপনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া মার ইচ্ছা আপনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর একবার জয়রামবাটী আসিয়া বাড়ী ঘর কেমন হইল দেখিয়া যান।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার দিন কতক পরে শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী রওনা হইলেন। এ যাত্রায়ও আমি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীমার বাড়ী হইয়াছে শুনিয়াছিলাম এখন চাক্ষুষ দেখিয়া মনে কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলাম। মামারা ভিন্ন হইবার সময় মা যে ঠাকুরের কথায় বলিয়াছিলেন—'ইঁদুরে গর্ত্ত করে, সাপ সেই গর্ত্তে থাকে, আমার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ঘরের প্রয়োজন নাই, দুদিন কালীর বাড়ীতে দুদিন প্রসন্নের ঘরে এই করে চলে যাবে' তাহাই মনে হইতেছিল।

একদিন শরৎ মহারাজ ডাকিলেন এবং কতগুলি কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'পড়ে দেখগে, কিছু যদি বদলাবার

থাকে আমায় জানাবে।' এ যাত্রায় শরৎ মহারাজ থাকিতেন, মার বাড়ীর বৈঠক খানা ঘরে। আমি থাকিতাম শ্রীযুত কালী মামার বৈঠকখানাতে। শরৎ মহারাজের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাগজ খানা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িলাম। দেখিলাম শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর নামে অর্পণনামার মুসাবিদা। পড়িয়া মন শান্ত হইয়া গেল।

কথা স্থির হইল—শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে আসিবেন। রাস্তায় কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে মা দু তিন দিন থাকিবেন, সেই সময় অর্পণ নামা রেজেষ্ট্রী হইবে। তারপর মা যাত্রা করিবেন।

যথা সময়ে শ্রীশ্রীমা পালকীতে কোয়ালপাড়া আসিলেন। সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ) বাঁকুড়া হইতে আগত শ্রীযুত বিভূতিভূষণ ঘোষ প্রভৃতিও পদব্রজে চলিলেন। মাল পত্র কুলির মাথায় দিয়া আমি সেই সঙ্গে চলিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যায় মা কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে আসিলেন। পরদিন সন্ধ্যার পরে কোতলপুর হইতে সব-রেজেষ্ট্রার আসিলেন। দলিল রেজেষ্ট্রী হইল। পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে গরুর গাড়ীতে সকলে কলিকাতা আসিবার জন্য বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। বিষ্ণুপুরে এক দিন থাকিয়া পরের দিন রওনা হইয়া সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে শুভাগমন করিলেন। আষাঢ় মাসে মা উদ্বোধনে আসিলেন—শ্রাবণ মাসে শ্রীশ্রীমহারাজ কন্যাকুমারী দর্শনে তুলসী মহারাজের সঙ্গে রওনা হইলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে ও সঙ্গে নিয়া ছিলেন। এ

যাত্রায় প্রায় সতের মাস শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে ও পুরীতে ছিলাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ প্রথমে মাদ্রাজ আসিলেন এবং মঠের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ব্যাঙ্গালোরে চলিলেন। ব্যাঙ্গালোর হইতে নভেম্বর মাসের প্রথমে কন্যা কুমারী দর্শনে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে তুলসী মহারাজ রহিয়াছেন এবং সকল ব্যবস্থা এমন নিখুঁত ভাবে করিতেছিলেন যাহার জন্য শ্রীশ্রীমহারাজ, তুলসী মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন।

কন্যাকুমারী দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া আসিলেন এবং মহাপুরুষকে কাশীধামে একখানা চিঠি লিখিলেন। তাহাতে নানা কথার পর মহারাজ, মহাপুরুষকে বেলুড় মঠের কার্য্যাধ্যক্ষ হইবার জন্য মঠে ফিরিয়া আসিতে লিখিয়াছিলেন।

দশম বর্ষ

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে, স্বামী সারদানন্দ, যেমন দেখিয়াছি। স্বামী সারদানন্দ ছিলেন মঠ ও মিশনের সেক্রেটারী। সুতরাং তাঁহাকে কর্ম্মের মধ্য দিয়া দেখিতে হইলে মঠ ও মিশনের Constitution (গঠনপ্রণালী), কি নিয়মে মঠ ও মিশন পরিচালিত হইত তাহা কিছু জানা না থাকিলে অনেকে হয়তো বুঝিতেই পারিবেন না, কেন স্বামী সারদানন্দকে সহনশীল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে মঠে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামিজী প্রথমে পূজা ভোগ রাগাদি ব্যবস্থা করিলেন। পরে গুরু ভ্রাতাদের সম্মতি গ্রহণ করিয়া এক দলিল রেজেষ্ট্রী করতঃ স্বামিজী মঠকে দেবোত্তর সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া তাঁহার গুরু ভ্রাতাগণের মধ্যে এগার জনকে সেবাইত (Trustee) পদে নিযুক্ত করিলেন। স্বামিজী ঐ দলিলে সেবাইতগণকে ভবিষ্যতে সেবাইত মনোনীত করিবার অধিকারও প্রদান করিলেন। এই দলিল ৩০শে জানুয়ারী ১৯০১ খ্রীঃ রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল। দলিলে লেখা আছে সেবাইতগণ মঠ রক্ষণাবেক্ষণ নিজেরাই করিবেন। ব্যক্তিগত কার্য্য বা সমষ্টি ভাবে কার্য্য—কাজ যে ভাবেই হউক না কেন, সকল সেবাইতকেই প্রত্যেক কাজের জন্য সমভাবে দায়ী থাকিতে হইবে। এই সেবাইতগণ

মধ্যে শ্রীশ্রীমহারাজ ছিলেন অধ্যক্ষ, সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি মঠের ব্যবস্থাদির ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত করিতেন তিনি তখন মঠের কার্য্যাধ্যক্ষ হইতেন। কিন্তু মিশনের কাজের ভার মহারাজ চিরদিন শরৎ মহারাজের উপর ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন।

এই মঠ ও মিশন পরিচালনা করিতে তাহাকে যে সব উপদ্রব অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগ, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা এবং নীরব সহনশীলতা দেখিয়া শ্রদ্ধায় তাঁহার পদতলে মস্তক নত হইয়া আছে।*

ইং ১৯১৭ খ্রীঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের সময় প্রাচীনগণের মধ্যে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ, হরি মহারাজ মঠে ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ উৎসব দেখিতে উৎসবের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় মঠে আসিলেন। ইংরাজী ২৫শে ফেব্রুয়ারী উৎসব। লক্ষ ভক্তের সমাগমের মধ্যে হাইকোর্টের জজ্ স্যার আশুতোষ চৌধুরী উৎসব দেখিতে মঠে আসিলেন।

২রা মার্চ্চ গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুরলে, তারপর একদিন সি, আই, ডির, বড়কর্ত্তা মিঃ ডেনহ্যাম ও মঠে আসিলেন। এই রকম বিশিষ্ট অতিথির আগমনে শরৎ মহারাজ হাতের শতকাজ ফেলিয়া এবং নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, ছুটিয়া মঠে আসিতেন। কারণ এই

* বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নিয়ম-তন্ত্র-প্রণালী (Constitutional History of the Math and Mission) যাহা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের ইতিহাস' নামে প্রকাশিত হইবে তাহাতে এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে।

সকল সম্ভ্রান্ত অতিথির অভ্যর্থনায় মঠের অপর কেহ সহজে অগ্রসর হইতেন না।

মঠ বা মিশন সম্পর্কে যে সকল শিক্ষিত সম্ভ্রান্তব্যক্তি মঠে আসিতেন তাঁহাদের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করিতে স্বামিজীর দেহরক্ষার পরে একমাত্র স্বামী সারদানন্দকেই সক্ষম দেখিয়াছি। একদিকে বঙ্গের গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল, কূট নীতিজ্ঞ দুর্দ্ধর্ষ মিঃ লায়ন প্রভৃতি রাজ প্রতিনিধি ও কর্ম্মচারীগণ, অপরদিকে মিঃ এ, এম্ বসু, স্যার জগদীশচন্দ্র হইতে দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি সকল স্বামী সারদানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মহত্ত্ব মহানুভবতা এবং উদার সদ্‌গুণরাশি দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। শুধু যে বাহিরের গুণী লোকেরাই তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন তাহা নহে, মঠ-মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সকলেই তাঁহার গুণে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজের দেহরক্ষার পরে কে মঠ মিশনের অধ্যক্ষ হইবেন এই প্রশ্ন যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তখন সঙ্ঘ যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের উপরে তাঁহার প্রভাব কি পরিমাণ বদ্ধমূল হইয়াছিল। সে কথা যথা সময়ে সকলে দেখিতে পাইবেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ তখন দক্ষিণ-ভারতে অবস্থান করিতেছেন এমন সময় বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বক্তৃতায় মিশন সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মন্তব্য করিলেন যাহা স্বীকার করিতে হইলে মিশনকেও বিপ্লবপন্থী বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে।

বেলুড় মঠের এতদিনের সুনাম, দেশে বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের নিষ্কাম সেবা, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অভাবগ্রস্থের জন্য সমব্যবস্থা এই সকলই বিপ্লববাদীদের কার্য্য একথা স্বামী সারদানন্দ মানিয়া লইতে পারিলেন না।

বাঙ্গালার নব জাগরণে দেশে যে সকল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল তাঁহার মূলে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী রহিয়াছে একথা সরকার পক্ষ হইতে Administration Report নামক পুস্তকে ঘোষনা করা হইল। পুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে ঃ—One Bhadralog Narendra Nath Dutt একজন ভদ্রলোক নরেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রতিক্রিয়ার নায়ক বা Brain (মস্তিষ্ক)। এই সরকারী রিপোর্ট বাহির হইবার পরে সরকার ভক্ত ভদ্রলোকের বাড়ীর দরজা মিশনের সেবকগনের পক্ষে রুদ্ধ হইয়া গেল।

সরকার-ভক্ত ভদ্রলোকের মধ্যে, মিশন বিপ্লববাদীদের দ্বারা চালিত, এই কথার সমর্থনে নানা আজগুবী কথার আলোচনা চলিতে লাগিল। ইং ১৯১৫ খ্রীঃ—পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য্য করিতে যাইয়া মিশনকে পুলিশের অযথা সন্দেহের জন্য নানারকম অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্টের কথায় দেশবাসীর মধ্যে মিশনের নামে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা স্বামী সারদানন্দও সম্যক জ্ঞাত ছিলেন।

Administration Report প্রকাশিত হইবার পরে বঙ্গের গভর্ণর মিশনের উপরে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহাতে

অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল এইবার একটা সারকুলার জারি করিয়া অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি সঙ্ঘবদ্ধ দলগুলির বিলোপ সাধনের ন্যায় সরকার মিশনেরও বিলোপ সাধন করিয়া ছাড়িবেন।

সেই দিনের দুর্দ্দিনে শ্রীশ্রীমহারাজ কলিকাতা হইতে বহুদূরে ছিলেন, একা শরৎ মহারাজ সরকারের এই অযথা সন্দেহ দূর করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। নিজ ব্যক্তিত্বের উপর তাঁহার বিশ্বাস অব্যাহত ছিল বলিয়াই সিংহের সহিত সিংহের বিবরে যাইয়া দেখা করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। এবং একখানা মেমোরিয়াল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মঠ মিশনের কর্ম্মপদ্ধতি সরলভাবে লিখিয়া গভর্ণর বাহাদুরকে প্রদান করিবেন স্থির করিলেন।

এই সকল কার্য্যের জন্য শরৎ মহারাজ স্বয়ং ভবানীপুরে যাইয়া স্বামিজীর বাল্যবন্ধু—উকিল শ্রীযুক্ত দাশরথী সান্ন্যালকে কি ভাবে মেমোরিয়াল রচনা করিতে হইবে তাহা বলিয়া আসিলেন এবং কি উপায়ে গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করা যাইতে পারে তাহা দেখিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজের রোজনামচায় লেখা আছে,—Went to Govt, House with Pulin to meet Mr. Gourley at 3-30. P. M. Suffering from influenza অর্থাৎ শ্রীমান পুলিনবিহারী মিত্রকে সঙ্গে করিয়া, বৈকাল সাড়েতিনটার সময় গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ গুরলের সহিত দেখা করিতে গভর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়াছিলাম। ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিতেছি।

স্বামী সারদানন্দের কর্ত্তব্য সাধন পথে পায়ে বাতের বেদনা,

দেহে জ্বরের উত্তাপ এই সকল আধি ব্যাধি কোন বিঘ্ন জন্মাইতে পারে নাই। মিঃ গুরলে শরৎ মহারাজকে জানাইলেন—গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত আছেন।

স্বামী সারদানন্দ ১০ই মার্চ্চ শনিবার (ইং ১৯১৭) গভর্ণমেণ্ট হাউসে গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাতের ফলে গভর্ণরের পূর্ব্ব ধারণা দূর হইয়া গেল, রামকৃষ্ণ মিশন যে বিপ্লব-বাদীদের হস্তে নহে একথাও তিনি সরলভাবে স্বীকার করিলেন।

এই মেমোরিয়াল প্রস্তুত করিতে ও গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিতে শরৎ মহারাজকে যে অত্যধিক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা তাঁহার রোজনামচা দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি।

শুধু কি গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই তিনি নিরস্ত ছিলেন তাহা নহে, গভর্ণরের কৌন্সিলের সদস্য মাননীয় মিঃ পি, সি, লায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে পারিয়া-ছিলেন বলিয়া মিঃ লায়ন স্থির করিলেন শ্রীমান শচীন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ) ও শ্রীমান সতীশের উপর হইতে পুলিশের নজর তুলিয়া লইবেন। আশ্রিত বৎসল স্বামী সারদানন্দের দয়াতে দেবব্রত, শচীন, সতীশ, প্রিয়নাথ, পুলিশের নজর লইয়াই মঠে স্থান লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার আন্তরিক পরিশ্রমের ফলেই এতদিনে শচীন প্রভৃতির উপর হইতে পুলিশের দৃষ্টি সরিয়া গেল। শরৎ মহারাজ যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন, পুলিশ কিন্তু এযাবৎ তাহাদিগকে কখনও অবিশ্বাসী প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই।

ইতিপূর্ব্বে গভর্ণর বাহাদুরের মন্তব্যের প্রতিবাদে দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলি মুখরিত হইয়াছিল। এই সকল সংবাদ পত্রের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে ভাবে প্রবাসীতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'আমাদের আপন জন বলে যাঁরা পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁরা যা লিখতে পারেন নাই রামানন্দ বাবু তার চেয়ে অনেক বেশী কথা লিখেছেন।'

যে মেমোরিয়াল রচনার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা গভর্ণরের নিকট প্রেরণ করা হইল। উত্তরে গভর্ণর (ইং ২৬শে মার্চ্চ) শরৎ মহারাজকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা দুই দিনের মধ্যে কলিকাতার সকল সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইল। দেশবাসী গভর্ণর বাহাদুরকে তাঁহার ভুল ধারণা ত্যাগ করিতে দেখিয়া সুখী হইল।

যদিও শরৎ মহারাজের মাংসপেশী লোহার ন্যায়, স্নায়ু সকল ইস্পাতের ন্যায় এবং মানসিক শক্তি বায়ুর ন্যায় সতেজ ছিল, তবুও বাতে এবং মুত্রাশয়ের অসুখে তিনি দিন দিন দুর্ব্বল হইতে ছিলেন। তাহার উপর শারিরীক ও মানসিক অত্যধিক পরিশ্রমে তিনি ইং ২৯শে মার্চ্চ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাক্তার কাঞ্জিলাল, ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ প্রথম হইতেই দেখিতেছিলেন। কিন্তু রোগের উপশম না হওয়ায় অবশেষে মেজর বার্ডকে আনা হইল। অসুখ খুব গুরুতরই হইয়াছিল। ষোল দিন রোগে ভুগিয়া শরৎ মহারাজ এ যাত্রায় অন্ন পথ্য করিলেন।

অতীতের ঘটনাকে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া অনেকেই বর্ত্তমানের মোহে মাতিয়া থাকিতে চাহেন। আমরাও যদি তাহাই করি তবে কোন দিনই বুঝিতে পারিব না রাজ-রোষ হইতে মিশনকে রক্ষা করিতে যাইয়া কতখানি রক্ত শরৎ মহারাজকে মোক্ষন করিতে হইয়াছিল। সত্যস্বরূপ ঠাকুর সত্যের প্রতিষ্ঠায় স্বয়ং যন্ত্রী হইয়া স্বামী সারদানন্দকেই যন্ত্র করিয়াছিলেন। তাই আমরাও অযথা রাজ রোষ হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তিতে মঠে থাকিতে পারিতেছি। নতুবা কি যে হইত তাহা কল্পনায় অনুভব করিতে হইলে অনেক সাহসীর মনও আতঙ্কে কম্পিত হইয়া উঠিবে।

ইদানীং শরৎ মহারাজ সুস্থ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাজ কর্ম্ম লইয়া আছেন। দক্ষিণ ভারত হইতে সংবাদ আসিল শ্রীশ্রীমহারাজ শীঘ্র পুরীতে আসিতেছেন।

যথা সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ পুরীধামে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সাত মাস এখানে অবস্থান করিয়া আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় হরি মহারাজ মঠ হইতে শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতে আসিলেন। বাবুরাম মহারাজ তখন কালা জ্বরে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য বাগবাজার বলরাম বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুরুভ্রাতাগণের প্রতি শরৎ মহারাজের টান চিরদিন প্রবল ভাবে বিদ্যমান ছিল। এই টানের জন্য তিনি প্রায় নিত্যই বাবুরাম মহারাজকে দেখিতে আসিতেন এবং ডাক্তার বিপিন বাবুর সহিত চিকিৎসাদির পরামর্শ স্থির করিয়া

বাবুরাম মহারাজ যাহাতে শীঘ্র রোগ মুক্ত হইতে পারেন তাহার সকল রকম ব্যবস্থা করিতেন।

গুরুভ্রাতাগণের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল বলিয়াই যখন যাঁহার অসুখের সংবাদ শুনিতেন তখনই শরৎ মহারাজ ছুটিয়া আসিতেন এবং চিকিৎসাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া নিজে বসিয়া থাকিয়া ঠিক ভাবে ঔষধ পথ্যাদি দেওয়া হইতেছে কিনা তাহা দেখিতেন। একবার মঠে বাবুরাম মহারাজের কলেরা হইয়াছিল। এই সংবাদ তাঁহাকে সময় মত দেওয়া হয় নাই বলিয়া তিনি খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যেমন সংবাদ পাইলেন অমনি মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়া যে পর্য্যন্ত বাবুরাম মহারাজ আরোগ্য হইয়া না উঠিলেন সে পর্য্যন্ত মঠে অবস্থান করিলেন।

এই প্রবল অনুরাগ ছিল বলিয়াই হরি মহারাজের অসুখের সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজকে হাতের কাজ ফেলিয়া পুরীতে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছিল।

হরি মহারাজ পুরীতে আসিয়া আমাদের ন্যায় নিত্য রাত্রি থাকিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। একদিন সমুদ্রেও স্নান করিলেন, তাহাতে কানে ব্যথা আরম্ভ হইল। সে ব্যথা সারিয়া যাইবার পর জ্বর হইল। জ্বরের মধ্যে প্রথমে পায়ে ও কোমরে বেদনা অনুভব করিলেন। তখন পরীক্ষায় ডাক্তারেরা জানিতে পারিলেন ঐ সকল স্থানে পুঁজ হইয়াছে সুতরাং অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। উভয় পদের অস্ত্রোপচার হরি মহারাজ বিনা ক্লোরফর্মে সহ্য করিলেন। পূজনীয় শরৎ

মহারাজ উদ্বোধন হইতে শ্রীমান্ প্রিয়নাথ (স্বামী আত্ম-প্রকাশানন্দ) কে হরি মহারাজের সেবার জন্য পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, প্রয়োজন বোধ করিলেই আমাকে জানাইবে। এদিকে শরৎ মহারাজকে দেখিবার জন্য নিত্য হরি মহারাজ সাতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিত্য সকালে যখন কলিকাতার গাড়ীতে লোক আসিবার সময় হইত তখন তিনি বলিতেন,—'ছাখ ত শরৎ এলো কি না?' আমরা আসিয়া ফটকের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতাম, শেষ যাত্রী লইয়া ঘোড়ার গাড়ী যখন চলিয়া যাইত, তখন আসিয়া সংবাদ দিতাম, শরৎ মহারাজ আসেন নাই। সংবাদ শুনিয়া হরি মহারাজ গম্ভীর হইয়া যাইতেন। হরি মহারাজ যে শরৎ মহারাজকে দেখিতে চাহেন একথা কেহ শরৎ মহারাজকে লিখিলেন না।

জীবন্মুক্ত হরি মহারাজ যখন operation চলিতেছিল তখন বালকের ন্যায় তিনি অস্ত্রোপচার দেখিতে ও হাসিতে ছিলেন। দুইটি অস্ত্রোপচার যিনি হাসিমুখে সহ্য করিলেন তিনি শরৎ মহারাজের জন্য এত অস্থির কেন যে হইলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না যে হরি মহারাজের সহিত শরৎ মহারাজের খুব ভাব আছে। সুতরাং হরি মহারাজের এবম্প্রকার উৎকণ্ঠার ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া অবশেষে শরৎ মহারাজকে সকল কথা নিবেদন করিলাম।

পত্র পাইবার তৃতীয় দিনে শরৎ মহারাজ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলেন এবং চতুর্থ দিন সকালে

অর্থাৎ ১৭ই অক্টোবর পুরী 'শশী নিকেতনে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ শশী নিকেতনের বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। শরৎ মহারাজ আসিয়া মহারাজের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় জোড়হাতে অভিবাদন করিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন—'এস শরৎ বস।' শরৎ মহারাজ—মহারাজের নিকটে একখানা আসনে (chair) বসিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া একেবারে হরি মহারাজের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হরি মহারাজ সান্ন্যাল মহাশয়কে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এদিকে যাঁহাকে দেখিবার জন্য হরি মহারাজের এত ব্যাকুলতা তিনি কিন্তু মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ লইতে ব্যস্ত। শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, 'শরৎ তুমি যখন এসেছ এইবার আমি নিশ্চিন্তি।'

মহারাজের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া 'যাই, হরি ভাইকে দেখে আসি' বলিয়া মহারাজের অনুমতি লইয়া শরৎ মহারাজ হরি মহারাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কেহ কোন কথা কহিলেন না। হরি মহারাজ বালকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ একখানা চেয়ার ধীরে ধীরে টানিয়া আনিয়া হরি মহারাজের নিকটে বসিলেন এবং হরি মহারাজের হাত খানা নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এ যেন হরিহরের নীরব মিলন।

শরৎ মহারাজ পুরীধামে আসিবার দিন কয়েক পরে

ডাক্তারগণ হরি মহারাজের কোমর সংলগ্ন দক্ষিণ পদের উপরিভাগে অস্ত্রোপচার করা সাব্যস্থ করিলেন। শরৎ মহারাজ সেই সংবাদ হরি মহারাজকে জানাইলেন।

সংবাদ শুনিয়া হরি মহারাজ যেন ভয় পাইলেন, বালকের ন্যায় কান্নার সুরে বলিতে লাগিলেন,—'আমি আর operation (অস্ত্রোপচার) নিতে পারব না।' শরৎ মহারাজ শুনিয়া চুপ করিয়া আছেন। হরি মহারাজ নানা কথার মধ্যে নিজের অমত প্রকাশ করিতেছেন। ইতি মধ্যে শরৎ মহারাজ হরি মহারাজের হাতে, মাথায়, বুকে ও মুখে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন,'—এই একটিবার শরীর থেকে মনটাকে তুলে নেবে, তার আর কি হয়েছে!' যিনি বলিলেন তাঁহার পক্ষে শরীর থেকে মনটাকে তুলে নেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল কি না তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রত্যক্ষ করিনাই কিন্তু যাঁহাকে বলিলেন তাঁহার পক্ষে যে উহা অতি সহজ সাধ্য তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবুও হরি মহারাজ কেন যে রাজী হইতেছেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু শেষে তিনি রাজী হইলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, 'তা শরৎ তুমি যখন বলছ তাই না হয় করা যাবে।'

এই ক্লোরফর্ম বিহীন অস্ত্রোপচার যাহা হাসিমুখে হরি মহারাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ডাক্তার এস, বি, মিত্র বি, এস্, সি; এম্, বি (লণ্ডন) মুগ্ধ হইয়া হরি মহারাজের বন্ধুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ

করিয়া দুর্গাপদ ঘোষ এম, বি, বলিয়াছিলেন—'ঠাকুরের ভক্তে সকল অসম্ভবই সম্ভব হতে পারে', সেই দৃশ্য আমরাও দেখিয়াছি কিন্তু আমরা ভাবিয়াছিলাম যিনি এক কথায় শরীর হইতে মনকে পৃথক রাখিতে পারেন তিনি বালকের ন্যায় চঞ্চলই বা হইলেন কেন, 'আর operation নেব না' এই কথা বলিয়া কাঁদিলেনই বা কেন !

ইতিহাসে আছে, দেশদ্রোহী ফরাসী সেনাপতি মুরো চুরুট টানিতে টানিতে ডাক্তারকে আদেশ করিতেছেন,—'ডাক্তার পা খানা এখন কাটিয়া ফেলিতে পার।' যখন ডাক্তার পা খানা কাটিতে ছিলেন তখনও সেনাপতি চুরুট টানিতে ছিলেন। একখানা পা কাটিবার পরে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া যখন বলিলেন—'অপর পা খানাও কাটিয়া ফেলিতে হইবে', ইহাতে মুরো বলিয়াছিলেন,—'একথা পূর্ব্বে আমায় কেন বলিলে না তাহা হইলে কোন পা'ই কাটিতে দিতাম না। যাক্, তুমি কাট' বলিয়া আবার চুরুট টানিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী যাঁহার কোন সামরিক শিক্ষা দীক্ষা কখন ছিল না তিনি যে হাসিমুখে এমন অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে পারেন একথা কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই, কোন সংবাদপত্রে ইহার রটনা নাই। সন্ন্যাসী গাঁজা টানে, ভিক্ষা করিয়া খায়, ঔষধ দেয় ইহাই এদেশে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সাধারণের অভিমত।

এই অস্ত্রোপচারের দিন হইতে শরৎ মহারাজ হরি মহারাজকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া গল্প করিতেন।

সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহাদের অতীতের বরানগর মঠের, কেদার দর্শনের কত কি গল্প করিতেন। হরি মহারাজ একটু ভাল হইয়া স্বামিজীর প্রসঙ্গে—আমেরিকার কত গল্প করিতেন, আমরা সেবা করিতে করিতে সেই সকল গল্প মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম।

ইতিমধ্যে ডাক্তার মিত্র জানাইলেন, তিনি পূজার পরে কলিকাতা যাইবেন। এ সংবাদ শুনিয়া মহারাজেরও ইচ্ছা হইল সেই দিন তিনিও হরি মহারাজকে সঙ্গে করিয়া উদ্বোধনে আসেন। একদিন ডাক্তার মিত্র আসিয়া মহারাজকে বলিলেন,—'আমার ইচ্ছা হরি মহারাজকে সঙ্গে করে কলিকাতায় যাই এবং একবার মেজর বার্ড ও মেজর ক্যালভার্টকে দেখাই।'

এই ব্যবস্থায়—শ্রীশ্রীমহারাজ ও হরি মহারাজকে লইয়া ১০ই নভেম্বর শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজের শুভাগমনে শরৎ মহারাজ সমধিক আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন এবং হরি মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের টানে পড়িয়া উদ্বোধন হইতে বলরাম বাবুর বাড়ীতে নিয়মিত রূপে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটিতে বরিশাল হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তেরা বেলুড় মঠ দেখিতে আসিয়াছেন। একদিন তাঁহারা উদ্বোধনে বসিয়া শরৎ মহারাজের বরিশালে আট দিন থাকিবার প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কথাই শরৎ মহারাজের মহাপ্রস্থানের পরে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অতীতের কাহিনী হইলেও শরৎ মহারাজের চরিত্রের ইহা একখানি নিখুঁত চিত্র। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে সে প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিলাম,—"সে আজ অনেক দিনের কথা। ১৮৯৯ সন, পৌষ মাসের শেষাশেষি। নাগ মহাশয়ের দেহত্যাগের কয়েক-দিন পরে স্বামী সারদানন্দ ঢাকা হইতে বরিশালে আগমন করেন। স্বামী সারদানন্দ দেখিতে বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপে তিনি যে কি বস্তু তাহা প্রকাশ পাইত। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রোতার অন্তর প্রদেশে বাজিয়া উঠিত। তিনি বাক্যে ও কার্য্যে অদ্ভুত সংযমী ছিলেন। প্রকৃতি তাঁহার গম্ভীর ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের দু একটি বালক-শিষ্য তখন বি, এম কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল এবং নিত্যানন্দ মহারাজের ইতিপূর্ব্বে এখানে আগমন হেতু শ্রীশ্রীঠাকু-রের একটি ভক্তদল গঠিত হইয়াছিল। মহারাজের আগমন বার্ত্তায় ইহারা মাতিয়া উঠিল এবং তাঁহার থাকিবার সকল-প্রকার ব্যবস্থাদি করিল।

অশ্বিনী বাবুর বাড়ীর সন্নিকটে একখানি নূতন গৃহে শরৎ মহারাজের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যবিজয়, জনসাধারণ বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের মধ্যে বিপুল পুলক সঞ্চার করিয়াছিল। ফলে আত্মবিস্মৃত জাতির অন্তরে আত্মশক্তির এক দিব্য গৌরব জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা, পরমহংসদেবের শিষ্য, বিলাত-আমেরিকা-ফেরত্ স্বামী সারদানন্দ বরিশালে আসিয়াছেন। এযে অভাবনীয়! সংবাদ হুহু করিয়া সহরময় ছড়াইয়া পড়িল।

স্বামী সারদানন্দের দ্বারা স্বামিজীকে দেখিবার সাধ মিটাইবার জন্য শত শত লোক চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। বৃহৎ প্রাঙ্গণটি কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল।

অশ্বিনীকুমার তখন বরিশালে। সংবাদটি তাঁহার ও কানে পৌঁছিল। এদিকে স্বামী সারদানন্দ অশ্বিনীকুমার সহরে উপস্থিত আছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন তখন অশ্বিনীকুমার নিজেই তাঁহাকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। শরৎ মহারাজ অশ্বিনীকুমারের বাড়ী গেলেন। সেখানে যেন উৎসব পড়িয়া গেল। কত আলাপ, কত রহস্য, কত আনন্দ! মাঝে মাঝে দুই বন্ধুর কলহাস্যে গৃহখানি যেন ভরিয়া উঠিতেছিল।

সমবেত উপস্থিত দর্শকগণ সন্ন্যাসীর মুখে দু একটি কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত লইয়া পড়িল। তাই জনৈক বালক-ভক্ত তাঁহাকে আনিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার তখন তাঁহার গৃহে কয়েকদিন থাকিবার জন্য শরৎ মহারাজকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছিলেন। এদিকে দর্শকেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বালক-ভক্তটি উৎসাহ-আধিক্যে শরৎ মহারাজের একখানি হাত নিজের হাতে জড়াইয়া,—'চলুন চলুন' বলিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। তাহার বড় ভয় হইয়াছিল—পাছে মহারাজ অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে থাকিতে সম্মত হন, তাহা হইলে যে তাহাদের বড় সাধে বাজ পড়িবে। একান্তে মহারাজের সেবা ও সঙ্গলাভ করিবার জন্যই না তাহারা গোপনে অশ্বিনীবাবুকে না জানাইয়াই নিজেরা

কষ্টেসৃষ্টে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহাদের সকল আশা বুঝি বিফলে যায়। অশ্বিনীকুমার বালকটির ধৃষ্টতা দেখিয়া চটিয়া গেলেন। "কেহে ছোকরা?"—বলিয়া তিনিও মহারাজের অপর হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"জানিস্, এই চেয়ারে বসে স্বামী ত্রিগুণাতীত তিন মাস কাটিয়েছেন, নিত্যানন্দ স্বামীও কয়মাস এই ঘরে থেকে গেছেন। ইনি আমার কে হন জানিস্? আমার ভাই হন, আমার বাড়ীতে থাক্‌বেন না ত কোথায় থাকবেন? এখানেই থাক্‌তে হবে।" এই টাগ্-অব্-ওয়ারের (টানাটানির) মাঝে পড়িয়া শরৎ মহারাজ ত একেবারে অবাক! একদিকে বালক ভক্ত, অপরদিকে স্বনাম ধন্য দেশনেতা। সে এক দেখিবার দৃশ্য। কিন্তু বালকের টানটিই বুঝি কিছু জোরাল ছিল। এই টানাটানির মাঝখানে অশ্বিনীকুমার হাসিয়া ফেলিলেন। হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "ভক্তের টান জবর টান। ভক্তের টানে ভগবান বাঁধা, শরৎ মহারাজ তোদের ওখানেই থাক্‌বেন। তুই ছাত্র, শিষ্য, তোর কাছে পরাজিত হওয়া—এত আমার গৌরব।" অধিকাংশ সময় অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বালকটি শরৎ মহারাজকে ফিরাইয়া আনিল এবং যে আট দিন তিনি বরিশালে ছিলেন বালকের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে শরৎ মহারাজকে নিত্য অশ্বিনীবাবুর বাড়ী যাইতে হইত।

শরৎ মহারাজের অবস্থান সময়ে প্রাতে আটটা নয়টার পর হইতে এগার বারটা এবং বৈকালে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত

অশ্বিনী বাবুর গৃহে শত শত উৎসুক ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর সহিত শরৎ মহারাজের ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হইত। তখনকার দিনে বরিশালে খুব কীর্ত্তন চলিত। অশ্বিনীবাবু ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে নৈতিক আন্দোলন অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে ধর্ম্ম অর্থে শুধু নৈতিক জীবনই বুঝিত এবং লোকের ধারণা ছিল সাধুদের ধর্ম্ম-উপদেশগুলি বিনাইয়া বিনাইয়া বৈষ্ণব বিনয়ে সিক্ত হইয়া কোমল মৃদু ও মধুস্রাবী হইবে। কিন্তু নূতন সন্ন্যাসীর উপদেশ শুনিয়া তাহাদের ধারণা একেবারে উল্টাইয়া গেল। তাহারা বুঝিলেন, নৈতিক জীবনের অতি উর্দ্ধে ধর্ম্মজীবন। নীতিমান ব্যক্তি ধার্ম্মিক নাও হইতে পারেন। সকলে দেখিলেন,—এই যুবক-সন্ন্যাসী যেন এক সিংহগর্জ্জী পুরুষ! তাঁহার বাক্যাবলী শ্রোতার অন্তরে প্রবেশ করিয়া কোন এক সুপ্ত স্বপ্নবিহ্বল আত্মাকে—মূর্চ্ছিত চেতনাকে যেন স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া দেয়। মহারাজ বলিতেন, "Self-confidence—Self-confidence—what I want. অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয়—আত্মপ্রত্যয়—এই আমি চাই। আত্মপ্রত্যয় জাগিলে কুণ্ডলিনীশক্তি হুঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠিবে। আত্মপ্রত্যয়ের অভাবেই এই শ্লথ বিলম্বিত জাতি দেব-ঋষির বংশধর হইয়াও আজ উদ্যমহীন মৃত্যুমুখে পতিত। এই আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করাই ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্ম। আপনারা আবার দেবতা হইবেন, আবার ঋষি হইবেন, ভারতবর্ষ আবার জাগিয়া উঠিবে, আবার দেবভূমি ঋষিকণ্ঠে বন্দিত হইবে। জগৎ ভারতকে পূজা ও অর্ঘ্য

দান করিবে। * * * * আপনারা আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরুন। আদর্শই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। আদর্শই আপনাদিগকে বল দান করিবে। তাই চাই—অন্তরের ভিতর সূক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি (introspection)। আমাদের শুদ্ধ হৃদয় অন্ধকার পথ সমুজ্জ্বল করিবে। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করুন। বাহির হইতে কেহ কাহাকেও দাঁড় করাইতে পারে না বা শক্তি দান করিতে পারে না। পরমুখাপেক্ষীর চেষ্টা বৃথা। আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করুন, আর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আপনিই আসিবে। আজ যাঁহারা আপনাদিগকে হীন ও দুর্ব্বল ভাবিতেছেন, আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ হইলে কাল তাঁহারাই ভগবানের লীলার সহচর হইবেন। তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া অভাবনীয় বিপুল বীর্য্য প্রকাশ হইবে।" * * *

মহারাজের প্রত্যেকটি বাক্য যেন আগুনের ফিন্‌কি! শ্রোতারা—নির্ব্বাক্ মন্ত্রমুগ্ধ। কি যেন একটা নূতন বাণী তাহাদের মধ্যে দিব্য প্রেরণা সঞ্চার করিয়া দিল। তাহাদের ভিতরটা গম্‌গম্ করিয়া উঠিল। এমনি ছিল মহারাজের দৈনন্দিন উপদেশ। খালি বল, খালি বীর্য্য, খালি তেজ, খালি শক্তি! যে শুনিত সেই ভাবিত, সে বড়—কখন হীন নহে; মরা মানুষও যেন বাঁচিয়া উঠিত। সহরে আত্মপ্রত্যয়ের বান যেন ডাকিয়া উঠিল।

ছাত্রদের উপদেশ-প্রসঙ্গে মহারাজ যেমন আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য জোর দিতেন তেমনি বিজ্ঞান পড়িবার জন্য

বিশেষ করিয়া বলিতেন। মহারাজের অগ্নিগর্ভ উপদেশ শুনিয়া নর নারী দলে দলে দীক্ষা লইবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইতে লাগিল। তিনি কিন্তু ঠাকুরের কথায় বলিলেন, 'মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কাণে, জগৎগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।' আপনারা খুব করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করুন, বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন আলোচনা করুন, মূর্খ থাকিয়া কি লাভ? লোকের কথায় কেবল চালিতই হইবেন, কোন কিছু একটায় নিষ্ঠা-সহকারে লাগিয়া থাকিতে পারিবেন না। একটু জ্ঞান লাভ হইলেই বুঝিতে পারিবেন দেশকাল ভেদে আপনাদের প্রাণ কি চাহিতেছে। আপনাদের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি কি? আপনাদের আদর্শই বা কি? শুধু হুজুক করিয়া দীক্ষা দীক্ষা করিয়া মাতিলে কি হইবে? জমি প্রস্তুত হইলে ভগবান আপনিই দীক্ষা দিবেন! সেই দীক্ষা-লাভের জন্য হৃদয়ের কপাট খুলিয়া সতত উন্মুখ হইয়া থাকুন। সময় হইলে কাহার মুখ দিয়া—কাহার হৃদয় হইতে প্রেরণা লাভ করিবেন তাহা কে বলিতে পারে? কোন্ পথ দিয়া প্রভু কাহাকে তাঁহার আঙ্গিনায় লইয়া যাইবেন তাহা কে জানে? কিন্তু প্রাণে প্রাণে সত্যিকার দীক্ষা পাইলে তাহা মানুষ বুঝিতে পারে। আনুষ্ঠানিক দীক্ষার একটা contagious spirit (ছোঁয়াচে ভাব) আছে। একজন দীক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করিলে উহা বহুর মধ্যে সংক্রামিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে atmosphere পরিষ্কার হইলে ঐ spiritটি কাটিয়া যায়। তখন লোক যেই সেই। তাহাতে বরং অনিষ্ট হয়। ব্যক্তিত্বের মোহে হঠাৎ কিছু করা উচিত নহে। হুজুক কাটিয়া গেলে

জ্ঞান-মার্জ্জিত বিচারবুদ্ধি লইয়া গুরু নির্ণয় করিয়া স্থির শান্ত চিত্তে বজ্রদৃঢ় সংকল্প লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।" বস্তুতঃ এখানে মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। ভগ্ন মনোরথ হইয়া কত নর নারী ফিরিয়া গেলেন।

স্বামী সারদানন্দ প্রকাশ্য সভায় তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে প্রথম বক্তৃতাটি হইবার কথা ছিল। স্থান ছিল—সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা। কিন্তু তাহা হইতে পারে নাই। ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার তৎকালীন সম্পাদক জনৈক ব্যবহারজীবী বক্তৃতার নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সভা হইবার অনুমতি প্রত্যাহার করিলেন; কারণ, স্বামী সারদানন্দ বিলাত ফেরত্। বিলাত ফেরত্ সন্ন্যাসীর আগমনে সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা যে কলুষিত হইয়া যাইবে! যিনি শাস্ত্র-বিধান লঙ্ঘন করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে পারিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার অধিকার নাই! এই সংবাদ শ্রবণমাত্র 'অশ্বিনীকুমার,' কালীশচন্দ্র-প্রমুখ মনীষিগণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কি উত্তেজনা! কি চাঞ্চল্য!! উহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জনতা হইতে ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায় লোষ্ট্র-নিক্ষেপ আরম্ভ হইল, গৃহখানির উপর নানারূপ উপদ্রবের উপক্রম হইল। অশ্বিনীকুমার অতিকষ্টে ক্ষুব্ধ জনতাকে সংযত করিয়া পরদিবস হইতে তাঁহার কলেজে সভা হইবে ঘোষণা করিলেন।

উত্তেজনার ফলে তিন দিনই সভায় বিপুল জনসমাগম

হইয়াছিল—সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রসিদ্ধ ব্রজমোহন-হলে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। বারাণ্ডা ভর্ত্তি হইয়া গেল। প্রাঙ্গণে ও রাস্তার উপরে লোকের ভিড়। অনেক মহিলা স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অশ্বিনী-কুমার তিন দিনই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং তিন দিনই ইংরাজি বক্তৃতা বাংলায় তর্জমা করিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা শ্রোতারা কিন্তু বলিতেন, স্বামিজীর বাক্যাবলি ইংরাজিতে হইলেও উহা এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, প্রাণে আসিয়া সজোরে আঘাত করিত। ভাল ইংরাজি না জানিলেও তাঁহারা বিনা কষ্টে বাংলার ন্যায়ই সহজে মর্ম্ম-গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন। বক্তৃতার ভাষা ছিল, এরূপ প্রাণপ্রদ! বক্তৃতার পরে নিত্য কিছু সময় ধরিয়া নানারূপ প্রশ্নোত্তর চলিত, প্রশ্ন করিতে দেরী হইলেও উত্তর দিতে দেরী হইত না। বিষয়গুলি যেন মহারাজের জলবৎ সহজ হইয়াছিল, উত্তরগুলি যেন তাঁহার নখদর্পণে ছিল। শরৎ মহারাজের উত্তর দিবার ভঙ্গীটি বড় চমৎকার ছিল, যেন ন্যায়শাস্ত্রেরই (Logic) সিদ্ধান্ত করিতেছেন। বাবু গোরাচাঁদ দাস সে দিনের বারে প্রসিদ্ধ উকীল, ভক্তও পণ্ডিত লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অধিকাংশ প্রশ্ন তিনিই করিতেন। সভার মুখপাত্র হিসাবেও তিনি অধিকাংশ প্রশ্ন করিতেন। প্রথম দিনে বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকত্ব আলোচনা-কালে মায়াবাদ-প্রসঙ্গে মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। গোরাচাঁদ বাবু ভূমিকা করিয়া কহিলেন, "স্বামিজী, একটি জটিল প্রশ্ন করিতেছি দয়া করিয়া বিশদভাবে বুঝাইবেন কি?

আপনি যে বলিয়াছেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ব্রহ্ম ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহা হইলে যদি একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন তবে আমরা এই সৃষ্টি ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য (diversity) দেখিতেছি কেন ?" শরৎ মহারাজ কহিলেন, "প্রশ্নটি ঠিক করিয়া বলুন। This question is self-contradictory and illogical. If you can put it in logical form, I can answer"—শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক একেবারে থ' হইয়া গেল। গোরাচাঁদ বাবু প্রশ্নটিকে পুনঃ পুনঃ ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সাজাইতে চেষ্টা করিতে যাইয়া প্রতিবারই দেখিলেন প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তখন শরৎ মহারাজ একটু হাসিয়া কহিলেন, "This question was asked a thousand times from the very beginning of civilization but subsequently fell through as it could not logically stand" তারপর তিনি বুঝাইয়া দিলেন। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ ছিল,—সৃষ্টির কোন অখণ্ড ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মনের সম্বন্ধে ইহার আপেক্ষিক সত্তা মাত্র আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় সহায়ে জিনিষটা এক প্রকার জানিতে পারিতেছি কিন্তু যদি আর একটি ইন্দ্রিয় থাকিত তাহা হইলে আবার কিছু অন্যরূপ প্রতিভাত হইত। সুতরাং ইহার কোন সত্যিকার নিজ সত্তা নাই। ইহা অপরিবর্ত্তনীয়, অনন্ত ও সর্ব্বগ নহে। ইহা আমাদের মনের সৃষ্টিমাত্র, মনের ভিতরে দেশ, কাল ও নিমিত্তের যে ধারণা আছে তাহারই সাহায্যে এই স্থূল জগতের প্রকাশ দেখিতে পাই, সুতরাং ইহা হইতে

প্রমাণিত হইতেছে অখণ্ডের ভিতরে দেশ নাই, কাল নাই, নিমিত্ত নাই, কারণ মনই যে সেখানে নাই। যেখানে মন নাই সেখানে কালের (time) কল্পনা অসম্ভব। তদ্রূপ সেখানে বিকাশ বা সৃষ্টির জন্য আলাদা দেশ (space) অসম্ভব। তিনি মাত্র এক, অদ্বিতীয়,—সেখানে কোনরূপ কার্য্যকারণ (causation) থাকিতে পারে না। এই ভুল দেখাটা মনের সৃষ্টি, মন সহায়ে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি বা ভাবিতেছি তাহাই মায়া। যতই ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিব ততই আমরা চক্রাকারে এই মায়ার মধ্যে ঘুরিতে থাকিব। সুতরাং মায়ার বাহিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত জগৎটা যে মিথ্যা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব না। সান্ত মন লইয়া অনন্তের ধারণা অসম্ভব। ব্রহ্ম উপলব্ধি দ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্তি ঘটে। স্বস্বরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইলে মায়া বিদায় গ্রহণ করে। তখন আর রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় না—জগতের অস্তিত্ব থাকে না। একমাত্র স্বতঃপ্রকাশমান ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকেন. কাজেই বুঝিতে পারিতেছেন মায়ারাজ্যে মায়াতীতের প্রশ্ন যুক্তি-সঙ্গত নহে।

শরৎ মহারাজের উক্ত আলোচনাটি এত সহজ, এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, শ্রোতাগণ হর্ষে মুহুর্মুহু করতালিধ্বনিতে সভাগৃহ মুখর করিয়া তুলিল। অবশেষে গোরাচাঁদ বাবু ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "এরূপ পাণ্ডিত্য, এরূপ সহজ জ্ঞান, এরূপ তত্ত্ব-উপলব্ধি ও সরল প্রকাশভঙ্গী আমি জীবনে কখন দেখি নাই। স্বামিজীর প্রাণপ্রদ ধর্ম্মালোচনা আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয়

অনেক আজগুবী ধারণা ও কুসংস্কার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনব ধর্ম্মব্যাখ্যায় বরিশালে এক নবযুগের সূচনা করিল। এখন স্পষ্ট বুঝিতেছি, ধর্ম্ম শুধু শাস্ত্রে নহে, উহা আমাদের অন্তরে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠার ও আচরণের বস্তু।"

প্রথম দিন বক্তৃতার বিষয় ছিল—Vedanta, the Universal Religion. (সার্ব্বভৌম বেদান্ত-ধর্ম্ম)। অশ্বিনীকুমার স্বামিজীকে লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তরুণ সন্ন্যাসীর অঙ্গে আজানুলম্বিত গৈরিক আলখাল্লা, মস্তকে গৈরিক পাগড়ী, চোখে মুখে এক উজ্জ্বল দীপ্তি, উন্নত গ্রীবা, পুষ্ট দেহখানি,—গেরুয়ায়-গেরুয়ায় এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বরিশাল-বাসীর ধারণা ছিল—সন্ন্যাসী জটাজূটধারী, ভস্মমাখা, নগ্নদেহ হইবে। কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত—কল্পনার অতীত, এ যে জুতামোজাপরা 'বাবু' সন্ন্যাসী! কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল,—গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ অতিক্রম না করিয়াই যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে? অশ্বিনীবাবুর কানে বোধ হয় সে কথা গিয়াছিল। তাই সভার প্রারম্ভে স্বামী সারদানন্দজীর পরিচয় উপলক্ষ্যে বলিলেন, "স্বামী সারদানন্দজী ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন চিহ্নিত সন্ন্যাসী শিষ্য। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা, পরমহংসদেবের কৃপায় শুধু বিশ্ব-আলোড়নকারী একজন বিবেকানন্দই যে সৃষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার কৃপায় ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন বিবেকানন্দ। এক একজনে যেন এক একটি আগ্নেয়গিরি। ইঁহাদের বাক্য, হাবভাব, প্রতি ভঙ্গিতে, ইঁহাদের জীবন-যাত্রার

আঁকেবাঁকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। ইঁহাদের সত্তাটিই যেন জ্বলিতেছে, ইঁহারা যেখানে অবস্থান করেন ও যে পথ দিয়া চলিয়া যান সেখানেরই অমঙ্গল ভস্মীভূত হয়। যাহারা ইঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িবে তাহারা জীবনে ইঁহাদের একটা উত্তাপ অনুভব করিবে। ইঁহাদের প্রভাবে বাঘে ও মহিষে এক ঘাটে জল খায়। আমি আলমোড়ায় দেখিয়াছি, ভারতবাসীর সহিত এক সঙ্গে ইংরেজ, বিবেকানন্দের পদসেবা করিতেছে, জুতা খুলিতেছে। ইঁহারা ঠাকুরের বিশেষ কার্য্যের জন্য, শরীর ধারণ করিয়াছেন। যদি স্বামী বিবেকানন্দকে আপনারা দেখিতেন তবেই বুঝিতে পারিতেন স্বামী সারদানন্দ তাঁহারই একটি অবিকল প্রতিচ্ছবি। ইঁহারা আজন্ম সন্ন্যাসী, ঠাকুরের উপদেশ-বর্ণিত হোমাপাখী। ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই ঊর্দ্ধমুখগতি। তাই সংসার আশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও ইঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্রবিগর্হিত নহে। ইঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য অভিনব সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি ভগবান পরমহংসদেবের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে বিবেকানন্দের মত অল্প বয়সেই ইংলণ্ড আমেরিকা গমন করিয়া অদ্ভুত তপঃশক্তি ও পাণ্ডিত্য-প্রভাবে তত্রত্য বুধমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। আজ আপনারা ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ধন্য হউন।”

বক্তৃতাকালে স্বামিজী স্থানুর মত নিশ্চল দণ্ডায়মান, হস্ত বক্ষোপরি পরস্পর সম্বদ্ধ। মাঝে মাঝে গ্রীবা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। গৈরিক-মণ্ডিত শান্ত সমাহিত চিত্র আলোক-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া এক বিচিত্র মহিমা সৃষ্টি করিতেছিল। স্বামিজীর

নাতিউচ্চ সুকোমল কণ্ঠধ্বনি দূর হইতে শ্রুত হইয়া শ্রোতৃহৃদয়ে কথার আঁকেবাঁকে রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চের লহর তুলিতেছিল। বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত সভা নিস্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ। সভা ভঙ্গ হইলে সকলেই যেন কি এক নূতন আলোক লাভে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অশ্বিনী বাবু বরিশালের প্রসিদ্ধ বাগ্মী। বক্তৃতাকালে হাতের নানা ভঙ্গিতে তাঁহার বক্তব্য সহজভাবে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ একেবারে নিশ্চল থাকিয়া বক্তৃতা করাতে বক্তৃতা একটি অশরীরী বাণীর মতই শ্রুত হইল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জনৈক ভক্ত মহারাজের নিকট এ বিষয় প্রশ্ন করিলেন। মহারাজ উত্তরে কহিলেন, "বক্তৃতার সময় ঠিক ঠিক হাত নাড়া, ভঙ্গিকরা একটা মস্ত বড় আর্ট, বাগ্মীরা উহা করিয়া থাকেন। Art of Oratoryতে এ সব আছে। উহাতে বক্তৃতা খুব impressive করা যায়। কিন্তু স্বামিজী ঐসব পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, বক্তৃতার সময় অহঙ্কারকে তাড়াইয়া দিয়া শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মৌনভাবে সমাহিত চিত্তে ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। যাহা বলিবার তিনিই বলাইবেন ও তিনি নিজেই শুনিবেন। এইরূপে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বক্তৃতা করিলে তবে সে বক্তৃতায় ভগবানের বাণী প্রচারিত হয়। অহঙ্কার জাগিলেই 'ব্যস্', তোমার কথাই বলিবে, ভগবান পলাইয়া যাইবেন। তাঁহার বাণী আর প্রকাশ করা হইবে না। পূর্ব্বে কথা বলিতে গেলেই আমার হাত পা ছোড়া মুদ্রাদোষ ছিল।

বিলাতে স্বামিজী হাতে একটা ছড়ি লইয়া বসিতেন এবং আমাকে আয়নার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বক্তৃতা করিতে আদেশ করিতেন। হাত পা নড়িলেই স্বামিজীর বেত আসিয়া হাতের উপর আঘাত করিয়া আমাকে সজাগ করিয়া দিত। এমনি কত যত্ন করিয়া তিনি আমার সেই দোষটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার হাতের বেত খাইয়াই ত শিখিয়াছি! তিনি এমনি করিয়াই হাতে কলমে আমাদের শিখাইয়াছেন।" এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "বিলাতে স্বামিজী অনেক দিন আমাকে সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য কহিয়াছেন, কিন্তু বক্তৃতার নাম শুনিলেই আমি চঞ্চল হইয়া পড়িতাম এবং 'আজ না' 'আজ না' বলিয়া দিন কাটাইতাম। ভাবিতাম কি বলিব? কিছুইত জানি না, মাথামুণ্ড কিছু ভাবিয়াও পাইতাম না। স্বামিজীর কাছে এই কথা বলিলে তিনি একদিন ধমক দিয়া কহিয়াছিলেন, 'তোর এত মাথাব্যথা কেন?' ঠাকুরের কাজ করতে এসেছিস। তুই উপলক্ষ মাত্র, সভায় গিয়ে দাঁড়াবি, তাঁহার যা খুসী বলিয়ে নেবেন। ভাল মন্দ তাঁহার—বিবেচনা করতে তুই কে? দেহাভিমান নিয়ে ঠাকুরের কাজ! ওটাকে ছুড়ে ফেলতে না পারলে এসেছিলি কেন? যা ফিরে যা, দেহাভিমান থাকতে ঠাকুরের কাজ হয় না।" স্বামিজীর গালাগালিতে অভ্যস্ত থাকিলেও আমার প্রাণে বড় লাগিল—বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। একটু পরেই স্বামিজী আবার কহিলেন, "ক্ষেপেছিস্ না কি! 'পারব, পারব' বললেই সকল

পারবি, তোকে দিয়ে ঠাকুরের অনেক কাজ হবে। সেকথা আমি জানতে পেরেছি, তুই সভায় শুধু গিয়ে দাঁড়াবি। দেখবি, ঠাকুরের কাজ তিনিই করবেন।" কি জানি ও সব— আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ঘটনাক্রমে স্বামিজীর ঐ দিনই একটি বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। সভাস্থলে যাইয়া হঠাৎ প্রকাশ করিলেন, সে দিন তিনি বক্তৃতা করিবেন না—করিবেন তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ। আমি ত কাঁপিয়াই অস্থির। মনে মনে স্বামিজীর উপর রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও উঠিতেছিলাম না দেখিয়া স্বামিজী ধাক্কা দিয়া কহিলেন, "যা বল্‌গে—ভয় নেই।" সেই স্পর্শে, সেই স্বরে আমি যেন মন্ত্রচালিত হইয়া বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলাম। তারপর আর কিছু মনে নাই। বক্তৃতা শেষে স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—বক্তৃতাটি তাঁহার আশানুরূপ হইয়াছে। গুডউইন্ হাসিতে হাসিতে আমাকে জানাইল যে, বক্তৃতাটি খুব ভালই হইয়াছে। যাক্ বাঁচিলাম, বুক হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল, বড় ভয় হইতেছিল স্বামিজীর গাল আবার কতই না খাইতে হয়।

দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল Origin and Development of Religion। এই বক্তৃতায় মহারাজ প্রথম ভয়, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি হইতে কিরূপে ধর্ম্মের উদ্ভব হইল, কিরূপে ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক মূল সূত্রগুলি (laws) আবিষ্কৃত হইল ও তৎপরে ক্ষণস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়ের ধারণা আসিল—মায়াবাদের উদ্ভব এই সকল পরপর দেখাইয়া যাইতে লাগিলেন। তারপর তিনি বিবৃত

করিলেন,—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ধর্ম্মের সংজ্ঞা হইতে একত্ববোধ। সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্য এবং বিনাদ্বন্দ্বে একলক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য নীতিধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। ইহাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম আরও পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈদিক ঋষি বলিতেছেন, ভগবান সত্যশিক্ষা দিবার জন্য মানুষ হইয়াছেন এবং মানুষও পুনরায় ভগবান হইতে পারেন। ধর্ম্ম-আদর্শের চরম পরিণতির বীজ মাঝে মাঝে লক্ষিত হইলেও বর্ত্তমানে এই কয়েক বৎসর হইল উহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই পরিণতির দুইটি ধারা—সর্ব্বভাব ও ধর্ম্মসমন্বয় এবং সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের সেবা। পূর্ব্বে ভূমানন্দে মগ্ন হইয়া, সমাধিতে জড়বৎ থাকা যে চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত, বর্ত্তমানে ঐ ভূমানন্দ ত্যাগ করিয়া উচ্চতম ভূমি হইতে মনকে জোর করিয়া আনিয়া, আপনাকে বিপুল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়—ভগবানের বিরাট ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণপূর্ব্বক যন্ত্রবৎ চালিত হইয়া, দ্বৈতাদ্বৈত ভূমির সীমা-রেখার উপরে অবস্থিত থাকিয়া, সেবা-জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আদর্শটি কিরূপে কার্য্যে পরিণত হতে পারে তাহাই বুঝাইতে যাইয়া শরৎ মহারাজ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছিলেন,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি শক্তির বিকাশ পথে কিরূপ শারীরিক ক্রিয়া উৎপাদন করে। এই অন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমান্বয়ে শুদ্ধ হইলে প্রকৃতির ইচ্ছা ঠিক ঠিক উপলব্ধি ও ধারণ করিতে পারে এবং উহা মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রবৎ চালিত

করে। মানুষের কাঁচা 'আমি'টি তখন চিরকালের জন্য মরিয়া যায়, সে ভগবানের হাতের যন্ত্র হয়। তখন আর বেতালে পা পড়ে না। কিন্তু কামগন্ধ কিছুমাত্র থাকা পর্য্যন্ত অথবা স্ত্রীপুরুষ ভেদ বুদ্ধি থাকিতে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের দিব্য প্রেরণায় চালিত হওয়া অসম্ভব। এই স্ত্রী পুরুষ ভেদবুদ্ধি চিত্ত হইতে ধুইয়া মুছিয়া না গেলে ধর্ম্মজীবন যাপনের আরম্ভই হইতে পারে না, ইহা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। মহাপুরুষ বা অবতারদের জীবন শাস্ত্র বাক্যের যথার্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা এইরূপ একজন মহাপুরুষের পদতলে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, যাঁহার মধ্যে দেহবুদ্ধি বা কামগন্ধের লেশমাত্রও ছিল না। তিনি নারীমাত্রকেই জগজ্জননী বলিয়া দেখিতেন। তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয়-গ্রাম এরূপ বিশুদ্ধ ও একসুরে বাঁধা ছিল যে, জগন্মাতার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও তাহাতে ধরা পড়িয়া তাঁহাকে কলের মত চালিত করিত। জগন্মাতার আদেশে তাঁহার জীবনের প্রতি কার্য্যটি নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার সাধনা এরূপ অদ্ভুত তীব্র ছিল এবং লোক-শিক্ষার নিমিত্ত জগন্মাতার আদেশ যে অন্তরে উপলব্ধি করিতেন তাহা নহে, পরন্তু উহা শব্দ-স্পর্শে শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত। তিনি মনুষ্য কণ্ঠের মতই তাহা স্পষ্ট ও নিবিড় ভাবে শুনিতে পাইতেন। তাই তিনি বলিতেন, হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিতে হয়।"

এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ আরও বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম—শাস্ত্র, তীর্থ বা মন্দিরের ভিতর নহে, ধর্ম্ম অনুভূতির বস্তু

সুতরাং বেশ ভূষা বা সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহারের মধ্যে নিহিত নহে। ধর্ম্ম—আচরণের, জীবনের প্রতি স্তরে প্রতি কার্য্যে প্রতিষ্ঠার বস্তু, ধর্ম্ম অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ মাত্র সুতরাং উহা সহজ হইবার জিনিষ।"

তৃতীয় দিনের বিষয় ছিল জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়। এই বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষের পূর্ণ জীবন লাভ করিতে হইলে এই ভাব ও সমন্বয়ের প্রয়োজন। পূর্ব্বপূর্ব্বগ আচার্য্যগণের জীবনে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। যদিও সময় বিশেষে লোককল্যাণের নিমিত্ত কাহারও ভিতরে জ্ঞানের প্রাখর্য্য, কাহারও ভিতর ভক্তির আতিশয্য, কাহারও ভিতর কর্ম্মের অদ্ভুত প্রেরণা লক্ষিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের জীবনী সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের মনীষার মূলে—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সমন্বয়ের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির লক্ষ্য এক এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই আদর্শে পৌঁছাইবার সমান শক্তি। পরস্পরের কমবেশী সাহায্য ব্যতীত ইহার একটিও স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়াইতে পারে না। জ্ঞান ও ভক্তির প্রতিষ্ঠা আবার কর্ম্মের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে।"

*　　*　　*　　*　　*

ষষ্ঠদিনে অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সাধারণের আলাপ-আলোচনা বন্ধ করিয়াদিলেন। অভিপ্রায়—এতদিন দিনরাত বিপুল জনসমাগম হেতু তাঁহারা একান্ত করিয়া মহারাজের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, আজ তাঁহারা প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া লইবেন।

ব্রজেন নন্দী, সুরেন সেন ও যোগেন্দ্র-প্রমুখ ভক্তগণ মহারাজকে কহিলেন, "সভাসমিতি ও আলোচনায় একমাত্র অশ্বিনীবাবুর সহিত কথোপকথন ব্যতীত ঠাকুরের বিষয় উল্লেখ মাত্র করিলেন না। এইবার কিছু ঠাকুরের কথা বলুন, আমরা শুনি।" অনেক অনুনয়ের পর মহারাজ সহাস্যে কহিলেন, "আমিত্বের 'আ' থাকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা। যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই দেখিতেছি, ঠাকুরকে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ঠাকুরকে কিছু বুঝিয়াছেন স্বামিজী ও নাগমহাশয়। আমরা ঠাকুরের সেবকমাত্র, তাঁহার আদেশ শুধু পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি। তিনি কৃপা করিয়া যেদিন আমাকে বুঝাইবেন সেদিন মাত্র বুঝিব। ঠাকুর-সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে বড় ভয় হয়। স্বামিজীই বলেন,—'অগোচরে পাছে বাড়াইতে যাইয়া ঠাকুরকে খাটো করিয়া ফেলি!' স্বামিজীরই এই ভাব, অন্য পরে কা কথা! ঠাকুরের খুব ধ্যান চিন্তা করিও, তিনিই তোমাদিগকে নিশ্চিত বুঝাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট প্রকাশ হইবেন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশ্বাস কর। আমরা ভাবময় ঠাকুরের কতটুকু বুঝিয়াছি!—কিছুই বুঝি নাই।"—বলিতে বলিতে সহসা মহারাজের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, দেহ নিস্পন্দ, চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত, ঊর্দ্ধগতি। দুই এক বিন্দু অশ্রু চোখের কোণে গড়াইয়া পড়িল, শ্বাস রুদ্ধ। একটা দিব্যশ্রী বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এইরূপ মিনিটের পর মিনিট চলিতে লাগিল। কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই, নিস্তব্ধ। গৃহের বায়ুমণ্ডল

যেন নিবিড়, চেতন হইয়া উঠিল। অবশেষে সুরেন্দ্রকুমারের বড় ভয় হইল। সে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিল —শ্বাস নাই। নাড়ী টিপিয়া দেখিল,—নাড়ীও নাই। কি করিবে, ঠিক পাইল না; তারপর ডাক্তার ডাকিতে যাইবে এমন সময় যোগেন্দ্র বলিল, "শুনিয়াছি, সামান্য উদ্দীপনা হইলে ঠাকুরের ঘন ঘন ভাবসমাধি হইত। হয়ত ঠাকুরের নাম উল্লেখে ইনি গভীর ভাবসমাধিমগ্ন হইয়াছেন।" এই অবস্থায় সাধারণ ভূমিতে মন নামাইয়া আনিতে হইলে কি প্রক্রিয়া করিতে হয় তাহা তখনও ইহারা জানিত না। কাজেই ভীষণ আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর ধীরে ধীরে একটু বাহ্য চৈতন্যের আভাস পাওয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে "রামকৃষ্ণ" উচ্চারণ করিতে করিতে সংজ্ঞালাভ করিলেন। সে রাত্রে তাঁহাকে ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। বেশী কোনো কথা কহিতে পারিলেন না। ভক্তেরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে-ঠাকুরের নামমাত্র গ্রহণে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, গভীর ভাবসমাধিতে মন প্রবেশ করে, সে-ঠাকুর কত বড়, কত মহান! অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেলে ভাবটা একটু ফিকা হইল, সুরেন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জীবনে কি কোনো বিশেষ বাসনা আছে?"

শরৎ মহারাজ বলিলেন, "কৈ, একমাত্র ঠাকুরের আদেশ পালন করা ছাড়া আর ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না।"

সুরেন্দ্রকুমার পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ঠাকুরের নিকট আপনি কোন দিন কোন বাসনা পূর্ণ করাইবার জন্য আব্দার করিয়াছিলেন কি ? শুনিয়াছি, স্বামিজী নির্ব্বিকল্প সমাধির জন্য ও বাবুরাম মহারাজ ভাব হইবার জন্য ঠাকুরকে অনেক মিনতি করিয়াছিলেন।"

তদুত্তরে মহারাজ কহিলেন, "একদিন ঠাকুর আমাদের সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কল্পতরু হইয়াছিলেন। আমাদের তখন ঠাকুরের শক্তির উপর এমনি অখণ্ড বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুর যে বর দান করিবেন তাহা অব্যর্থ হইবে। কেহ ভক্তি, কেহ জ্ঞান, কেহ মুক্তি প্রভৃতি চাহিলেন। ঠাকুর আমাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, 'কিরে চুপ করে কেন, তোর কি বাসনা, বল্‌না ?' আমি কহিলাম,—সর্ব্বভূতে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতে পারি। ঠাকুর মৃদু হাস্তে কহিলেন, সময়ে হবে।" সত্যই কি শরৎ মহারাজের মধ্যে ঠাকুরের এই আশীর্ব্বাদ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল না ? এই অনুভূতি কি এই সুদীর্ঘকাল তাঁহার আর্ত্ত-পীড়িত-জীবসেবার মূলে প্রেরণা সঞ্চার করে নাই ?

আর একদিন উপদেশ-প্রসঙ্গে মহারাজ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বলিতেন, 'সকাল সন্ধ্যায় নিত্য বস্‌বি, উহাতে তাড়াতাড়ি হয়।' বরিশালে এত কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যেও মহারাজের কিন্তু সকাল সন্ধ্যায় বসার নিয়মটি বাদ যায় নাই। তিনি মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় একলা গানও গাহিতেন।

একদিন মহারাজ, অশ্বিনী বাবু প্রমুখাৎ কালীবাড়ীর সিদ্ধ মহাপুরুষ সনা ঠাকুরের (সনাতন) নাম শুনিয়া

তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। তখন প্রাতঃকাল, রৌদ্র উঠিয়াছে। কয়েকজন ভক্তসহ মহারাজ কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময় সনা ঠাকুর কদাচিৎ মন্দির হইতে বাহির হইতেন। শরৎ মহারাজ মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা ঝড়ের মত সনা ঠাকুর বাহির হইয়া শরৎ মহারাজকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের চক্ষু পরস্পরের মুখে নিবদ্ধ। উভয়েই নির্ব্বাক। চোখে চোখে কি কথা হইয়া গেল, তাহা তাঁহারাই জানেন। দুইটি মহাপুরুষের প্রেমালিঙ্গন দর্শনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। কালীবাড়ী যেন গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। ভাব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সুরেন্দ্রকুমার শরৎ মহারাজের পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য শুনিয়া তিনি হঠাৎ কহিলেন, "পরমহংসদেব যে সাক্ষাৎ—।" তখন শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া মহাপুরুষের সহিত মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। সনা ঠাকুর শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্য বালকের ন্যায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। শরৎ মহারাজও দুই চারিটি কথায় ঠাকুরের জীবনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। ইহারপর শরৎ মহারাজ সনা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার যে অবস্থা এবং যে বয়স তাহাতে এত কঠোরতা করিতেছেন কেন?"

সনা ঠাকুর কহিলেন,—

"মা যেমনি রাখছেন্‌ তেমনি থাক্‌ছি। ওসব কথা সে বেটী জানে।"

বরিশালে আট দিন অবস্থানের মধ্যে কয়েকটি আগ্রহবান যুবকের নিকট শরৎ মহারাজ রামকৃষ্ণ-মিশনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া যান। তখনকার অনেক উপদেশ এখনও ভক্তদের মুখে শুনা যাইবে।

অষ্টম দিন প্রভাতে তিনি বরিশাল পরিত্যাগ করেন। বহু ছাত্র ও গণ্যমান্য ভদ্রলোক তাঁহাকে বিদায় দিতে ষ্টীমার ষ্টেশনে উপস্থিত হন। "পরমহংসদেবকী জয়" এই তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ষ্টীমার দৃষ্টি ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে সমবেত জনসংঘ বিষণ্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। এই আট দিন বরিশালে যে প্রাণের খেলা চলিয়াছিল, ভক্তগণ সেই সম্পদটুকুই ভক্তিনম্রচিত্তে স্মরণ করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।"

এই প্রবন্ধের উপকরণ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। বরিশালে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সেবার ভার সুরেন বাবুর উপরই ন্যস্ত ছিল।—

একাদশ বর্ষ

১লা জানুয়ারী (ইং ১৯১৮) সকালে শরৎ মহারাজ নীচের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। লেখা পড়ার সাজ-সরঞ্জাম সকল গুছাইয়া লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন এমন সময় আমরা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি হাত জোড় করিয়া প্রণাম গ্রহণ করিলেন।

সকালে চা হইয়াছে, শরৎ মহারাজ চা পান করিতেছেন, আমি দাঁড়াইয়া আছি। তিনি বলিলেন, 'এক কাপ চা রেখে যাও—দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।"

শরৎ মহারাজের চা পান হইয়াছে দেখিয়া জল লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম। নিত্য চা পানের পরে অল্প জলে হাত ধুইয়া মুখে জলের হাত বুলাইতেন, আজও তেমনই করিলেন। তারপর পেয়ালা ও পিরিচ উঠাইয়া আনিব এমন সময় তিনি বলিলেন, —"তুমি 'লা মিজারেবেল' পড়েছ ?" আমি সম্মতি জানাইলাম। তিনি বলিলেন,—'স্বামিজী এই লা মিজারেবেলের খুব সুখ্যাত করতেন। বইখানা আমার পড়া ছিল। আজ বায়োস্কোপে লা মিজারেবেল হবে, দেখতে যাব ভেবেছি।' আমিও বলিলাম,— বই খানাত খুবই ভাল, বায়োস্কোপে কেমন দেখাবে জানি না, বেশ ত দেখেই আসুন না।'

শরৎ মহারাজ হাসিয়া বলিলেন,—'তা হলে তুমি যেতে বলছ ?'

আমি বলিলাম,—আখ্যায়িকা (Plot) ভাল, যাবেন বই কি।

তখন আর কোন কথা হইল না। তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, পেয়ালা পিরিচ লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর বায়োস্কোপে যাইবার জন্য শরৎ মহারাজ প্রস্তুত হইয়াছেন, যাত্রার পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বায়োস্কোপে কে কে যাবে, চল।' আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—'যাবে?' আমি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'থিয়েটার ত দেখ না জানি, বায়োস্কোপে আবার কি হল?'

বলিলাম,—'হওয়া না হওয়ার কোন কথা এতে নেই, লোকের ভিড় মোটেই ভাল লাগে না।' 'তা বেশ কথা' বলিয়া শরৎ মহারাজ বায়োস্কোপ দেখিতে যাত্রা করিলেন।

৪ঠা জানুয়ারী উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পূজা সম্পন্ন হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীমান্ বশী আসিয়া শরৎ মহারাজকে 'বসুবিজ্ঞান মন্দিরে' লইয়া গেলেন। স্যার জগদীশ চন্দ্রের (Bose Institute) বিজ্ঞান-মন্দিরের আজ বাৎসরিক উৎসব।

৫ই জানুয়ারী শরৎ মহারাজ রামমোহন লাইব্রেরীতে স্যার জন উড্রফের বক্তৃতা শুনিতে গেলেন।

৭ই জানুয়ারী বিবেকানন্দ সোসাইটির মাসিক অধিবেশন। তিনি এই সভায় সভাপতির পদে উপস্থিত ছিলেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নানা রকম জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া শ্রোতাগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

একাদশ বর্ষ

১লা জানুয়ারী (ইং ১৯১৮) সকালে শরৎ মহারাজ নীচের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। লেখা পড়ার সাজ-সরঞ্জাম সকল গুছাইয়া লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন এমন সময় আমরা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি হাত জোড় করিয়া প্রণাম গ্রহণ করিলেন।

সকালে চা হইয়াছে, শরৎ মহারাজ চা পান করিতেছেন, আমি দাঁড়াইয়া আছি। তিনি বলিলেন, 'এক কাপ চা রেখে যাও—দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।"

শরৎ মহারাজের চা পান হইয়াছে দেখিয়া জল লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম। নিত্য চা পানের পরে অল্প জলে হাত ধুইয়া মুখে জলের হাত বুলাইতেন, আজও তেমনই করিলেন। তারপর পেয়ালা ও পিরিচ উঠাইয়া আনিব এমন সময় তিনি বলিলেন, —"তুমি 'লা মিজারেবেল' পড়েছ ?" আমি সম্মতি জানাইলাম। তিনি বলিলেন,—'স্বামিজী এই লা মিজারেবেলের খুব সুখ্যাত করতেন। বইখানা আমার পড়া ছিল। আজ বায়োস্কোপে লা মিজারেবেল হবে, দেখতে যাব ভেবেছি।' আমিও বলিলাম,—বই খানাত খুবই ভাল, বায়োস্কোপে কেমন দেখাবে জানি না, বেশ ত দেখেই আসুন না।'

শরৎ মহারাজ হাসিয়া বলিলেন,—'তা হলে তুমি যেতে বলছ ?'

আমি বলিলাম,—আখ্যায়িকা (Plot) ভাল, যাবেন বই কি। তখন আর কোন কথা হইল না। তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, পেয়ালা পিরিচ লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর বায়োস্কোপে যাইবার জন্য শরৎ মহারাজ প্রস্তুত হইয়াছেন, যাত্রার পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বায়োস্কোপে কে কে যাবে, চল।' আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—'যাবে?' আমি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'থিয়েটার ত দেখ না জানি, বায়োস্কোপে আবার কি হল?'

বলিলাম,—'হওয়া না হওয়ার কোন কথা এতে নেই, লোকের ভিড় মোটেই ভাল লাগে না।' 'তা বেশ কথা' বলিয়া শরৎ মহারাজ বায়োস্কোপ দেখিতে যাত্রা করিলেন।

৪ঠা জানুয়ারী উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পূজা সম্পন্ন হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীমান্ বশী আসিয়া শরৎ মহারাজকে 'বসুবিজ্ঞান মন্দিরে' লইয়া গেলেন। স্যার জগদীশ চন্দ্রের (Bose Institute) বিজ্ঞান-মন্দিরের আজ বাৎসরিক উৎসব।

৫ই জানুয়ারী শরৎ মহারাজ রামমোহন লাইব্রেরীতে স্যার জন উড্রফের বক্তৃতা শুনিতে গেলেন।

৭ই জানুয়ারী বিবেকানন্দ সোসাইটির মাসিক অধিবেশন। তিনি এই সভায় সভাপতির পদে উপস্থিত ছিলেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নানা রকম জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া শ্রোতাগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

দৈনিক নিজের লেখা-পড়ার কাজ রহিয়াছে তাহার সঙ্গে হরি মহারাজের অসুখের তদ্বির তালাফিও চলিয়াছে, ইহা ছাড়া বক্তৃতা শুনিতে ও প্রদান করিতে বাহিরে যাওয়া আসা—সীমাশূন্য কার্য্যকরী শক্তি তাঁহাতে ছিল বলিয়াই এক সঙ্গে তিনি এত কাজ করিতে সক্ষম ছিলেন। কোন দিন তাঁহাকে বলিতে শুনি নাই—'আর পারি না, কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে চুপ চাপ থাকব।'

কিন্তু একদিন দেখি শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট (উদ্বোধনে) হাত জোড় করিয়া শরৎ মহারাজ বলিতেছেন,—'মহারাজ! এইবার আমাকে অব্যাহতি দাও।' সে কথায় আমাদের মন কাঁপিয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে এমন করুণ স্বরে কথা বলিতে তাঁহাকে আর কখন শুনি নাই। মহারাজও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কি হয়েছে, শরৎ?" শরৎ মহারাজ বলিলেন,—"সেদিন উমানন্দকে গালমন্দ করেছিলাম—কেন সে আমাকে না বলে বৃন্দাবন ছেড়ে এলো? উমানন্দ কিন্তু বলেছিল, চিঠি দিয়েছি। আমি সে কথা মানতে পারি নি। আজ দেখলুম কেমন করে সেই চিঠি খানা পুরাণ চিঠির মধ্যে মিশে গেছে। সে সত্যি কথাই বলেছিল—আমিই অযথা তাকে গালমন্দ করেছি। উমানন্দকে একদিন আনিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।" মহারাজ বলিলেন, "অতটা না করলেও চল্‌বে।" কিন্তু সে কথা শরৎ মহারাজ রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী সময়ে স্বামী উমানন্দের নিকট তাঁহার ভুলের জন্য সত্যই তিনি ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। আমরা জানিতাম,—কর্ত্তৃপক্ষের কখনও ভুল স্বীকার করিতে নাই; এক্ষেত্রে কিন্তু দেখিলাম, স্বামী সারদানন্দ ভুল

স্বীকারও করিলেন এবং ক্ষমাও চাহিলেন। চিরদিন তিনি মানুষের সহিত মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। পদগৌরবে কদাচ অপরকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। কদাচ এমন কথা কাহাকেও বলেন নাই যাহাতে তাহার আশা ভঙ্গ কিংবা তাহার আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

সেদিন ইং ১৮ই জানুয়ারী, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের (কপিল মহারাজ) নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে তার পাইয়া শরৎ মহারাজ জানিতে পারিলেন,—শ্রীশ্রীমা জ্বরে ভুগিতেছেন। হাতের শত কাজ, হরি মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ অসুস্থ, শ্রীশ্রীমহারাজ উদ্বোধনে আছেন এই সকল বিষয়ের মীমাংসা যেন এক মুহূর্ত্তে স্থির করিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন এমন ভাবে বলিলেন, 'কাল জয়রামবাটী যাব।' পরদিন ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র-নাথ কাঞ্জিলাল, ডাক্তার সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান বিমল (স্বামী দয়ানন্দ) যোগীন মা, গোলাপ মা এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া রাত্রির গাড়ীতে শরৎ মহারাজ রওনা হইলেন এবং ২১শে জানুয়ারী বেলা ১০টার সময় জয়রামবাটী আসিয়া পৌঁছাইলেন।

শ্রীশ্রীমা বলিলেন,—'কাঞ্জিলালের অসুধ খাব।' সুতরাং ডাক্তার কাঞ্জিলালই হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। চারিদিন ঔষধ সেবন করিয়া মা ভাল হইলেন, ২৮শে জানুয়ারী অন্নপথ্য করিলেন।

শরৎ মহারাজ মাকে লইয়া উদ্বোধনে আসিবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু মা এ যাত্রায় আসিবার কোন ইচ্ছা দেখাইলেন

না। তবুও শরৎ মহারাজ আমাকে জয়রামবাটীতে রাখিয়া শ্রীমান্ বিমলকে সঙ্গে করিয়া কামারপুকুর, বদনগঞ্জ হইয়া কোয়ালপাড়া পথে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন। আমি ১৪।১৫ দিন জয়রামবাটী রহিলাম। মা স্থির করিলেন,—এখন উদ্বোধনে যাইবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজার দিন সকালে আমি উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলাম।

শরৎ মহারাজ তিথিপূজার উৎসব আনন্দে যোগদান করিতে মঠে চলিয়াছেন সঙ্গে সান্ন্যাল মহাশয়, ললিত চট্টোপাধ্যায় এবং আমরা কয়েকজন ছিলাম। শেষ ভঁাটায় নৌকা ছাড়িয়াছে। অল্প দূর আসিতেই বাণ ডাকিল, গঙ্গার মধ্যে চরের উপর জল বাধা পাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উন্মাদ নৃত্য আরম্ভ করিল। মাঝ গঙ্গায় নৌকা ছিল বলিয়া কোন ধাক্কা লাগিল না, বরং জলের টানে দেখিতে দেখিতে মঠের ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল। শরৎ মহারাজ নৌকা হইতে উঠিয়া ঠাকুর ঘরে গেলেন। তার-পর শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত দিন মঠে থাকিলেন; সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নৌকা যোগে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন।

পূজ্যপাদ হরি মহারাজ চিকিৎসার জন্য উদ্বোধনে রহিয়াছেন, মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম হইতে অসুস্থ হইয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ চিকিৎসার জন্য এখানে আছেন এমন সময় কোয়ালপাড়া মঠ হইতে (১০ই এপ্রেল ১৯১৮) 'তার' আসিল,—'শ্রীশ্রীমা জ্বরে ভুগিতেছেন, জ্বর বিরাম হয় না।'

মায়ের অসুখ সংবাদে শরৎ মহারাজকে চিরদিন চঞ্চল হইতে

দেখিয়াছি। সুতরাং এবারেও তখনই ঠিক করিলেন, রাত্রের গাড়ীতে ডাক্তার কাঞ্জিলালকে লইয়া স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোর) ও আমাকে কোয়ালপাড়া যাইতে হইবে।

যথাসময়ে ডাক্তার কোয়ালপাড়া মঠে আসিয়া মার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু জ্বরের বিরাম হইল না। এসময় জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিলেই জ্বরের ঘোরে মা বলিতেন,—'কৈ শরৎ এলেন না।' মাকে যদি জিজ্ঞাসা করিতাম,—'মা শরৎ মহারাজকে আসিতে লিখিব ?' মা কিন্তু বলিতেন,—'না না লিখ না, গরমে বাছার আসতে কষ্ট হবে।' তার পরেই কিন্তু আবার বলিতেন,—'কৈ শরৎ এলেন না ?'

এদিকে মা জ্বরের মধ্যে বলিতেছেন,—'কৈ শরৎ এলেন না ?' জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'না না লিখ না' ইত্যাদি, আমি সকল কথা শরৎ মহারাজকে নিবেদন করিলাম। ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও জ্বরের রকম দেখিয়া ভয় পাইয়া পত্র দিলেন। শরৎ মহারাজ ১৭ই এপ্রেল বেলা প্রায় দেড়টার সময় ঘোড়ার গাড়ীতে বিষ্ণুপর হইতে কোয়ালপাড়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে ডাক্তার সতীশবাবু ও যোগীন মা আসিয়াছেন। শরৎ মহারাজের এই অপ্রত্যাশিত শুভাগমনে সকলে বিলক্ষণ ভরসা পাইলেন।

শরৎ মহারাজ গাড়ী হইতে সোজা আসিয়া মায়ের বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া মায়ের শিয়রের দিকে তক্তপোষের উপর বসিলেন। এই সময় মায়ের জ্বর বাড়িতেছিল। তিনি দুই খানা হাতে কিছু

ধরিবার জন্য যেন হাতড়াইতেছিলেন। শরৎ মহারাজ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা এমন কচ্ছেন কেন?' ডাক্তার বলিলেন,—'জ্বর এলে মার হাতে জ্বালা আরম্ভ হয়, সে সময় কোন ঠাণ্ডা জিনিষের উপরে হাত রাখবার জন্য এমন করেন।' শরৎ মহারাজ তৎক্ষণাৎ জামার বোতাম খুলিতে লাগিলেন এবং মায়ের হাত দুইখানা দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া বাঁ হাতের সাহায্যে জামা গেঞ্জী অতিকষ্টে খুলিয়া ফেলিয়া মার হাত দুইখানি আনিয়া নিজের পেটের উপর রাখিলেন। মা 'আঃ' শব্দ করিয়া চোখ চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু ঘোমটা টানিলেন না দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন শরৎ মহারাজ যে আসিয়াছেন তাহা মা বুঝিতে পারেন নাই। ১৮ই এপ্রেল মার জ্বর ত্যাগ হইল, ২১শে এপ্রেল মা অন্ন পথ্য করিলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

মা অন্নপথ্য করিয়াছেন সকলেই বেশ আনন্দে আছেন এমন সময় একদিন পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। শরৎ মহারাজ একখানা চিঠি পড়িয়া রাসবিহারী মহারাজের দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'পড়ে দেখ।' রাসবিহারী মহারাজ পড়িয়া সকলকে জানাইলেন—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ শরৎ মহারাজের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রজ্ঞানন্দের দেহরক্ষায় শরৎ মহারাজ যে একজন ক্ষমতাবান সৎ সেবক হারাইলেন ইহা বলাই বাহুল্য। প্রজ্ঞানন্দ প্রসঙ্গে সেদিন শরৎ মহারাজ মাত্র এই বলিয়াছিলেন,—'প্রজ্ঞানন্দ ভদ্রলোক ছিল।' যিনি শত সহস্র বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে

পড়িয়াও মেজাজ না হারাইয়া কথা বলিতে পারেন এই অর্থে শরৎ মহারাজ 'ভদ্রলোক' শব্দ ব্যবহার করিতেন।

কয়েক দিন গত হইল। মা দিন দিন দেহে বল পাইতেছেন, শরৎ মহারাজেরও মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে, এই সময় একদিন স্বামী কেশবানন্দ আসিয়া আমাকে ধরিলেন,—'ঐ স্তিমিত চিত সিন্ধু ভেদি উঠিছে কি জ্যোতিঃঘন' গানটি শরৎ মহারাজকে দিয়া গাহিয়া শুনাইতে হইবে। অন্য গান হইলে কোন ভাবনা ছিল না কিন্তু এই গান শরৎ মহারাজই রচনা করিয়াছেন, তবুও বলিলাম,—আচ্ছা দেখা যাবে।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে ঠাকুরের আরত্রিক ও স্তোত্র পাঠ হইবার পরে একে একে সকলে আসিয়া শরৎ মহারাজের সম্মুখে বসিলেন। তখন শরৎ মহারাজের কাছে নিবেদন করিলাম,—"গিরীশ বাবুর সেই—'দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে' গানটি এঁরা আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছেন।" জানিতাম তানপুরা না হইলে তাঁহার গান গাওয়া সুবিধা হইত না, তবু যে বলিলাম সে কেবল তিনি বলিয়াই। মিনিট কয়েক গত হইল, গুণ গুণ করিয়া সুরটি একবার ঠিক করিয়া লইলেন, তারপর সুমধুর কণ্ঠে গাহিলেন,—

"দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটির ঘরে॥
ব্যাথিতে কি দিতে দেখা গোপনে এসেছ একা।
বদনে করুণামাখা হাস কাঁদ কার তরে॥
ভূতলে অতুল মণি কে এলিরে যাদু মণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে॥

মরি মরি রূপ হেরি নয়ন ফিরাতে নারি।
হৃদয় সন্তাপ হারী, সাধ ধরি হৃদি পরে॥”

গান শেষ হইল। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ বলিলেন,—আর কোন ফরমাস থাকে ত বল? আমি ধীরে ধীরে বলিলাম,—“ঐ ‘স্তিমিত চিত সিন্ধু ভেদি’ গানটিও এঁরা শুনতে চান।” ফরমাস শুনিয়া তিনি গম্ভীর হইলেন। তারপর গুণ গুণ করিয়া সুর ঠিক করিয়া বলিলেন,—‘সব গানটি কিন্তু আমার মনে নেই।’ উপস্থিত সাধুগণের মধ্যে একজন সমস্ত গানটি আবৃত্তি করিয়া গেলেন। মহারাজও আড়া বাগেশ্রীতে আরম্ভ করিলেন,—

“ঐ স্তিমিত চিত সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতিঃ ঘন
কোটী সূর্য্য গলাইয়ে ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন।
(মায়া) খণ্ডিত অখণ্ড বারি বুঝে লীলা কেবা হেন॥
উজ্জ্বল বালক বেশে অখণ্ড ঘরে প্রবেশে;
প্রেমঘন বাহু পাশে কাহারে করে ধারণ॥
উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান চল চলি
ধরণী ডুবিল বুঝি অবিদ্যা কাম-কাঞ্চন॥
সুধীর ধীর পরশে যোগী চায় সহরষে
কণ্টকিত তনু মন, নীরবে ভাসে নয়ন;
তারা জ্বলি ছায়াপথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে
পূণ্য ভূমে উদে আজি পুনঃ নরনারায়ণ॥”

‘পূণ্য ভূমে’ গাহিবার সময় শরৎ মহারাজের মুখ উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিল। দুইবার গাহিবার পরে গানটি শেষ হইল। সেদিন আর গান হইল না।

উপরোক্ত গানটির মধ্যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের এক 'বালক-যোগী' সংবাদ রহিয়াছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—সবিস্ময়ে শিষ্যগণ তাহা শুনিয়াছিলেন, যেখানে মায়ার তরঙ্গ শেষ হইয়াছে তাহার পরে যে অখণ্ড জ্যোতিঃঘন রাজ্য তাহাতে সাতজন যোগী ধ্যানে মগ্ন। ঠাকুর স্বয়ং বালক বেশে এক-জন যোগীর পিঠে পড়িয়া আবদারের সুরে বলিতেছেন—'উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান চল চলি, ধরণী ডুবিল বুঝি অবিদ্যা কাম-কাঞ্চনে।' তখন যোগী চোখ অর্দ্ধেক মেলিয়া চাহিলেন—সেই চাহনি হইতে যে জ্যোতিঃ জগতে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছিল—স্বামী বিবেকানন্দ সেই অর্দ্ধ উন্মিলিত আঁখি জ্যোতির মূর্ত্ত বিগ্রহ। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে এই কথা সকলে শুনিয়াছিলেন তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বামী সারদানন্দ বিভোর হইয়া গাহিয়াছিলেন,—

'পুণ্য ভূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ।'

কোয়ালপাড়া মঠে সন্ধ্যারতির পরে আরতির গান হইত; যে গান বেলুড় মঠে আরতির সঙ্গে হইয়া থাকে। কোয়াল-পাড়া আশ্রমে এমন বিকট বেতালা বেসুরে এই গানটি হইত যে মঠ ফেরৎ সকলেরই কানে খোঁচা মারিত। এবং মঠ ফেরৎ কেহই ইহাদের গানে যোগদান করিতে পারিত না। শরৎ মহারাজের সীমাহীন সহনশীলতা এই গানে টলিয়া উঠিল। সুতরাং আশ্রমের সকলের ডাক পড়িল—গান শিখিতে হইবে, এস।

শরৎ মহারাজ একবার, দুইবার, তিনবার 'খণ্ডন ভব বন্ধন'

গাহিলেন। তারপর তিনি এক লাইন গাহিতে লাগিলেন, আশ্রমের সাধুরা দোহার হইলেন। আমি আশ্রম-গৃহ ত্যাগ করিয়া দূরে বাধান বেল গাছ তলায় আসিয়া বসিয়া থাকিতাম। এমন বেতালা বেসুরা নানা রকম শব্দের মিশ্রণে বিকট চীৎকার শুনিবার মত স্নায়ু আমার ছিল না। শরৎ মহারাজ আমার গৃহত্যাগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাত্রির আহারের পর কৌতুক করিয়া আশ্রমের সাধুদের আমাকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—'কাল থেকে ভূমানন্দের নিকটে তোমরা গানটি শিখে নিও।' 'রক্ষা করুন' বলিয়া আমি শরৎ মহারাজের বিছানা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি আর কিছু বলিলেন না। পর দিন হইতে ৩।৪ দিন আশ্রমে তিষ্ঠান অসম্ভব হইয়া উঠিল—কখন শরৎ মহারাজ সকলকে সঙ্গে করিয়া গাহিতেছেন কখন সাধুরা একা বা দুইজন এক সঙ্গে গাহিতেছেন। শেষে অটল ধৈর্য্য জয়যুক্ত হইল—কোয়ালপাড়া আশ্রমের সাধুরা শরৎ মহারাজের ধৈর্য্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া 'খণ্ডন ভব বন্ধন' আরতির গানটি গাহিতে শিখিলেন। এই ভাবে ২৮শে এপ্রেল গত হইল।

২৯শে এপ্রেল শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে শরৎ মহারাজও আসিলেন। ডাঃ সতীশবাবু এই দিন কলিকাতায় ফিরিলেন।

৫ই মে শ্রীশ্রীমা কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ঐ রাত্রি কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন সকালে পাল্কীতে যাত্রা করিয়া (৬ই এপেল) বেলা এগারটার

মধ্যে বিষ্ণুপুরে ভক্ত সুরেশ সেনের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। ৭ই এপ্রেল বেলা সাড়ে দশটার গাড়ীতে মা কলিকাতা রওনা হইলেন। সঙ্গে শরৎ মহারাজ, যোগীনমা, সরলা প্রভৃতি আমরা অনেকেই আছি।

গাড়ী বিষ্ণুপুর ছাড়িল। আমরা একখানা তৃতীয় শ্রেণীর 'দরবার গাড়ীতে' উঠিয়াছি। শ্রীশ্রীমা রহিলেন এক ধারে, পাশে রহিলেন শরৎ মহারাজ, তার পাশে আমরা। গাড়ীতে উঠিয়া দেখি একটি সপ্রতিভ বালিকা বয়স ১০ বৎসর হইবে সে গাড়ীর সকল যাত্রীদের উপরে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া কাহার কোথায় বসা উচিত তাহা নির্দ্দেশ করিতেছিল। এবং যাত্রীগণও দেখিলাম সেই বালিকার আদেশ মানিয়াই উঠা বসা করিতেছে। শরৎ মহারাজও বালিকাটির চালচলন লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং আমাকে বলিলেন,—'মেয়েটিকে ডেকে জেনে নাও ত ও কাদের মেয়ে?' সেদিন গাড়ীতে উৎকল বাসী বহু স্ত্রী পুরুষ ছিলেন। সুতরাং আমার সহজ বুদ্ধি বালিকাকে উৎকল ভাষাতে প্রশ্ন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। বালিকাটি সেঁ প্রশ্নের উত্তরে বলিল—সে উৎকল কন্যা নহে। তখন আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমার জাত? বালিকা ঘাড় বাঁকাইয়া হিন্দিতে বলিল—'আমি হিন্দু।' শরৎ মহারাজ হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার নাম?' বালিকা হাসি মুখে বলিল—'ইন্দ্রানী।'

এই ইন্দ্রানী জাতির পরিচয় দিতে যে ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়াছিল তেমন ভঙ্গী কখন দেখি নাই, যে উত্তর দিয়াছিল—এমন

উত্তরও জীবনে কখন শুনি নাই। তারপর বালিকাটি মায়ের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন পাহারা দিতে লাগিল। বাউড়ীয়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিতে সে নামিয়া গেল। রাত্রি ৮টার সময় শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে শুভাগমন করিলেন।

মা, ঠাকুর ঘরে আছেন। পাশের ঘরে রাধু প্রভৃতি। শরৎ মহারাজের ঘরে হরি মহারাজ অসুস্থ—নীচের ঘরে শচীন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ) পরপারে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। কেদারবদরী দর্শনে যাইয়া সেই যে 'হিল ডাইরিয়া' আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ১৯শে জুলাই শেষ হইল। প্রজ্ঞানন্দ ও শচীন উভয়ে শরৎ মহারাজকে দেখিয়া এক সঙ্গে মঠে যোগদান করিয়াছিলেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে উভয়েই মহাপ্রস্থান করিলেন।

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের রোগ অনেকটা উপসম হইলে তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে মহাপুরুষ বাবুরাম মহারাজকে দেখিবার জন্য মঠ হইতে দেওঘরে গেলেন। বায়ু-পরিবর্ত্তনের ফলে বাবুরাম মহারাজ দিন দিন ভালর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এমন সময় ভারতব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা আরম্ভ হইল, যাহাতে ভারতে ৮০ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়াছিল। সেই রোগ বাবুরাম মহারাজের দেহে প্লুরো নিউমোনিয়ার আকারে প্রকাশ পাইল। মহাপুরুষ, বাবুরাম মহারাজকে লইয়া দ্রুত কলিকাতায় বলরাম বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ তখন বলরাম বাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন।

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের চিকিৎসার জন্য বিচক্ষণ চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইল। বুক পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক-গণ আশা ছাড়িলেও ঔষধাদি নিয়ম মত দিতে লাগিলেন। কলিকাতায় আসিয়া বাবুরাম মহারাজ মাত্র তিন দিন ছিলেন, চতুর্থ দিন ইং ১৯১৮ সাল ৩০শে জুলাই বেলা চারিটা পনর মিনিটের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ লীলা সহচর—শুদ্ধ সত্ত্ব বিগ্রহ, পবিত্রতার নিষ্কলঙ্ক মণি ঠাকুরের পাদপদ্মে মিলিত হইলেন। মহারাজ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

শরৎ মহারাজ সমস্ত দিন বলরাম বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। বাবুরাম মহারাজ মহাপ্রস্থান করিলে শ্রীশ্রীমহারাজ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ প্রথমে মহারাজকে স্থির করিতে যত্ন লইলেন। মহারাজ একটু স্থির হইলে এই অশুভ সংবাদ মঠে প্রেরণ করিলেন। এবং সেই সঙ্গে জানাইয়া দিলেন মঠের প্রাঙ্গণে বাবুরাম মহারাজের দেহ অগ্নিতে অর্পণ করা হইবে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বরানগর ঘাট হইতে বাবুরাম মহারাজের পূত দেহ নৌকা যোগে মঠে আনয়ন করিয়া স্নান, আরতি, পূজা অন্তে অগ্নিতে অর্পণ করা হইল।

বাবুরাম মহারাজের প্রসঙ্গে একদিন শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'ঠাকুর বলতেন—বাবুরাম নৈকুষ্য, ওঁর হাড় শুদ্ধ, দেহে পাপ কর্ম্ম, মনে কুচিন্তা পর্য্যন্ত হইতে পারে না। ঠাকুরের মহা ভাবের সময় বাবুরাম মহারাজ ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে ছুঁতে পারতেন না—স্বামিজী, মহারাজ এঁরা সকলে বীর ভাবের সাধক।

বাবুরাম মহারাজের মনে পুরুষোচিত কোন ভাব ছিল না—তাই হাড় শুদ্ধ। ঠাকুরের লীলা সহচর রূপে একমাত্র বাবুরাম মহারাজ সম্পূর্ণরূপে প্রতিদ্বন্দ্বী হীন—সেখানে স্বামিজী নাই, আমাদের ত কা কথা। তোমরা বাবুরাম মহারাজের কথা যত বেশী চিন্তা করবে—তত বেশী তোমাদের কল্যাণ হবে। কিন্তু এই কথা থেকে 'যেন আবার বুঝে বোসোনা আমি আর কাউকে মানতে বা কাউকে ভাবতে তোমাদের নিষেধ কচ্ছি।'

শরৎ মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে যেমন শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন অপর দিকে তেমনিই ভালবাসিতেন। আজ বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে মঠে সকলে খাইতে বসিয়াছেন—বাবুরাম মহারাজের পাশে শরৎ মহারাজ বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। তখন বাবুরাম মহারাজ মাছ খাইতেন না। পরিবেশনের সময় বাবুরাম মহারাজ মাছ নিলেন না। শরৎ মহারাজ ইহা দেখিলেন—এবং নজর রাখিলেন কখন বাবুরাম মহারাজ অন্যদিকে চাহিবেন। বাবুরাম মহারাজ খাইতে বসিয়া কাহার পাতে ভাত নাই কাহার একটু ডাল লাগিবে সর্ব্বদা এই দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। সুতরাং যেমন তিনি অন্যদিকে চাহিয়াছেন অমনি না দেখি না দেখি করিয়া শরৎ মহারাজ নিজের পাত হইতে মাছ বাবুরাম মহারাজের থালার উপরে রাখিয়া দিলেন এবং এমন গম্ভীর ভাবে খাইতে লাগিলেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। বাবুরাম মহারাজ পাতের দিকে চাহিতেই দেখিলেন,—মাছ রহিয়াছে। তারপর শরৎ

মহারাজের দিকে প্রসন্ন ভাবে চাহিয়া মাছ খাইতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শরৎ মহারাজ এমন ভাল মানুষটির মত থাকিলেন যেন তিনি কিছুই জানেন না, যেন যোগবলে মাছ আসিয়া বাবুরাম মহারাজের পাতে পড়িয়াছে। এই রকম ঘটনা শরৎ মহারাজ মঠে আসিলে প্রায়ই হইত। শরৎ মহারাজ জানিতেন, ঠাকুরের প্রসাদ কখন উচ্ছিষ্ট হয় না। নতুবা বাবুরাম মহারাজকে পাতের জিনিষ দিতে শরৎ মহারাজ কখন উৎসাহ দেখাইতে পারিতেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

ভারতব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জায় যে মানুষ মরিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সময় যাহারা বাঁচিয়া ছিল কাপড়ের অভাবে তাহাদের মধ্যে অনেককেই উলঙ্গ অবস্থায় গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। এ সংবাদ শরৎ মহারাজও শুনিলেন। একদিন বলিলেন,—'তাই ত কাপড়ের জন্য কিছু করলে হয় না?' যিনি আজীবন ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া কাজ করিয়াছেন, তিনি কাপড়ের জন্য আমরা কিছু করিতে পারি কিনা যে বলিয়াছেন —তাহা ঠাকুরকেই বলিয়াছিলেন। নানা ভাবে কিছু কিছু কাপড় আসিতে আরম্ভ করিল। প্রায় ছয় হাজার টাকার কাপড় বাঙ্গলা দেশের নানা জেলায় মিশনের শাখাকেন্দ্র ও মিশনের জানিত লোকের দ্বারা শরৎ মহারাজের ব্যবস্থায় বিতরিত হইল। ইহার পরেই সংবাদ আসিল উত্তরবঙ্গ বন্যার জলে ভাসিয়াছে। শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আসিয়া শরৎ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। স্থির হইল রাজসাহী জেলার নওগাঁ থানায় লোক পাঠান হইবে। ৮ই সেপ্টেম্বর

উদ্বোধন হইতে পাঁচজন লোক রওনা হইল। সেই সঙ্গে আমাকেও যাইবার জন্য শরৎ মহারাজ আদেশ করিয়াছিলেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম,—শ্রীযুক্ত মহেশ বাবু দার্জ্জিলিং যাইতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে 'ইক মিক্ কুকার' এই রকম কাজের সময় বিশেষ প্রয়োজন জানাইলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি টাকা দিতেছি আপনারা আনাইয়া লন।' তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইল যে, টাকা দিলে তাহা বন্যা তহবিলে জমা হইয়া যাইবে, তাহা হইতে ৮টি কুকার কিনিতে টাকা কিছুতেই শরৎ মহারাজ মঞ্জুর করিবেন না। আমরা কুকারের কথা অনেকবার বলিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি বলেন,—'সাধারণে বন্যার জন্য টাকা দিয়েছে, তা [illegible] ওয়া ভাল [illegible] আমি কুকার [illegible]

[illegible] চড়া খাইয়া থাকিতে [illegible] সেবকগণ [illegible]

[illegible] সেবকগণের [illegible] লিখিলাম। উত্তরে তিনি অন্যান্য কথার পরে লিখিলেন,—* * * "তা বেশ হইয়াছে। মহেশ বাবু তোমাদের ৮টি কুকার দিয়াছেন তাহা জানিতাম কিন্তু কুকার পাইয়া তোমাদের কাজে লাগিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম।"

দ্বাদশ বর্ষ

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি পূজা (ইং ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯১৯ খ্রীঃ) হইয়া গেল। ৭ই মার্চ্চ সকাল প্রায় নয়টার সময় বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বেলুড় মঠ দেখিতে আসিলেন। এবং মঠের দর্শনীয় সমস্তই দেখিতে চাহিলেন। শরৎ মহারাজ প্রথমে গভর্ণরকে ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় গভর্ণর পাদুকা সহ উঠিতেছিলেন কিন্তু ঠাকুর ঘরে জুতা পায়ে প্রবেশ চলিবে না জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অতিথির বিব্রত অবস্থা দেখিয়া অভিমান শূন্য হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। শরৎ মহারাজ নত হইয়া নিজ হস্তে গভর্ণরের পাদুকা খুলিয়া দিলেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া গভর্ণর ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর ঘর হইতে নামিয়া তিনি সমস্ত মঠ ভূমি দর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরের উৎসবের দিন ৯ই মার্চ্চ ধার্য্য ছিল। উৎসবের রান্না ঘরে তখন বোঁদে হইতেছিল। গভর্ণর দাঁড়াইয়া ভিয়ানের কাজ দেখিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া সকল বিষয় জানিয়া লইলেন। তারপর শরৎ মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব। সমস্ত দিন ব্যাপী আনন্দ কোলাহলের মধ্যে ভক্ত সেবা সম্পন্ন হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় হইতে খুব বাতাস বহিতে লাগিল। তখনও বেলুড়ে ষ্টীমার

ঘাট হয় নাই। কলিকাতায় ফিরিবার জন্য একখানা নৌকা ভাড়া করা হইল। শরৎ মহারাজ আসিয়া নৌকায় উঠিলেন, সঙ্গে আমি একা। বাতাসের বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নৌকা পশ্চিমকূল ধরিয়া শালিখা বাঁধা ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া পাড়ি ধরিল। প্রবল বায়ুবেগে নৌকা পূর্ব্বকূলে কাশীপুর আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'আর নৌকায় নয়, এখান থেকে হেটে চল, নতুবা রাত অনেক হয়ে যাবে।'

রেলের লাইন ধরিয়া অগ্রে শরৎ মহারাজ চলিয়াছেন, পশ্চাতে আমি। সম্মুখে দুইটি লোক দেখিয়া তিনি পথ ছাড়িয়া যেমন দক্ষিণে অগ্রসর হইবেন অমনি রেলে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন। পড়িবার সময় দেখা গেল সমস্ত শরীরকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন দক্ষিণ বাহুর উপরে সমস্ত দেহের ভার রাখিয়া কাৎ হইয়া পড়িলেন, এবং পড়িবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই পতন ও উত্থানের মধ্যে বেশ বুঝা গেল যৌবনে অম্বুবাবুর কুস্তীর আখ্ড়ায় তিনি যে কুস্তী করিয়াছিলেন তাহা বিফলে যায় নাই।

রাত্রি দশ ঘটিকার সময় শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রকম দুর্য্যোগে যখনই পড়িয়াছি তখনই কিন্তু মনে হইয়াছে 'একা নদী বিশ ক্রোশ' কথাটি অতি সত্য।

উৎসব গত হইবার সাত দিন পরে শ্রীযুক্ত শান্তিরাম ঘোষের সহিত গয়া যাইব স্থির হইল। যথা সময়ে শরৎ

মহারাজের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া রওনা হইলাম। শান্তিরামবাবু গয়ার কাজ করিতেন, আমি নানা স্থান দর্শন করিয়া বেড়াইতাম। শেষ একদিন আমি কাশীধামে আসিলাম। জীবনে কখনও হরদোয়ার* যাই নাই, তাই কাশী হইতে অযোধ্যা, গোপ্তার ঘাট, † ফৈজাবাদ, লক্ষ্ণৌ পথে হরদোয়ারে আসিয়া কন্‌খল্ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে অবস্থান করিলাম। ইচ্ছা ছিল অমৃতসর দর্শন করিয়া বাঙ্গলায় ফিরিব।

এই সময় পাঞ্জাবে মার্শাল-ল (সামরিক আইন) চলিয়াছে। জেনারেল ডায়ার নাকি তিনজন সাধুকে ধরিয়া চূণকাম করিয়া দিয়াছিল, এই রকম গুজব হরদোয়ারে প্রচার থাকায় আশ্রমের সকলে আমাকে অমৃতসর যাইতে নিষেধ করিলেন।

পনর দিন মাত্র হরদোয়ারে আসিয়াছি এমন সময় উদ্বোধন হইতে শরৎ মহারাজের পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা ছিল, 'রামের মা অসুস্থ হইয়া কাশীতে আছেন। আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত আছি, সুতরাং আমার পক্ষে কাশীতে যাইয়া রামের মার সেবা করা এক প্রকার অসম্ভব। আমার ইচ্ছা তুমি কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া রামের মার সেবা কর।'

রামের মা হইলেন পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী—স্বর্গীয় বলরাম বসু মহাশয়ের স্ত্রী। আমি পত্রখানা

---

* যে স্থান বাঙ্গালীর নিকট চিরদিন হরিদ্বার বলিয়া প্রসিদ্ধ, সে স্থানের প্রকৃত নাম হরদ্বার। পশ্চিমদেশে ব্‌—উচ্চারণ ওয়া। এইজন্য বলিবার সময় হরদ্বারকে পশ্চিমদেশবাসী হরদোয়ার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

† এইস্থানে শ্রীরামচন্দ্র সরযূতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজনীয় কল্যাণানন্দ স্বামিজীকে দেখাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কবে যাচ্ছ?' 'আজই যাব ঠিক করেছি।' তিনি বলিলেন—'তা বেশ।' সন্ধ্যার গাড়ীতে হরদোয়ার ছাড়িয়া কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

প্রায় তিন মাস কাশীধামে থাকিবার পর বোম্বে মেলে ৪ঠা জুলাই বৈকালে উদ্বোধনে উপস্থিত হইয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলাম। পূর্ব্বে কোন সংবাদ দিয়া আসিতে পারি নাই বলিয়া তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হঠাৎ এলে যে?' প্রশ্ন শুনিয়া ধীরে ধীরে সকল কথা বলিলাম। তারপর রাম বাবুর মায়ের আদেশেই যে আমাকে কুমিল্লায় যাইতে হইতেছে তাহা জানিয়া প্রসন্ন ভাবে তিনি বলিলেন—'কাল সকালের গাড়ীতেই বেরুচ্ছ তবে?' আমি সম্মতি জানাইয়া বসিয়া রহিলাম। শরৎ মহারাজ একে একে সকলের সংবাদ লইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহাকে যথাযথ নিবেদন করিতে লাগিলাম। হঠাৎ যেন লক্ষ্য হইল, এখনও আমার স্নানাহার হয় নাই তাই আমার কথা শেষ না হইতেই তিনি বলিলেন,—'যাও স্নান করে কিছু খেয়ে দেয়ে এসো তারপর সব কথা "শোনা যাবে'খন। আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

নীচের ঘরে আসিয়া সকলের কুশল সংবাদ জানিতে লাগিলাম। শ্রীমান্ চন্দ্রমোহন দত্তকেও জিজ্ঞাসা করিলাম,—কেমন আছ? সে ভাল আছে বলিয়া তাহার পিতার গঙ্গালাভ হইয়াছে বলিল এবং উপসংহারে শরৎ মহারাজের অযাচিত দয়ার কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমি বসিয়া বিশ্রাম

করিতেছিলাম এবং চন্দ্রমোহনের কথাও শুনিতেছিলাম। তাহা এই,—

বৈশাখ মাসের (ইং ১৯১৯ খ্রীঃ) ওরা, শরৎ মহারাজ উদ্বোধনের সহকারী চন্দ্রমোহন দত্তকে একখানা গাড়ী আনিতে বলিলেন। গাড়ী কোথায় যাইবে জানিয়া তবে গাড়ী ভাড়া করিতে যাইবে এইজন্য চন্দ্রমোহন, শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ কোথায় যাবেন? শরৎ মহারাজ শান্তভাবে বলিলেন, 'তোমার বাবাকে দেখ্‌তে যাব।'

চন্দ্রমোহনের পিতা কঠিন রোগে শয্যা লইয়াছেন। কলিকাতা নন্দরাম সেনের গলির ধারে, অতি অপ্রশস্ত এক গলিতে আছেন। 'তোমার বাবাকে দেখতে যাব' শুনিয়া চন্দ্রমোহন মনে মনে প্রমাদ গণিল। প্রথম গাড়ী ভাড়ার পয়সা দিবার মত সংস্থান তাহার তখন ছিল না, দ্বিতীয়,—যে গলি দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইবে তাহা এত অপ্রশস্ত যে শরৎ মহারাজ সোজা হইয়া চলিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

চন্দ্রমোহন অকপটে তাহার উভয় শঙ্কটের কথা শরৎ মহারাজকে নিবেদন করিল। শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'গাড়ী ত নিয়ে এস, তারপর দেখা যাবে।' চন্দ্রমোহন গাড়ী লইয়া আসিল। শরৎ মহারাজ চন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলেন।

যথা সময়ে গাড়ী আসিয়া সেই সরুগলির ধারে দাঁড়াইল। শরৎ মহারাজ চন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া গলির মুখে আসিয়া দেখিলেন সোজা হইয়া চলা একেবারেই অসম্ভব। তখন তিনি পাশা পাশি ভাবে চলিতে লাগিলেন।

চন্দ্রমোহন ডাকাডাকি করিয়া বাড়ীর দরজা খোলাইল। শরৎ মহারাজ ধীরে ধীরে আসিয়া চন্দ্রমোহনের পিতার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং চন্দ্রমোহনকে বলিলেন, 'আমার পায়ের ধূলা নিয়ে তোমার বাবার মাথায় দাও।'

শরৎ মহারাজ যে প্রণাম নিতে নারাজ ছিলেন একথা চন্দ্রমোহন উদ্বোধনে থাকিয়া সম্যক জ্ঞাত ছিল। আজ এই রকম অযাচিত কৃপা দেখিয়া প্রথমে চন্দ্রমোহন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তারপর ভয়ে ভয়ে শরৎ মহারাজের পায়ের ধুলি লইয়া পিতার মস্তকে দিল। চন্দ্রমোহনের পিতা হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন শরৎ মহারাজ চন্দ্রমোহনের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার কাশীতে যাবার ইচ্ছা আছে —কাশীতে যাবেন?' চন্দ্রমোহনের পিতা মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন। শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর আট দিন গত হইল। ১২ই বৈশাখ মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে উদ্বোধনের পুস্তকের পার্শ্বেল রেলে পাঠাইতে চন্দ্রমোহন শিয়ালদহ রওনা হইবে এমন সময় শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'কোথা যাচ্ছ চন্দ্র?' চন্দ্রমোহন পার্শ্বেল সহ শিয়ালদহ যাইবার কথা নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'আগে বাড়ী গিয়ে তোমার বাবা কেমন আছেন দেখে এস, তারপর ষ্টেশনে যেও।'

শরৎ মহারাজ আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। হঠাৎ পাশ ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রমোহন দরজার ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শরৎ মহারাজকে দেখিয়া চন্দ্রমোহন

বলিল, 'বাবার শেষ সময় উপস্থিত।' শরৎ মহারাজ ড্রয়ার খুলিয়া পনরটি টাকা চন্দ্রমোহনের হাতে দিয়া বলিলেন, —'তোমার বাবার ক্ষত রয়েছে—প্রায়শ্চিত্ত করাও গে—বাকী যা থাকবে তা দিয়ে ঘাটের কাজ ক'র।'

চন্দ্র আসিয়া মহারাজের আদেশ মত সকল কাজ করিল। চন্দ্রমোহনের কথা শেষ হইল। আমি স্নানের জন্য উঠিলাম।

শরৎ মহারাজের রোজনামচায় দেখিলাম লেখা আছে,— Chandra's father died at 5-30. P. M. অর্থাৎ চন্দ্রের বাবা অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার পরে শরৎ মহারাজের নিকট বসিয়া আছি। তিনি কাশীর সকল সংবাদ জানিয়া লইতেছিলেন।

কুমিল্লায় আসিয়াছি। শরৎ মহারাজের পত্রে প্রথম জানিলাম ১১ই জুলাই রামবাবুর মা কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রায় তিন মাস এখানে আছি, একদিন শরৎ মহারাজের তার (Telegram) আসিল,—'বিটঘর যাও, পত্র সেইখানে পাইবে।'

বিটঘরে আসিয়াছি। আমার আসিবার পরদিন শরৎ মহারাজের পত্র আসিয়া পৌঁছিল। পত্রে নানা কথার পর লেখা ছিল,—ওখানকার কাজ (দুর্ভিক্ষ সেবা কার্য্য) কেমন চলিতেছে তাহা জানাইবে তৎসঙ্গে হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং কতগুলি অভিযোগ শ্রীমান্———র নামে আমরা পাইয়াছি তাহাও তদন্ত করিয়া দেখিবে, সত্য কি না।'

দুর্ভিক্ষ সেবা কার্য্যে নিযুক্ত সেবকটি নূতন কাজে ব্রতী

হইয়াছে। দেখিলাম হিসাব পরিষ্কার আছে, টাকা পয়সার মিল আছে, এদিকে কোন গোলমাল নাই। তারপর অভি-যোগের তদন্ত করিয়া দেখিলাম, সত্য গোপন করিয়া অভিযোগ-কারী যে সকল কথা লিখিয়াছে তাহা মূল্য হীন। তবুও আমি শ্রীমান্———কে বলিলাম, তুমি সকল কথা যথাযথ ভাবে শরৎ মহারাজকে লিখবে—যা হয় তিনিই করবেন।' শরৎ মহারাজকে নিবেদন করিলাম,—হিসাব পত্রে কোন গোল নাই সেবকটি নূতন কাজে ব্রতী বলিয়া কাজে সামান্য ভুল চুক হইয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহা সে আপনাকে অকপটে খুলিয়া লিখিবে।

যথা সময়ে শরৎ মহারাজ বিটঘর হইতে শ্রীমান্—এর পত্র পাইলেন। যখন সেই সেবক কার্য্যান্তে মঠে ফিরিয়া আসিল, শরৎ মহারাজ তাহার কর্ম্মপদ্ধতিতে কোথায় সে গল্‌তি করিয়াছিল দেখাইয়া দিলেন এবং তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা হইলেও ঐ রকম অভিযোগের হেতু কেন উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া ধমকাইয়া দিলেন।

শরৎ মহারাজের সদয় ব্যবহারে সেবকটি কর্ম্মের আদর্শ বুঝিয়াছিল এবং উত্তর কালে শরৎ মহারাজের সঙ্গে অনেকদিন থাকিয়া বিশ্বাসী সংজ্ঞা লাভ করিতেও সক্ষম হইয়াছিল।

আমি যেদিন বিটঘর (ত্রিপুরা) হইয়া কুমিল্লা ফিরিয়া আসিলাম সেই দিন সন্ধ্যা হইতে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল। এই ঝড় '১৯১৯ খ্রীঃ সাইক্লোন' নামে অভিহিত। সম্মুখে দুর্গোৎসব, হঠাৎ এই ভীষণ ঝড় দেশের উপর দিয়া

চলিয়া গেল। কত মণ্ডপ পড়িয়া গেল, কত প্রতিমা চূর্ণ হইয়া গেল, কত গৃহ উড়িয়া গেল, কতলোক গৃহহীন হইল, কত প্রাচীন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইল, কত নৌকা ডুবিল কতলোক ডুবিয়া মরিল—এই সকল, ঘটনার বিষয় যখন সংবাদ পত্রে বাহির হইতে লাগিল, তখন শরৎ মহারাজ উদ্বোধন হইতে স্বামী অরূপানন্দকে (রাসবিহারী) প্রথমে খুলনা জেলায় তদন্তের জন্য পাঠাইলেন। এদিকে নানাস্থান হইতে সাহায্য পাইবার জন্য মঠে আবেদন আসিতে লাগিল। আবেদনের মর্ম্ম অবগত হইয়া শরৎ মহারাজ বিক্রমপুর পরগণায় (ঢাকা) কাজ হইবে স্থির করিয়া রাসবিহারীকে নায়ক (In charge) করিয়া পাঠাইলেন এবং আমাকে ও উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিবার জন্য চিঠি দিলেন। লক্ষ্মী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় আমি উদ্বোধনে আসিয়া পৌঁছিলাম। শরৎ মহারাজ আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—'কাল তোমায় ঢাকা যেতে হবে।' আমি সম্মতি জানাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তখন তিনি কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

পরদিন সকালে ঢাকা যাইয়া কি করিতে হইবে তিনি তাহা বলিয়া দিলেন। রাত্রি দশটার গাড়ীতে ঢাকা রওনা হইলাম। বন্যায় সেবা করিবার জন্য শ্রীমান্ ভগবান রাম ঘোষ (শ্রীযুত শান্তি রাম ঘোষের পুত্র) সঙ্গে চলিয়াছে।

শরৎ মহারাজের আদেশ মত যে কাজ করিবার ছিল তাহা শেষ হইলে স্বামী অরূপানন্দ আমাকে ফরিদপুর জেলায় যাইয়া পরিদর্শন ও প্রয়োজন হইলে কর্ম্মকেন্দ্র খুলিয়া কাজ আরম্ভ

করিতে বলিয়াছিলেন। বন্যা সেবা কার্য্যে স্বামী অরূপানন্দ In charge ছিলেন,—সুতরাং তাঁহার আদেশে কল্‌মা ত্যাগ করিয়া ফরিদপুর জেলায় কোঁয়রপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ইতিমধ্যে কার্ত্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে শরৎ মহারাজের চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—'কাজের ব্যবস্থা করে চলে আসবে, ২রা অগ্রহায়ণ কাশী যাব, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে।' আমি ১লা অগ্রহায়ণ রওনা হইয়া ২রা অগ্রহায়ণ উদ্বোধনে আসিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন,—'আজ যাব না, ৮ই যাব, দেখে শুনে সব জিনিষ পত্র গোছ গাছ কর্ত্তে থাক।'

৮ই অগ্রহায়ণ বোম্বে মেলে শরৎ মহারাজ—সান্যাল মহাশয়, যোগীন মা ও আমাকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলেন এবং পরদিন অতি প্রত্যূষে আসিয়া কাশীধামে পৌঁছিলেন। শরৎ মহারাজের রোজ নামচায় কিন্তু লেখা আছে ৯ই রওনা হইলেন ১০ই কাশীধামে পৌঁছিলেন। আমার মনে হয় ভ্রম বশতঃ তিনি তারিখে গোল করিয়াছেন। ৮ই আমরা ঠিক রওনা হইয়াছিলাম।

শরৎ মহারাজ অদ্বৈতাশ্রমে আছেন। হরি মহারাজ আছেন সেবাশ্রমে। প্রথমে শরৎ মহারাজ হরি মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়া স্থির করিলেন—সেবাশ্রমের কাজ ভবিষ্যতে কি ভাবে হওয়া উচিত। সেবাশ্রমের সকলকে জানাইলেন,—সেবাশ্রম সম্পর্কে কেহ ইচ্ছা করিলে মৌখিক বলিতে পারে, ইচ্ছা করিলে লিখিত প্ল্যানও (Plan) দিতে পারে। ইহা ছাড়া যদি

কেহ গোপনে কিছু বলিতে ইচ্ছা করে সে সুবিধাও তাহাকে দেওয়া যাইবে।

যথাসময়ে এই কথা শ্রীযুত চারুবাবুর (স্বামী শুভানন্দ) মারফতে সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমের সাধুগণকে জানান হইল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত একথা প্রচার না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রমে তিন রকম মনোভাব আশ্রয় করিয়া তিনদল হইতে নানা রকম প্রশ্ন হইয়াছিল।

একদল জানিতে চাহিলেন—শরৎ মহারাজ কিসের জন্য আসিয়াছেন, কত দিন এখানে থাকিবেন?

অপর দল জানিতে চাহিলেন—শরৎ মহারাজ চারু বাবুকে সরাইয়া কালীবাবুকে (স্বামী কালিকানন্দ) তাঁর স্থানে বাহাল করিয়া যাইবেন কি?

তৃতীয় দল বলিলেন, আপনি একথা শুনিয়াছেন কি যে শরৎ মহারাজ চারু বাবুকে শাসন করিতে এখানে আসিয়াছেন?

প্রথম দলের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলাম কেন এবং কতদিন শরৎ মহারাজ এখানে থাকিবেন সে কথা তিনি আমায় বলেন নি।

দ্বিতীয় দলের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলাম,—এমন কোন কথা তিনি আমায় বলেন নাই।

তৃতীয় দলের প্রশ্নের উত্তরে একটু শ্লেষ করিয়া বলিতে হইয়াছিল,—যে কথা কেউ এ পর্য্যন্ত শোনে নি সে কথা কোন্ যোগবলে তোমরা জানলে তা আমায় বলতে পার?

কর্ম্ম যখন না থাকে বা কম থাকে তখন 'মস্তক' নানা কল্পনা

জুটাইয়া লইয়া সজীব থাকিতে ইচ্ছা করে। আমি কিন্তু কাশীতে আসিবার পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই বা জানিবার জন্য কোন ইচ্ছাও করি নাই, শরৎ মহারাজ এমন সময়ে কেন কাশীধামে যাইতেছেন।

তারপর বুড়ো বাবা (স্বামী সচ্চিদানন্দ) ও কেদার বাবা (স্বামী অচলানন্দ) শরৎ মহারাজের নিকট যাহা বলিতেন তাহা শুনিয়া বুঝিলাম দুই বিরুদ্ধ পক্ষ সেবাশ্রমে কাজের ব্যবস্থা লইয়া কোমর বাঁধিয়াছে। অদ্বৈতাশ্রম তৃতীয় পক্ষে থাকিয়া সাধারণ ভাবে সেবাশ্রমের কার্য্যে খুঁৎ ধরিতেছে।

অদ্বৈতাশ্রমে আর সেবাশ্রমে যে মন কষাকষি তাহা অতি পুরাতন ব্যাপার। যখন মহাপুরুষ কাশী অদ্বৈতাশ্রমে থাকিতেন তখন তাঁহার নাম করিয়া অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রচার হইত,—জপ, ধ্যান, ঠাকুর পূজাই হইল সাধুর কর্ম্ম, ময়লা পরিষ্কার করা অর্থাৎ সেবাশ্রমে রোগীর কাজ হইল মেথরের কর্ম্ম। যে কথা মহাপুরুষ অতীতে সূত্রাকারে বলিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী কালে ভাষ্যে পরিণত হইয়া উভয় আশ্রমের মধ্যে স্থায়ী মনো-মালিন্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

শরৎ মহারাজ সকল কথা—রকমারি অভিযোগ শুনিয়া এমন এক পন্থা অবলম্বন করিলেন যাহাতে উত্তেজনা একেবারে কমিয়া গেল। উভয় আশ্রম সবিস্ময়ে শুনিল শরৎ মহারাজ বলিতেছেন,—'আমি কারুর বিচার কত্তে এখানে আসি নাই। সেবাশ্রমের কাজ কর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষায় অনেক বেশী বেড়ে গেছে—যাতে সেবাশ্রমের কাজ শৃঙ্খলার সহিত সেবার ভাব বজায়

রেখে চলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে, এতে সকলের পরামর্শ শুনতে আমি প্রস্তুত আছি।'

এই উক্তি শ্রবণ করিয়া কে কি ভাবিয়াছিলেন তাহা জানিবার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। আমি শিখিলাম—দোষের বিচার করা অপেক্ষা সেই দোষ যাহাতে কর্ম্মের মধ্য দিয়া সেবকগণকে আশ্রয় করিতে না পারে তাহার প্রতিকার করাই প্রকৃত ব্যবস্থা।

যথা সময়ে সেবাশ্রমের কর্ম্মপদ্ধতি শরৎ মহারাজ রচনা করিলেন। ইহাতে সেবাশ্রমের সেবক সহায়ে ও অদ্বৈতাশ্রমের ২।১ জন লইয়া এক কার্য্যকরী সভা (Working committee) বহাল থাকিবে। সভ্যগণের অধিকাংশের মতে সেবাশ্রমের সকল কাজ চলিতে থাকিবে।

আর এক প্রস্তাব হইল—মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে একজন Resident Doctor রাখিতে হইবে।

মাহিয়ানা দিয়া ডাক্তার রাখিবার কথা শুনিয়া হরি মহারাজ প্রচার করিলেন,—"শরতের এই ভাব স্বামিজীর ভাবের বিরোধী।" এই কথা 'কানে হাঁটিয়া' সেবকগণকে জানাইল,—শরৎ মহারাজ বেতন দিয়া যে ডাক্তার রাখিতে চাহিয়াছেন তাহা স্বামিজীর ভাবের বিরোধী ব্যবস্থা। শরৎ মহারাজও হরি মহারাজের এই মন্তব্য শুনিতে পাইলেন।

বৈকালে শরৎ মহারাজ হরি মহারাজকে যাইয়া বলিলেন,—'হরি ভাই আমি যখন স্বামিজীর ভাব বিরুদ্ধ কাজ করতে যাচ্ছি তখন তোমার উচিত কিন্তু আমাকে ঠিক পথে চালিত

করা।' হরি মহারাজ একথা শুনিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—'না ভাই, তুমি যা করবে তাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।'

হরি মহারাজ ত চুপ করিলেন কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষ যাঁহারা নূতন ব্যবস্থা চান না তাঁহারা পরিষ্কার ভাষাতে শরৎ মহারাজকে জানাইলেন,—"মহারাজ যদি বলেন তবে আমরা একথা মেনে নিতে সম্মত আছি।" এই রকম কথা শুনিলে মঠের অন্য কোন ক্ষমতাবান্ প্রাচীন সাধু কি করিতেন তাহা বলা বড়ই কঠিন কিন্তু শরৎ মহারাজ খুব আনন্দের সহিত একথা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শরৎ মহারাজ এই কথা শুনিয়া উত্তরে বলিয়াছিলেন,—'ঠিক কথা বলেছ। আমরা যখন সকলেই মহারাজকে মানি তখন তিনি যা বলবেন—সে কথাই বলবৎ থাকবে।' সুতরাং শরৎ মহারাজ ও চারু বাবু (স্বামী শুভানন্দ) শ্রীশ্রীমহারাজকে এ বিষয় পত্রদ্বারা জানাইলেন।

ইতিমধ্যে কাশী সেবাশ্রমের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য যিনি শরৎ মহারাজকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি Working committeeর পরিবর্ত্তে one man's rule অর্থাৎ এক জনের ব্যবস্থা মত কার্য্য চলাই সঙ্গত বলিয়া শরৎ মহারাজকে জানাইলেন। ধীর স্থির ভাবে শরৎ মহারাজ সে কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শিষ্য স্থানীয় সাধুদের দ্বারা পদে পদে বাধা পাইয়াও শরৎ মহারাজের অভিমান হইল না। তিনি স্থির ভাবে শ্রীশ্রীমহারাজের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ লিখিয়া পাঠাইলেন,—'শরৎ যাহা করিতেছে তাহা আমার ব্যবস্থা বলিয়া জানিবে।' এই আদেশ হাতে পাইয়াও পূর্ব্বে শরৎ মহারাজ যেমন চিরক্ষমাশীল কল্যাণদাতা রূপে বিরাজিত ছিলেন এখনও তেমনই আছেন। তাহারই জন্য Working committee স্থাপিত হইয়া কেহই বাদ পড়িলেন না। চারুবাবু, কালীবাবু সকলের হাতে তিনি নব ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া তুলিবার ভার অর্পণ করিলেন। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে (Female ward) মেয়ে রোগীদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক হইয়া মেয়ে সেবিকার দ্বারা চালিত হইতে লাগিল। নূতন ব্যবস্থায় পুরুষের সংস্রব মেয়ে ওয়ার্ডের সহিত দূর হইয়া গেল।

মেয়ে ওয়ার্ডের স্থান নির্ব্বাচন লইয়া সেবাশ্রমের একদল কর্ম্মীর সহিত হরি মহারাজের ঘরে শরৎ মহারাজের এই প্রকার কথা হইয়াছিল। 'তুমি যা বলছ তাতে কি সুবিধা হবে?' কর্ম্মী বলিলেন,—স্থান ও অনেকটা বাঁচবে সৌন্দর্য্য ও রক্ষা পাবে। শরৎ মহারাজ বলিলেন,—আমি কিন্তু সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শুচি, পবিত্রতা যাতে বেশী বজায় থাকে তা চাই। সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে গিয়ে যেন Sanctity, Purity বাদ না পড়ে।' কর্ম্মী—'তা পড়বে না মহারাজ।' শরৎ মহারাজ—'তা হলে আমার আর কিছু বলবার থাকবে না।'

একদিন শরৎ মহারাজ ও হরি মহারাজ উভয় গুরু ভ্রাতা কথা বলিতেছেন, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি অপর এক জনের

নামে দোষ উদ্‌ঘোষণে তৎপর হইলে, একজন সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "প্রমাণ ?"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমার কিন্তু একথা বিশ্বাস হয়।"

যিনি 'প্রমাণ' বলিয়াছিলেন তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল যাইতে না যাইতেই চির মধুর স্বরে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "হরি মহারাজ, আমি কিন্তু একথা বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।"

তখন হরি মহারাজ বলিলেন, "আমাদের কেমন স্বভাব লোকের দোষের কথা শুন্‌লেই বিশ্বাস করে থাকি, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখছি তুমি তা কর না।"

আত্মপ্রশংসা শুনিলে স্বামী সারদানন্দ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতেন। বেগতিক দেখিয়া তিনি বলিলেন, স্বামিজী আমাকে বলেছিলেন,—"এক কাণে কথা শুনবে, অপর কাণ দিয়ে তা বের করে দেবে—বিশেষ ভাবে না জেনে শুনে কাউকে দোষী ঠাউরাবে না।"

তখন সে প্রসঙ্গ থামিয়া অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। আত্ম-প্রশংসা শুনিবার দায় হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

সেই দিন কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের নূতন ব্যবস্থাদি হইবার কথা চলিয়াছে। স্বামী সারদানন্দ সকলকে তাঁহার নিকট নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। হরি মহারাজের ঘরে চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ) তাঁহার

মতামত জ্ঞাপন করিতেছিলেন। চারুবাবুর কথা বলিবার সময় একটি মুদ্রাদোষ ছিল। তিনি কথায় কথায় "কি বলেন মশাই" বলিতেন। কখন কখন "কি বলেন দুর্লভবাবু" ও বলিয়া ফেলিতেন। স্বামী সারদানন্দ সকলের কথা চিরদিন শুনিয়া যাইতেন। সে কথার মধ্যে কোন প্রশ্ন ভিন্ন কখন "হাঁ" "না" বলিতেন না, যাহাতে কেহ মনে করিতে পারে তিনি Commit (স্বীকার) করিতেছেন। সুতরাং যখন চারুবাবু অভ্যাস বশতঃ "কি বলেন মশাই" বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন স্বামী সারদানন্দ বেশ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শেষে "কি বলেন মশাই" আর বরদস্ত করিতে না পারিয়া, তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "যা বলবার তুমিই ত বলছো—মশাই আবার কি বলবেন ?"

স্বামী সারদানন্দ জানিতেন না, চারুবাবুর এইরূপ মুদ্রাদোষ ছিল। কিন্তু চারুবাবু তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া কেমন Nervous (চঞ্চল) হইয়া পড়িলেন এবং একান্ত নিরূপায় হইয়া ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

হরি মহারাজ, বালকের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন। শরৎ মহারাজ সেই হাসির কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন জনৈক সন্ন্যাসী শরৎ মহারাজকে চারুবাবুর মুদ্রা দোষের কথা বলিলেন। তিনি "কে জানে বাপু"—বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এই ঘটনার পরে একদিন চারুবাবুর সহিত শরৎ মহারাজের কথা হইয়াছিল। সেদিনও চারুবাবু অভ্যাসবশতঃ "কি বলেন

মশাই" বলিতে ছাড়িলেন না। তিনি পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া চারুবাবুকে সস্নেহে এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে চারুবাবুর মনে কোন ক্ষোভই রহিল না। শরৎ মহারাজ কিন্তু গত দিনের কথা একটি বারের জন্য ও উল্লেখ করিলেন না।

ত্রয়োদশ বর্ষ

১লা জানুয়ারী (ইং ১৯২০ খ্রীঃ) শরৎ মহারাজ সকাল বেলা ঘরের মধ্যে বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যান, জপ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আসন ছাড়িয়া তক্তপোষের উপরে আসিয়া বসিলেন। আমি চা আনিয়া দিলাম। তিনি ধীরে ধীরে চা পান করিলেন এবং একটু জলে হাত ধুইয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন। চায়ের বাসন ধৌত করিয়া যথাস্থানে রাখিলাম এবং ধীরে ধীরে আসিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আমি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'এসো বুড়ো বাবা'। পিছনে ফিরিয়া দেখি বুড়ো বাবা শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। আমি এক পাশে যাইয়া দাঁড়াইলাম বুড়ো বাবা আসিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন।

পূজনীয় বুড়ো বাবার সান্ন্যাস নাম স্বামী সচ্চিদানন্দ। তিনি বয়সে বৃদ্ধ হইলেও শরৎ মহারাজ বুড়ো বাবাকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ বুড়ো বাবাকে খুব ভালবাসিতেন এবং বুড়ো বাবা শরৎ মহারাজকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা দিয়া পূজা করিতেন। বুড়ো বাবা প্রণাম করিয়া উঠিতেই শরৎ মহারাজ হাত দিয়া তাঁহাকে পাশে বসিবার

স্থান দেখাইয়া দিলেন। বুড়োবাবা ধীরে ধীরে তক্তপোষের উপরে উঠিয়া বসিলেন। তারপর পূজনীয় কেদার বাবা (স্বামী অচলানন্দ) স্বামী মহিমানন্দ, চারুবাবু, কালীবাবু, পূজনীয় চন্দ্র মহারাজ (স্বামী নির্ভরানন্দ) লোক সাহায্যে অতি কষ্টে চলিয়া আসিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। হাঁটুর বাতে চন্দ্র মহারাজ প্রায় অচল—লোকের বা লাঠির সাহায্য ভিন্ন তিনি যেমন চলিতে অক্ষম তেমন মেঝের উপর বসিতেও অশক্ত। তাই শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'একখানা চেয়ার এনে চন্দ্রকে বস্‌তে দাও'।

শরৎ মহারাজ ও বুড়োবাবা তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। চন্দ্র মহারাজ চেয়ারে বসিয়া এবং অবশিষ্ট সকলে মেঝের উপরে আসনে বসিয়াছেন, এমন সময় শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'জীবনে কত কি ঘটেছে, তাই নিয়ে দিনরাত নাচতে হবে বুঝি? আমার মনে হয় এসব ছোট খাটো ব্যাপার যারা উপেক্ষা করতে শিখেছে তারাই ভাব বজায় রেখে কাজ করতে পারবে'।

কেদার বাবা, চারুবাবু, কালীবাবু প্রভৃতি সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—'আমি চাই তোমাদের মধ্যে বিশ্বাস ভালবাসা বৃদ্ধি পা'ক, তোমরা একমন একপ্রাণ হয়ে ঠাকুরের কাজে লেগে থাক, কে কি বল্লে তা তোমরা শুন্‌তে যেওনা'।

তারপর কি ভাবিয়া হঠাৎ শরৎ মহারাজ তক্তপোষ হইতে নামিয়া আসিলেন এবং জোড়হস্তে শিষ্যস্থানীয়দের মিনতি করিয়া

বলিলেন,—'গত কথা সব ভুলে যাও ঠাকুর স্বামিজীর কাজ করতে এসে নিজেদের মধ্যে সামান্য সামান্য কারণে মনো-মালিন্যের সৃষ্টি কর না, আমি হাত জোড় করে বলছি,—তোমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে, ভালবাসতে থাক, সব গোলযোগ আপনা হতে চলে যাবে।'

শরৎ মহারাজ 'চাপা মানুষ' হইলেও তাঁহার মুখের ভাব অত্যন্ত করুণ হইয়াছিল, কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার গলার স্বর কাঁপিতেছিল। তিনি আর বলিতে পারিলেন না, হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শরৎ মহারাজের ভাবে তখন সকলে বিভোর হইলেন। কেদার বাবা, চারুবাবু, কালীবাবু একে একে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন তারপর শরৎ মহারাজ সকলের সহিত চন্দ্র মহারাজের মিলন করাইয়া দিলেন। কেদার বাবা চোখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এমন ভাবে নববর্ষের প্রথম দিনে মিলনোৎসব সম্পন্ন হইল। কথাটা উভয় আশ্রমে বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল। তারপর কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ভবিষ্যত কার্য্য প্রণালী যাহা ইতিপূর্ব্বে খসড়া কাগজে লিখিত হইয়াছিল তাহা পুস্তকে বিধিবদ্ধ হইয়া কাশীধামে মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ যে কয়জন ছিলেন তাঁহাদের স্বাক্ষর যুক্ত হইল। *

নববর্ষের প্রথমদিনে শরৎ মহারাজের আগ্রহে উভয় আশ্রমের মধ্যে যে মিলনের দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহা শক্তিমান পুরুষের

---

* (১) স্বামী সারদানন্দ, (২) স্বামী তুরিয়ানন্দ, (৩) স্বামী সচ্চিদানন্দ, (৪) স্বামী অচলানন্দ, (৫) স্বামী মহিমানন্দ।

শক্তির খেলা ছাড়া আর কিছুই নহে। শরৎ মহারাজ কাশী সেবাশ্রমের নূতন ব্যবস্থা করিতে আসিয়া বিচারকের মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হন নাই। তিনি 'প্রেমময় দয়া সিন্ধু কৃপানিধি'রূপে কার্য্যারম্ভ করিয়া 'চিরক্ষমাশীল কল্যাণ দাতা' রূপে কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্বামিজীর জন্মতিথি পূজা আগত প্রায়। উভয় আশ্রম একযোগে শরৎ মহারাজকে তিথি পূজা ও উৎসব দেখিয়া যাইবার জন্য বিশেষ ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শরৎ মহারাজও সম্মত হইলেন।

আনন্দ কোলাহলের মধ্যে স্বামিজীর উৎসব আরম্ভ হইল। অদ্বৈতাশ্রমে পূজা পাঠ, গান উৎসব আরম্ভ হইল এবং প্রসাদ ধারণ করিয়া উৎসব শেষ হইল।

সেবাশ্রম দরিদ্র নারায়নগণকে পুরি ভোজন করাইয়া উৎসব শেষ করিলেন।

২০শে জানুয়ারী পাঞ্জাব মেলে শরৎ মহারাজ কলিকাতা ফিরিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় গয়া হইয়া দিনকয়েক পরে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাশীতে অবস্থান কালে মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নানারকম গোলযোগের সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজ স্থির করিয়াছিলেন, গোল মিটাইবার জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আমাকে মেদিনীপুরে পাঠাইবেন সুতরাং কলিকাতা আসিবার পরেই স্থির করিলেন শ্রীমান্ দ্বিজেন (স্বামী গঙ্গেশানন্দ) ও আমি মেদিনীপুর যাইব।

শরৎ মহারাজের আদেশে আমরা ৩রা ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর যাত্রা করিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজকে কাশীর সকল কথা জানাইবার জন্য তিনি ও সান্ন্যাল মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী ভুবনেশ্বরে রওনা হইলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত দশদিন ভুবনেশ্বরে বাস করিয়া ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন। এবং জয়রামবাটীর পত্রে জানিলেন শ্রীশ্রীমা জ্বরে ভুগিতেছেন। সন্ধ্যার পর শরৎ মহারাজ শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন মাকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করাইতে হইবে এবং মাকে আনিবার জন্য শ্রীমান্ প্রিয়নাথ (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) শ্রীমান্ বশীশ্বর সেন ও আমাকে জয়রামবাটী যাইতে হইবে।

২০শে ফেব্রুয়ারী দিনের গাড়ীতে আমরা তিনজনে রওনা হইলাম। পরদিন জয়রামবাটী পৌঁছিয়া দেখিলাম শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

যথা সময়ে মাকে শরৎ মহারাজের প্রার্থনা নিবেদন করিলাম। মা কলিকাতা যাইবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন।

একদিন একা একা আমোদরে স্নান করিতে আসিয়াছি। এই আমোদরে শরৎ মহারাজের সঙ্গে স্নান করিতে আসিতাম, এই ভাবের কত কথা মনে উঠিতেছিল। সেই আমলকী গাছটি দেখিলাম যাহার নীচে বসিয়া শরৎ মহারাজ ধ্যান করিতেন। সেই বটগাছটি রহিয়াছে, ক্ষুদ্র মাঠ অতিক্রম করিয়া

আমোদরের ধারে যে দিকে গ্রামের শ্মশান সেইখানে এই বটগাছটি, যাহার নীচে শরৎ মহারাজ নিত্য বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। কখন কখন গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেন। কিন্তু একদিন নয় দুইদিন নয়, যে কয়দিন শরৎ মহারাজ এই বটগাছের নীচে বসিয়া গান গাহিয়াছেন সেইদিন এই একই গান শুনিয়াছি,—

"জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই,
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
যাই যাই কোথা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায় আমি খেলিবা কেন,
জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর হবে না কি ভোর—
অধীর, অধীর, যেমতি সমীর—
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।"

এতদিনের কথা! কিন্তু এখনও যেন শুনিতে পাইতেছি—তিনি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন—'অবিরাম গতি নিরত ধাই।'

শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে শুভাগমন করিয়াছেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল মায়ের চিকিৎসা করিতেছেন। একদিন অপরিচিত একজন ভদ্রলোক আসিয়া নানা কথার পরে শরৎমহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি এখানে কি করেন?' শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'কি আর করব এই মায়ের বাড়ীর দ্বারী হয়ে আছি।' নিরভিমানী স্বামী সারদানন্দের এই আত্মপরিচয়ে আমাদের খুব

আনন্দ বোধ হইল। ভদ্রলোকটি কিন্তু শরৎ মহারাজের নিকট হইতে উঠিয়া আফিস ঘরে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঐ ঘরে যিনি বসিয়া আছেন তাঁহার নাম কি এবং তিনি কি করেন? একজন সাধু এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—ইনিই স্বামী সারদানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী। ভদ্রলোকটি অবাক হইয়া বলিলেন,—ইনিই স্বামী সারদানন্দ যিনি 'ভারতে শক্তিপূজা' লিখিয়াছেন, 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখিতেছেন? উত্তরে সাধু বলিলেন,—হ্যাঁ। ভদ্রলোকটি বলিলেন,—তিনি যে আমায় বলিলেন,—বাড়ীর দরোয়ান! তখন সেই সাধু হাঁসিয়া বলিলেন, তিনি আত্মপরিচয়ে যে মার বাড়ীর দরোয়ান বলিয়াছেন ইহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। তিনিই দ্বারী তিনিই মায়ের একনিষ্ঠ সেবক। ভদ্রলোকটি প্রীত হইয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন শরৎ মহারাজ বসিবার ঘরে বসিয়া এক খানা চিঠি পড়িতেছিলেন। চিঠি পড়া শেষ হইতে বলিলেন,—'২৪শে এপ্রেল লাটু মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন। তোমরা সকলকে বলে দিও, কেউ যেন মাকে এ সংবাদ না শুনায়।'

শ্রীশ্রীমায়ের জ্বর বিরাম না হওয়াতে শরৎ মহারাজ ডাক্তার পি, ডি, বসুকে মায়ের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ইহার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে ডাক্তার জে, এম, দাশগুপ্ত মায়ের রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কালাজ্বরের কোন ও সন্ধান পাইলেন না।

ডাক্তার বসু ৩।৪ বার মাকে দেখিতে আসিয়াছেন, কিন্তু কখনও তিনি কাহাকে চিকিৎসা করিতেছেন জানিতে চাহেন

নাই। মা উদ্বোধনে ঠাকুর ঘরেই আছেন। একদিন ডাঃ বসু বেদীর উপর সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিয়া শরৎ মহারাজকে প্রশ্ন করিলেন,—আমি কাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত আছি? শরৎ মহারাজ বলিলেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য ও ভক্ত-মণ্ডলীর মার চিকিৎসার ভার আপনার উপর অর্পিত। ডাঃ বসু ঠাকুর ঘরে বসিয়া আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু নীচে নামিয়া আসিয়া অনুযোগের ভাষায় শরৎ মহারাজকে বলিলেন,—'একথা দয়া করিয়া আপনার পূর্ব্বেই জানান উচিত ছিল।' সেই দিন হইতে ডাঃ পি, ডি, বসু মহাশয় দর্শনী টাকা (Visit) নেওয়া বন্ধ করিলেন এবং স্বভাব-সিদ্ধ যত্নের সহিত মায়ের চিকিৎসায় ব্রতী হইলেন।

৬ই মে সকাল বেলা পূজনীয় ধীরানন্দ স্বামিজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) শরৎ মহারাজের নিকট বলিয়া গেলেন,—'কাল বিকেল থেকে রামের (বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু) পেটে ব্যথা আরম্ভ হয়েছে। 'সমস্ত রাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেছে একটুও ঘুমোতে পারে নাই।' রামকৃষ্ণ বসু শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য। রামবাবুর পিতা বলরামবাবু ঠাকুরের ভক্ত।

ডাক্তার বৈদ্য যথাসাধ্য দেখান হইল। ঔষধ, পথ্য, সেবা কোনটারই ত্রুটি রহিল না। রোগ বাড়িতে লাগিল অবশেষে ১৪ই মে অপরাহ্ণ ৩-৪৫ মিঃ সময় রামবাবু নাম গানের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে মিলিত হইলেন। শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া মঠের অনেক সাধু সন্ত সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ বসুরা মঠের তিন পুরুষের অন্নদাতা।

"তিন পুরুষের অন্নদাতা" কথাটা প্রথমে শরৎ মহারাজকে বলিতে শুনিয়াছিলাম। যখন কলিকাতা ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট হইতে নূতন রাস্তার একরকমের নক্সায় বলরামবাবুর বাড়ী অপর রকমের নক্সায় গিরীশ বাবুর বাড়ী পড়িবেই দেখা গেল, তখন ভক্তবীর গিরীশচন্দ্রের বাড়ী ও বলরাম বাবুর বাড়ীর মধ্যে মঠ কোন বাড়ী রক্ষার জন্য আবেদনে স্বাক্ষর করিবেন এ বিচার উপস্থিত হইলে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন,—'রামেরা মঠের তিন পুরুষের অন্নদাতা।' বিরুদ্ধ পক্ষ এই এক কথাতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ও রামবাবুদের বাড়ী যাহাতে রক্ষা পায় তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের অসুখ বাড়িয়া যাইতেছে এই সময় রামকৃষ্ণ বসুর দেহরক্ষার সংবাদ মাকে জানান হইবে না স্থির হইল। কিন্তু গোলাপ মার পেটে কোন কথা থাকিত না, তিনি লাটু মহারাজের ও রামবাবুর দেহরক্ষার সংবাদ মাকে জানাইলেন। সংবাদ শুনিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ রোজনামচায় লিখিয়াছেন,—H. M's fever rose to 100° she had a bad night with indigestion & wind etc, all due to hearing the sad news about Ram. অর্থৎ শ্রীশ্রীমার জ্বর ১০০° ডিগ্রী উঠিয়াছে, রাত্রিতে ঘুম হয় নাই, হজম হয় নাই, পেটে বায়ু হইয়াছিল এই জ্বর বৃদ্ধি প্রভৃতি সকলই রামের দেহরক্ষার সংবাদের ফল।

শ্রীশ্রীমায়ের জ্বর যখন কিছুতেই দূর হইতেছে না তখন

শরৎ মহারাজ ১লা জুন হইতে কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করাইলেন। মায়ের শিষ্য ললিত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রত্যহ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে মোটর যোগে আনিয়া উপস্থিত করিতেন। কবিরাজী চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

একদিন মা মুড়ি ও ছোলাভাজা একটি বাটিতে লইয়া খাইবেন বলিয়া বসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজ আসিয়া মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মা ইতিমধ্যে মুড়ির বাটি পিছনে রাখিয়া দিলেন। শরৎ মহারাজ আসিয়া করজোড়ে মাকে বলিলেন,—'মা আপনার নিকট ঐ বাটিটি ভিক্ষা চাই।' মা অম্লান বদনে সেই বাটি শরৎ মহারাজের হাতে তুলিয়া দিলেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে ঐ প্রকার জিনিষ মাকে খাইতে না দিলেও মায়ের মুখের গ্রাস ভিক্ষা করিয়া আনিয়া শরৎ মহারাজ যে কতদূর মনোকষ্টে ছিলেন তাহা একদিন প্রকাশ পাইয়াছিল। সে কথা যথাসময়ে বলিব।

কবিরাজী চিকিৎসার সঙ্গে যত রকম ব্যবস্থা ছিল তন্মধ্যে জল সিদ্ধ করিয়া এক সের জল যখন আধসের হইবে সেই জল ঠাণ্ডা করিয়া মাকে পান করাইতে হইবে এই ব্যবস্থাও ছিল। এই প্রসঙ্গে আমি একদিন শরৎ মহারাজকে বলিয়াছিলাম,—'পাড়াগাঁয়ে এই রকম জল সিদ্ধ করলে মাটির ভাগ বেশী পাওয়া যাবে, কল্‌কাতার জলে ফিটকিরির ভাগ বেশী পাওয়া যাবে (তখন আষাঢ় মাস) কবিরাজ কি তাই চান?' শরৎ মহারাজ শান্ত ভাবে বলিলেন,—"এখন কি আমাদের বিচার করবার সময়? কবিরাজ মশায় যেমনটি

বলেন ঠিক তেমনটি করা আমাদের কর্ত্তব্য।" আমি লজ্জিত হইয়া আপন কাজে চলিয়া গেলাম।

এই সময় একদিন উদ্বোধনের জনৈক ব্যক্তির ক্ষুধা পাওয়ায় সে খাইতে বসিল এবং পাচককে ভাত দিতে বলিল। মায়ের অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, মাকে দেখিবার নিমিত্ত সাধু, শিষ্যমণ্ডলী নানা কেন্দ্র হইতে উদ্বোধনে সমাগত, যিনি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তিনি যে খাইতে বসিয়াছিল তাহাকে 'এখন খাইতে বসিও না' এমন কথা না বলিয়া, পাচককে আদেশ করিলেন—'এখন কাউকে ভাত দেবে না।' যে খাইতে বসিয়াছিল সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আমার নিকট এই রকম ব্যবস্থা মর্য্যাদা হানিকর বলিয়া মনে হইল। প্রতিবাদ করিবার জন্য স্থির করিলাম—আমি আহার করিব না। যথা সময়ে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

শরৎ মহারাজ সকল কথা শুনিয়াছিলেন। আহারে বসিয়া খোঁজ করিলেন ভূমানন্দ কোথায়? আমি সে কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'খাবে এসো।' উত্তরে বলিলাম, 'আমার খেতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু নাবালকের উপরে সাবালকদের এমন যথেচ্ছাচার কেন হবে বিশেষ আপনি এখানে থাক্‌তে!'

এরকম ঘটনার মধ্যে দেখিয়াছি, শরৎ মহারাজ কখনও যাহার আদেশ বা ব্যবস্থায় গোল বাধিত, তাহাকে কিছু না বলিয়া বলিতেন তাহাকে, যে আদেশ বা ব্যবস্থায় মনঃকষ্ট

পাইয়াছে। সুতরাং আমি বিলক্ষণ জানিতাম আজ আমাকে অনেক কথা সহ্য করিতে হইবে।

শরৎ মহারাজ ব্যবস্থা দাতাকে যদি ডাকিয়া বলিতেন,—'এরকম বলাটা তোমার ভাল হয় নাই', তখনই সকল গোল মিটিয়া যাইত। তিনি তাহা না বলিয়া আমাকে বলিলেন,—'তোমরা এমন কথায় কথায় ঝগড়া ঝাটি করলে আমি মঠে গিয়ে থাক্‌ব।' হঠাৎ এমন কথা শরৎ মহারাজকে বলিতে শুনিয়া আমারও খুব রাগ হইল, আমিও বলিয়া ফেলিলাম,—মঠ ত ভাল স্থানই, আপনি গিয়া থাক্‌বেন সেত ভাল কথা।'

শরৎ মহারাজ হতাশভাবে বলিলেন,—'এত দেখেও যারা না শিখবে তাদের আর কি যে বল্‌ব!' এমন কথা আমরা কখনও তাঁহার মুখে শুনি নাই। সুতরাং তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলাম—'এখনই খেতে বস্‌ছি, আপনি আরম্ভ করুন।' শরৎ মহারাজের সেদিন খাওয়া ভাল হইল না। আমাকে যাহা বলিয়াছেন তাহার জন্য যাহাতে আমার মনে দুঃখ না থাকে এই জন্য নিজের পাত হইতে মাছ ও আম তুলিয়া আমাকে দিতে আরম্ভ করিলেন। নিরুপায় দেখিয়া আমিও দৃঢ়তার সহিত বলিলাম,—"আপনি যদি ভাল করে খেয়ে না উঠেন তবে যা দিয়েছেন তা সব পাতেই থাকবে"। এই কথা শুনিয়া তিনি দুইটি আম চাহিয়া খাইলেন।

'দেখে শেখা' শুদ্ধ-বুদ্ধি লোকেই সম্ভবে। আমাদের ন্যায়

সাধারণ লোক চিরদিন ঠেকিয়াই শিখিবে। শরৎ মহারাজের উপর যত রকমই উৎপাত হইত সকলই তিনি হজম করিয়া চলিতেন। কখন প্রতিকার-পরায়ন হইয়া কাহাকেও শাসন করেন নাই বা কখন কাহাকে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। "মঠ ত ভাল স্থানই" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা অন্য যে কোন প্রাচীন সাধুকে বলিলে সে দিন কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইত। প্রশ্ন হইতে পারে, শরৎ মহারাজকে বলিলাম তবে কোন্ সাহসে? সাহস বা ভরসার কোন কথাই ইহার মধ্যে ছিল না। তিনি অধিকার দিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকেই সকল কথা বলিতে পারিতাম। তাহা ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক।

শ্রীশ্রীমায়ের অসুখ বৃদ্ধির সঙ্গে মাকে দর্শন করিবার ব্যবস্থারও (ভক্তদের ভক্তির দৌরাত্ম্যে) অদল বদল করিতে হইত। একদিন এক ভক্ত মাকে দর্শন করিতে যাইয়া মায়ের একখানি পা টানিয়া বুকের উপর স্থাপন করিলেন। পায়ে হাত দিতেই মা—'ওকি গো' বলিয়া উঠিলেন। পাশে যিনি সেবক ছিলেন তিনি যাইয়া ভক্তটির হাত ধরিয়া নীচে লইয়া গেলেন। সংবাদ শুনিয়া শরৎ মহারাজ ব্যবস্থা করিলেন,—তাঁহাকে জানাইয়া যেন ভক্তদের দর্শনের জন্য ঠাকুর ঘরে পাঠান হয়।

এই সময় ব্যবস্থা হইল বাহির হইতে দর্শন করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। একদিন একটি স্ত্রীলোক আসিলেন। ইতি পূর্ব্বে কেহ তাহাকে মায়ের কাছে আসিতে দেখেন নাই।

স্ত্রীলোকটি মাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে শরৎ মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শরৎ মহারাজ জনৈক সাধুর নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'একে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে দেখিয়ে দাও।' সেই সাধু তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং একজন সদ্য আগত ব্রহ্মচারীর উপর দর্শন করাইবার ভার দিলেন। শরৎ মহারাজ খাঁটিতে বসিয়া তাহা দেখিয়া পুনরায় বলিলেন,—'ওহে—তুমিই যাও।'

সেই সাধু শরৎ মহারাজের কথা শুনিতে পাইয়াও চুপি চুপি ব্রহ্মচারীকেই দর্শন করাইয়া দিতে বলিলেন।

সহসা ঠাকুর ঘর হইতে যোগীন মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'শরৎ তুমি কাকে উপরে পাঠালে?' যিনি এই কথা শুনিলেন তিনিই ঠাকুর ঘরের দিকে ছুটিলেন। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল সেই স্ত্রীলোকটি মায়ের শ্রীপাদ বুকে ধারণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। তখন একজন সাধু যাইয়া স্ত্রীলোকটির হাত হইতে মায়ের শ্রীপাদ ছাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া নীচে লইয়া আসিলেন। এই ঘটনায় গোলাপ মা বলিয়াছিলেন,—'পাথরের ঠাকুর পূজা করা সহজ, সে ঠাকুর কোনদিন কিছু বলেন না কিন্তু মানুষ ঠাকুর পূজা করা বড়ই কঠিন, এ দেবতা যে কথা বলেন।'

স্ত্রীলোকটিকে বুঝাইয়া বিদায় করা হইল। আমাদের মনে হয়—এই প্রকার ভাবপ্রবণ কোন ভক্তই এমন কাজ দোষাবহ মনে করেন না। যদি করিতেন তাহা হইলে এমন দৃশ্য আমাদিগকে কখন দেখিতে হইত না।

স্ত্রীলোকটি বিদায় হইবার পরে, শরৎ মহারাজ পূর্ব্বোক্ত সাধুকে বলিলেন,—'বাপু, তোমরা যদি কথামত কাজ কর্‌তে না পারবে তবে মঠে গিয়ে থাক।' যাহাকে শরৎ মহারাজ একথা বলিলেন তিনিও শরৎ মহারাজকে অন্য কাহারও অপেক্ষা কম মান্য, কম শ্রদ্ধা করেন না। অথবা পরিশ্রমের কাজে তিনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। সুতরাং এই কথা শুনিয়া সেই সাধু শরৎ মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মার জন্য এখানে থাকা, মা যদি ভাল না হন সেই দণ্ডে এখান থেকে চলে যাব জানবেন।' এই রকম কথা প্রাচীনগণের পক্ষে হজম করা বড় সহজ নহে। কথাটা শুনিয়া আমাদেরও রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শরৎ মহারাজ শান্তভাবে বলিলেন, 'আমরা সকলেই মার সেবার জন্য এখানে আছি যাতে মার কোন অসুবিধা না হয় তারই জন্য বলা-বলি নতুবা তোমরা যে দেখে শুনে সব করতে পার তাকি আর আমি জানি না।'

শরৎ মহারাজ বিলক্ষণ জানিতেন যাহারা তাঁহার কথায় উঠে বসে সেই সাধু তাহাদেরই একজন। শরৎ মহারাজের দেহরক্ষার পরে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া সেই সাধু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে উদ্বোধনে বসিয়া একদিন বলিয়াছিলেন,—'আমার ঐ কথা তিনি ভিন্ন অপর কেহ সহ্য করিতেন কিনা বলা বড়ই কঠিন।'

গোলাপ মার সঙ্গে শরৎ মহারাজের কথার অমিল হইলেই গোলাপ মা বলিতেন,—'শরতের কোন বুদ্ধি নেই।' আর

কত কি বলিতেন যাহা শুনিয়া আমরা হাসিতাম। কিন্তু যোগেন মা যখন গম্ভীরভাবে বলিতেন,—'তোমার শরৎ মহারাজ, স্বামিজী, মহারাজ এরা ত আমার গন্থুর (কন্যার) বয়সী। আমি এদের নিজের পেটের ছেলের মত দেখি কিন্তু কালের ন্যায় ভয়ও করি। কি জানি বাবা কখন যদি ভক্তাপরাধ হয়। সকল অপরাধের পার আছে, বাবা ভক্তাপরাধীর ত পার নাই' এই কথা শুনিয়া হাসি আসিত না বরং বিলক্ষণ ভয়ই হইত।

শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন বাহির হইতে সকলেই পাইবেন এই ব্যবস্থা হইল।

মহাপ্রস্থানের ৫।৬ দিন পূর্ব্বে, রাত্রি ১০ টার সময় যখন শ্রীমতীসরলা মাকে খাওয়াতে আসিলেন তখন মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আমি তোমাদের হাতে খাব না, আমার বাবার হাতে খাব।' 'বাবার হাতে খাব' এই কথার অর্থ কেহই ভাল বুঝিতে না পারায় কথাটা সরলা যাইয়া শরৎ মহারাজকে বলিলেন। শরৎ মহারাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া ডাকিলেন,—মা!

মা চোক মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, শরৎ মহারাজ বিছানার পাশে (বিছানা তখন মেঝেয় পাতা ছিল) আসিয়া বসিয়া আছেন। মা কাঁদিয়া বলিলেন 'বাবা ওরা আমায় খেতে দেয় না আমি তোমার হাতে খাব।' শরৎ মহারাজ মায়ের মুখে ধীরে ধীরে দুধ দিতে লাগিলেন মাও শান্ত হইয়া তাহা পান করিতে লাগিলেন। দুধপান শেষ হইলে মা তৃপ্তি

সূচক 'আঃ' শব্দ করিলেন। শরৎ মহারাজ ধীরে ধীরে মায়ের হাতে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

আজ মনে হইতেছে ঐ যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে শরৎ মহারাজ মায়ের মুখের গ্রাস মুড়ি ও ছোলা ভাজা ভিক্ষা করিয়া লইয়া মনে মনে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, মা তাঁহার মনের সেই ক্ষত এই ভাবে দূর করিয়া গেলেন। নতুবা বাবার হাতে খাব এমন কথা ত কেহ তাঁহাকে কখন বলিতে শোনেন নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের কবিরাজি চিকিৎসাও বিফল হইল। অবস্থা দিন দিন সঙ্কটজনক হইতেছে দেখিয়া বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না যে মা ঠাকুরের সহিত অচিরে মিলিত হইবেন। সুতরাং এই আশঙ্কার সংবাদ ভক্তগণের নিকট প্রেরিত হইল। দলে দলে সাধু গৃহী ভক্তগণ মাকে দেখিতে দেশ বিদেশ হইতে আসিতে লাগিলেন।

মায়ের মহাপ্রস্থানের তিন দিন পূর্ব্বে কবিরাজি চিকিৎসা বন্ধ করা হইল। এবং ডাক্তার কাঞ্জিলালের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চলিতে লাগিল।

১৯শে জুলাই শরৎ মহারাজের প্রথম দাঁত পড়িল। সেই দাঁতের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন,—'দ্যাখ কি, আমাদেরও ডাক পড়েছে।'

কথা শুনিয়া লাটুমহারাজের কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন,—'মহারাজ (শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামিজী) শরৎ সকলেই ঘরমুখো হয়েছেন।'

আজ ৪ঠা শ্রাবণ সন ১৩২৭ সাল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে মঠ ও নানাস্থান হইতে সাধু ও ভক্তগণ দলে দলে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন—সকলেই মুহ্যমান। এত লোকের সমাগম তবু উদ্বোধনে কোন শব্দ নাই, নীরবে যে যাহার কাজ যন্ত্রের ন্যায় করিয়া যাইতেছেন। আজিকার রাত্রি যে কাটিবে সে আশা আমাদের অনেকেরই ছিল না। ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত গেল। রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল মা ততই যেন স্থির হইয়া আসিতে লাগিলেন। রাত্রি ১টার সময় নাম শোনান আরম্ভ হইল। দেড়টার সময় মা কৈলাশে গমন করিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া, মা ডাকা চিরদিনের মত শেষ হইল।

পরদিন বেলা দশটার সময় উদ্বোধন হইতে শ্রীশ্রীমাকে লইয়া শরৎ মহারাজ মঠে যাত্রা করিলেন। বেলা যখন তিনটা সকল কাজ শেষ হইয়া গেল, তখন এক পশলা মাঠ ভাসান বৃষ্টি আসিয়া ধরিত্রীকে শীতল করিয়া দিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শরৎ মহারাজ উদ্বোধনের সকলকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মায়ের মহাপ্রস্থানের পরে শ্রীশ্রীমহারাজ একদিন বলরাম বাবুর বাড়ী হইতে উদ্বোধনে বেড়াইতে আসিয়াছেন। শরৎ মহারাজ প্রথমে মহারাজের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন তারপর বলিলেন 'মহারাজ! মায়ের অসুখের সময় একদিন মা মুড়ি ও ছোলা ভাজা খেতে বসেছিলেন সে সংবাদ পেয়ে আমি এসে মার কাছ থেকে উহা ভিক্ষা করেছিলাম। মাকে মুড়ি ও

ছোলা ভাজা খেতে দেই নাই। আজ তোমাকে খাইয়ে, মাকে মুড়ি ও ছোলা ভাজা খাওয়াতে আমার ইচ্ছে হয়েছে'—কথা সম্পূর্ণ না হইতে হাসিয়া মহারাজ বলিলেন,—'নিয়ে এসো আজ মুড়ি ও ছোলা ভাজা খাব।'

মহারাজ আনন্দ করিয়া মুড়ি ও ছোলা ভাজা খাইতেছেন। শরৎ মহারাজ বুকের উপর উভয় হস্ত রাখিয়া সজল নয়নে খাওয়া দেখিতেছেন। যখন মহারাজের মুড়ি খাওয়া শেষ হইল, শরৎ মহারাজের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শরৎ মহারাজ মহারাজের প্রসঙ্গে আমাদের বহুবার বলিয়াছেন,—'মহারাজের মধ্যেই ঠাকুর, মা রয়েছেন। মহারাজের সেবা, ঠাকুর ও মার সেবা বলে বিশ্বাস করবে।' আমরা এই কথা সম্যক ধারণা করিতে না পারিলেও মহারাজকে মুড়ি ও ছোলা ভাজা খাওয়াইয়া শরৎ মহারাজকে যে তৃপ্তি লাভ করিতে দেখিয়াছিলাম সেকথা অস্বীকার করিতে পারি না।

মানব দেহ ধারণ করিয়া, মানবের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া, সাধারণ মানব অপেক্ষা বুঝিবার শক্তি, বেশী অনুভূতি, অত্যধিক বিশ্বাস কেমন করিয়া লাভ করা যায় তাহার মীমাংসা সুকঠিন হইলেও আমরা দেখিয়াছি শরৎ মহারাজ চিরদিন শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীমহারাজ, শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের অনুগত বিশ্বাসী সহচরের ন্যায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে—'বিপদ কখন একা আসে না।' এই কথাটি শরৎ মহারাজের ভাগ্যে ইং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বিলক্ষণ ফলিয়াছিল। এই বৎসর শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ দেহ রক্ষা

করিলেন, রামকৃষ্ণ বসু দেহ ত্যাগ করিলেন, শ্রীশ্রীমা মহাপ্রস্থান করিলেন, শরৎ মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চারুচাবুর পুত্র চলন্ত গাড়ী হইতে পড়িয়া মারা গেলেন। শেষ আহুতি শ্রীমতী সুধীরা বসু।

ভগিনী নিবেদিতার দেহ রক্ষার পরে কল্যাণীয়া সুধীরা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্তা হন। সুধীরা শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্যা ছিলেন। যখন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ উদ্বোধনে দেহ রক্ষা করেন তখন সুধীরা সম্মুখে থাকিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের মহাপ্রস্থান নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। শিক্ষায় দীক্ষায় সুধীরা যেমন উপযুক্ত ছিলেন চরিত্র-গুণেও তিনি তেমনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের সময় সুধীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে মায়ের সেবা করিয়াছিলেন। মার মহাপ্রস্থানের পরে যত দিন যাইতে লাগিল সুধীরাও সকল কাজে যেন উৎসাহ হারাইতে লাগিলেন। শেষ পূজার ছুটী উপলক্ষ্য করিয়া নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সহ হরদ্বার দর্শন মানসে ইং ৪ঠা অক্টোবর প্রথমে কাশী যাত্রা করিলেন। ৫ই অক্টোবর সংবাদ আসিল, —শরৎ মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদর চারুবাবুর পুত্র ক্ষুদু চলন্ত গাড়ী হইতে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—'যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।' সুতরাং এই সকল সংবাদ শরৎ মহারাজের উচ্চ হৃদয়ে যে শেল সম আঘাত করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

ইং ২২শে নভেম্বর কাশীধাম হইতে সংবাদ আসিল হরদ্বার হইতে নানা তীর্থ দর্শন করিয়া প্রয়াগ হইতে কাশীধামে ফিরিবার

পথে চলন্ত গাড়ী হইতে পড়িয়া সংজ্ঞা হারা অবস্থায় সুধীরাকে কাশীতে আনা হইয়াছে। পরদিন ২৩শে তার আসিল বেলা সাড়ে তিনটার সময় সুধীরা বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে চির তরে মিলিতা হইয়াছেন।

যে সুধীরা শরৎ মহারাজকে অবলম্বন করিয়া কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন সেই সুধীরা আজ শরৎ মহারাজের সম্মুখে মহা-যাত্রা করিলেন। শরৎ মহারাজ এই সংবাদ ও নীরবে গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ

ইং ১৯২১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ সকাল বেলা শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলরাম বাবুর বাড়ী গেলেন। মহারাজ শরৎ মহারাজকে দেখিয়া 'সুপ্রভাত' Happy New Year (নববর্ষ শুভ হ'ক) বলিয়া আপ্যায়িত করিলেন। শরৎ মহারাজ হাসি মুখে অগ্রসর হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তারপর একে একে আমরা সকলে মহারাজকে প্রণাম করিলাম। মহারাজ কথা-প্রসঙ্গে জানাইলেন,—কাল রামকৃষ্ণপুর যাইবেন।

পরদিন শ্রীশ্রীমহারাজ রামকৃষ্ণপুরে গেলেন। বেলা ৩টার সময় শরৎ মহারাজ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে সঙ্গে করিয়া ডাক্তার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে (শরৎ মহারাজে কনিষ্ঠ সহোদর) দেখিতে বাহির হইলেন। আমাকে বেলা ৪টার সময় যাইতে বলিয়া গেলেন। তিনি Blood preasure (রক্তের চাপ) রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া শরৎ মহারাজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন ৪ঠা জানুয়ারী শরৎ মহারাজ যোগীনমা ও গোলাপ মাকে সঙ্গে করিয়া সতীশবাবুকে দেখিতে গেলেন। অবস্থা এখন খুবই সঙ্গীন।

শরৎ মহারাজের ভ্রাতারা ইতিপূর্ব্বে পৃথক পৃথক বাড়ীতে

অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরং সতীশ বাবুর সেবার জন্য লোকাভাব দেখিয়া শরৎ মহারাজ চিন্তিত হইলেন কিন্তু আমাদের কাহাকেও সে কথা জানিতে দিলেন না। দুই তিনবার সতীশ বাবুকে দেখিতে যাইয়া লোকাভাবে সেবা সময় মত হইতেছে না ইহা আমাদের চোখেও ধরা পড়িয়াছিল। সুতরাং শরৎ মহারাজকে বলিলাম,—'আমরা যদি সতীশ বাবুর সেবা করি—আপনি কি বলেন?' শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'সে কথা আমি কাউকে বলতে পারব না।' আমি বলিলাম, 'তিনি আপনার ভাই কিন্তু তিনি আমাদেরও ত বন্ধু; তা ছাড়া তিনি মঠে ও উদ্বোধনে সাধুদের রোগে কত চিকিৎসা করেছেন, মা'র জন্য দুইবার জয়রামবাটী গিয়াছেন, বেশ ত আপনি কিছু নাই বা বল্লেন—বন্দোবস্তের ভার যদি আমরা গ্রহণ করি?' শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'সে তুমি যেমন ভাল বুঝবে করতে পার কিন্তু এ নিয়ে যেন কোন কথা না উঠে।'

যখন সতীশ বাবুর সেবার কথা উদ্বোধনে জানাইলাম তখন শ্রীমান্ বরদা (স্বামী ঈশানানন্দ) ও ব্রহ্মচারী নরেন আনন্দের সঙ্গে সেবা করিতে সম্মত হইল। সতীশ বাবুর সেবা শ্রীমান্ বরদা ও নরেন করিতে লাগিল।

এ জীবনে অনেক লোক মরিতে দেখিয়াছি কিন্তু ডাঃ সতীশচন্দ্রের ন্যায় খুব কম লোকই মরিতে পারিয়াছেন। এই অসুখে একদিন অন্তর একটা ফিট আসিত, যেন দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে, যন্ত্রণায় রোগী অতিষ্ঠ। সেই সময় রোগীর অন্য কোন কথাই ছিল না, শুধু 'জয়রামকৃষ্ণ' 'জয়রামকৃষ্ণ'

বলিতেন। যখন তাহাও পারিতেন না তখন বলিতেন—'মহারাজ, আপনারা ঠাকুরের নাম করুন, আমি শুনব।' পুত্র, কন্যা, ভগিনী কাহারও খোঁজ হইত না। রোগের যন্ত্রণায় কাহাকেও দেখিবার ইচ্ছা করেন নাই। একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁহার আশ্রয় স্থল ছিলেন।

৯ই জানুয়ারী বৈকালে সতীশবাবু অন্যান্য দিন অপেক্ষা ভাল ছিলেন। এই ভাল থাকা সতীশ বাবুর জনৈক আত্মীয়ার নিকট ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া ধারণা হইল। যাহাতে সমস্ত রাত্রি আমাদের একজন কেহ থাকেন তিনি সেইজন্য অনুরোধ করিলেন। ব্যবস্থাও তেমনই হইল। স্থির হইল,—শ্রীমান্ বরদা আসিয়া সমস্ত রাত্রি থাকিবে। শরৎ মহারাজ এ সংবাদ শুনিয়া চিন্তিত হইলেন।

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় বরদা উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল প্রায় পৌনে বারটার সময় সতীশ বাবু দেহ রক্ষা করিয়াছেন। সেই রাত্রিতে ঘুমন্ত শরৎ মহারাজকে সংবাদ দিতে শ্রীযুত গণেন্দ্রনাথকে জাগাইতে হইল। গণেন্দ্রনাথ শরৎ মহারাজকে এই দুঃসংবাদ জানাইলেন—শরৎ মহারাজ আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'এখন কি করবে?'

উত্তরে গণেন্দ্রনাথ বলিলেন,—যোগেন (স্বামী সম্বিদানন্দ) ও বরদা যাবে, ঘাটের কাজ সমাধা করে ফিরে আসবে। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'শীতের রাত ওদের কষ্ট হবে না?' যোগেন ও বরদা বলিল—না মহারাজ কোন কষ্ট হবে না। 'তবে এস' বলিয়া শরৎ মহারাজ ঘরে শয়ন করিতে

গেলেন সত্য কিন্তু সমস্ত রাত্রি তিনি আর ঘুমাইতে পারিলেন না।

শ্রীশ্রীমা চলিয়া গেলেন, লাটু মহারাজ দেহরক্ষা করিলেন, চারুবাবুর ছেলেটি চলন্তগাড়ী হইতে পড়িয়া মারা গেল, সুধীরা ও চলন্তগাড়ী হইতে পড়িয়া দেহরক্ষা করিলেন, কনিষ্ঠভ্রাতা সতীশ বাবু ও দেহত্যাগ করিলেন, এই সকল কারণে শরৎ মহারাজ বড় বিমনা হইয়া পড়িলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ কাশীধামে যাইবেন স্থির হইয়াছে। শরৎ মহারাজও স্থির করিলেন কাশী যাইবেন। স্বামী শর্ব্বানন্দ অসুখের পরে দুর্ব্বল বিধায় বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কাশী যাইবেন স্থির করিলেন। সুতরাং শ্রীশ্রীমহারাজের কাশী যাত্রার দলটি বেশ বড়ই হইল। ১৯শে জানুয়ারী মহারাজের সহিত ১২।১৪ জন সাধু কাশীযাত্রা করিলেন। শরৎ মহারাজ মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ছিলেন। স্বামী শর্ব্বানন্দ আসিয়া শরৎ মহারাজকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইলেন। শরৎ মহারাজ উত্তর করিলেন, on principle আমি মধ্যম শ্রেণীতে যাতায়াত করে থাকি। শর্ব্বানন্দ যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

পরদিন সকাল বেলা মোগলসরাইতে পূজ্যপাদ হরি মহারাজ, স্বামী শঙ্করানন্দ (অমূল্য মহারাজ) শ্রীযুত চারুবাবু, কালীবাবু মোটর যোগে আসিয়া মহারাজের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যথা সময় বোম্বে মেল যাইয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীশ্রীমহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি মোটর

যোগে কাশীতে আসিলেন—আমরা সকলে মাল-পত্র লইয়া ট্রেণে আসিলাম। আশ্রমে আসিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম মহারাজের শুভাগমনে উভয় আশ্রমে সাড়া পড়িয়াছে।

শরৎ মহারাজ (২০শে জানুয়ারী) কাশীতে আসিয়াই গঙ্গাস্নান ও দর্শন প্রথম প্রথম নিত্য চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগার দরুণ ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে স্নান ও দর্শন বন্ধ হইল। তারপর যখন যখন ভাল থাকিতেন তখন তখন স্নান ও দর্শনের জন্য বাহির হইতেন শরীর ভাল বোধ না করিলে স্নান ও দর্শনে যাইতেন না। এ যাত্রায় শরৎ মহারাজ কাশীতে আসিয়া লক্ষ্মী নিবাসে আছেন। সঙ্গে যোগীন মা, সান্ন্যাল মহাশয় ও আমি। শ্রীশ্রীমহারাজ আছেন অদ্বৈতাশ্রমে।

৩০শে জানুয়ারী শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জন্মতিথি পূজা সমস্তদিন ধরিয়া চলিল। রাত্রিতে মোট ৩৫ জনের ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস হইল। শ্রীশ্রীমহারাজের সম্মুখে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাধা হইল। শরৎ মহারাজ ও সন্ন্যাসের সময় উপস্থিত ছিলেন।

বুড়ো বাবা (স্বামী সচ্চিদানন্দ) তখন কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। তিনি মস্তবড় একটি ভাণ্ডারা * দিয়া নূতন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের আপ্যায়িত করিলেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজীর উৎসব। এই দিন বেলা সাড়ে তিনটার মধ্যে দরিদ্র-নারায়ণগণের ভোজন সমাধা হইল। বৈকালে অদ্বৈতাশ্রমে স্বামিজীর পূতচরিত আলোচনার জন্য

---

* সাধুদের নিমন্ত্রণের নাম—ভাণ্ডারা।

এক সভার অধিষ্ঠান হইল। সভাপতি হইলেন,—স্বামী সারদানন্দ। প্রধান বক্তা হইলেন, কাশী ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত তেজা সিং—আকালী শিখ। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বক্তা বলিয়াছিলেন,—যৌবনের প্রারম্ভে যখন মানুষ ভাল বা মন্দ যে কোন দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে—ঠিক সেই সময়ে আমি স্বামিজীর কর্ম্মযোগ গ্রন্থখানা পাঠ করিবার সুযোগলাভ করি। এই কর্ম্মযোগ হইতে আমি তিনটি বিষয় শিখিয়াছি—

(১) অপবিত্র লোক কখন কর্ম্মী বা সেবক হইতে পারে না।

(২) প্রকৃত কর্ম্মী কখন কাজে নামিয়া কলহ করে না।

(৩) দান করিবার সুযোগ পাইয়া গ্রহীতা অপেক্ষা দাতাই সমধিক ভাগ্যবান্।

কারণ দরিদ্র না থাকিলে সে দয়াবৃত্তি অনুশীলন করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিত না।'

এই সভায় স্বামী শর্ব্বানন্দও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সকলের শেষে শরৎ মহারাজ সুকণ্ঠে ইংরাজীতে স্বামিজীর সম্বন্ধে বক্তাগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা গুছাইয়া বলিবার পরে—শ্রীকৃষ্ণের উদাহরণ দিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'Intense activityর (অদম্য কর্ম্মের) মধ্যে নিজস্ব রাখিতে হইবে intense calmness (অসীম শান্ত ভাব) যাহা যোগস্থ শ্রীভগবান কুরুক্ষেত্রে ভীষণ লোকক্ষয়ের মধ্যে দেখাইয়াছিলেন।'

উৎসবের পরদিন সোমবতী অমাবস্যা। রবি ও সোমবার

দুই দিন যুক্ত হইয়া যদি কখন অমাবস্যা পড়ে হিন্দু স্থানে সে অমাবস্যাকে সোমবতী কহে। এই দিন গ্রামের লোক নিকটস্থ নদীতে স্নান করিবে এবং বিশ্বনাথের ন্যায় কোন প্রসিদ্ধ দেব স্থান থাকিলে দলে দলে যাইয়া দেবতা দর্শন করিবে। সুতরাং কাশীতে সোমবতী অমাবস্যাতে যে লোক সমাগম হয় তাহা দেখিবার জিনিষ বটে। স্বামী সারদানন্দ তাঁহার রোজ নামচায় লিখিয়াছেন,—quite a deluge of pilgrims —Darsan and bath at 7-30 a. m. Maharaj feeling chill, অর্থাৎ প্রলয় কাণ্ড! যাত্রীরা প্লাবনের ন্যায় ছুটিয়াছ। দর্শন এবং স্নান সাড়ে সাতটায় সম্পন্ন। শ্রীশ্রীমহারাজের ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

গঙ্গায় সেই লোক প্লাবনের মধ্যে স্নান করিতে এবং বিশ্বনাথের দর্শন ত দূরের কথা গলিতে প্রবেশ করিতেই প্রাণান্ত উপস্থিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ধাক্কা খাইতে খাইতে তবুও মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে হইল। মন্দিরে প্রবেশ করিতে কি যে ধাক্কা-ধাক্কি, এক দল বাহির হইতেছে একদল তখনই প্রবেশ করিতেছে, তাহা যদি শুধু বাঙ্গালীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে দর্শনের জন্য শরীরে বেদনা যাইতে ২।৩ দিন সময় লাগিত না। এ সকলই প্রায় হিন্দুস্থানী কচিৎ দু দশজন বাঙ্গালী বা অন্য প্রদেশের লোক দৃষ্ট হইল। তাই বলবান, শিষ্টাচার শূন্য, সুবিধাবাদী হিন্দুস্থানীদলের মন্দিরে প্রবেশ ও বহিরাগমন ছোটখাট বাহু যুদ্ধের ন্যায় চলিয়াছিল। এক্ষেত্রে আমি অগ্রে, শরৎ মহারাজ পশ্চাতে। সাধ্য কি যে

সহজ ভাবে তাঁহাকে মন্দিরে যাইবার সুবিধা করিয়া দিতে পারি। দূর হইতে পাণ্ডার লোক এ দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং ধাক্কা ধাক্কি দ্বারা রাস্তা করিয়া শরৎ মহারাজকে লইয়া প্রবেশ করিল। শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের পূজায় যতক্ষণ রত ছিলেন, পাণ্ডার লোক ততক্ষণ তাঁহার পৃষ্ঠ দেশ রক্ষা করিতেছিল। পূজা শেষ হইল—পাণ্ডার লোককে কিছু 'প্রণামী' দিয়া আমরা অন্য পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পরদিন শ্রীশ্রীদুর্গাবাড়ী ও শঙ্কট মোচন দর্শনে শরৎ মহারাজ বাহির হইলেন। এই দিন লোকের ভিড় মোটেই ছিল না। শ্রীশ্রীদুর্গা দর্শন করিয়া পদব্রজে শরৎ মহারাজ শঙ্কট মোচন চলিলেন—গাড়ী সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। শঙ্কট মোচন দর্শন করিয়া যখন শরৎ মহারাজের সঙ্গে আশ্রমে ফিরিতেছিলাম তখন শরৎ মহারাজ শঙ্কট মোচনের গল্প যাহা ভক্ত কবি তুলসী দাস রামায়ণে লিখিয়াছেন তাহা এই ভাবে বলিলেন,—তুলসী দাস প্রতিদিন শৌচান্তে একটি গাছের গোড়ায় অবশিষ্ট জল টুকু ঢালিয়া ফেলিতেন। কিছুদিন গত হইলে এক অশরীরী (প্রেত) তুলসী দাসের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়া বলিল, তুমি যে জল বৃক্ষমূলে রোজ দিতে তাহাতে আমি তৃপ্ত হইয়াছি। তুমি যদি কিছু চাও বল, আমি সাধ্য হইলে তোমার উপকার করিব। তখন তুলসী দাস কেমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইবেন এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সেই অশরীরী মহাত্মাকে মহাবীরের সন্ধান বলিয়া দিলেন। নিত্য রামায়ণ শুনিতে রামগত প্রাণ মহাবীর (হনুমান) কাশীতে যে স্থানে আগমন

করেন সেই স্থানের কথা ও ছদ্ম বেশী মহাবীর দেখিতে যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাও বলিতে প্রেত ভুলিল না।

শ্রীশ্রীমহারাজ বলিতেন, সকল নদী নিজে সমুদ্রে মিলিত হইতে পারে না। ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতরকে আশ্রয় করে, সে আবার তার বড়কে আশ্রয় করে, সে তার বড়কে আশ্রয় করিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়া থাকে।

মহাত্মা তুলসী দাসের রামদর্শন আরম্ভ হইল প্রেতের তৃপ্তি সাধন দ্বারা। প্রেত মহাবীরের সন্ধান বলিয়া দিল, মহাবীর তুলসী দাসকে রামের সন্ধান দিয়াছিলেন এই ভাবে তুলসী দাসের রাম দর্শন সার্থক হইয়াছিল। গল্প শেষ হইল, শরৎ মহারাজ একটি চুরুট টানিতে লাগিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী আসিয়া আশ্রমের সম্মুখে দাঁড়াইল।

আজ ১০ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমহারাজের জন্ম তিথি পূজা। শ্রীশ্রীমহারাজ স্বয়ং কাশীধামে উপস্থিত আছেন। উভয় আশ্রমের শিষ্য ও শিষ্য-স্থানীয়গণের সহিত তাঁহার গুরুভ্রাতা পূজ্যপাদ হরি মহারাজ ও শরৎ মহারাজের উৎসাহ মিলিত হইয়া যাহা হইয়াছিল তাহাকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের রাজসূয়যজ্ঞ বলিলে কিছু অত্যুক্তি হইবে না। রাজসূয় যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য বল প্রয়োগে অন্যান্য রাজন্যবর্গকে বশে রাখা। এস্থলে কিন্তু বল প্রয়োগ মোটেই ছিল না, ছিল শ্রীশ্রীমহারাজের প্রবল আধ্যাত্মিকতার সম্মুখে সকলের অবনত মস্তকে অবস্থান করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। বেলা ৯টার সময় শরৎ মহারাজ আসিয়া নত জানু হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন। হরি মহারাজ ইতি

পূর্ব্বে আসিয়া প্রণাম করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্তা যোগেন মা ভাল ভাল মিষ্টি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ—'এই যে যোগেন মা, আসুন' বলিয়া সেবকদের একখানা বসিবার আসন দিতে বলিলেন। যোগেন মা হাতের মিষ্টি জনৈক সেবক সাধুকে ধরিতে বলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তারপর হাত ধুইয়া মিষ্টির ভাড়টি সেবকের হাত হইতে গ্রহণ করিয়া মহারাজের সম্মুখে ধরিলেন। ইতি মধ্যে একজন কমণ্ডলু আনিয়া মহারাজের হাতে জল দিলেন, মহারাজ আনন্দ করিয়া মিষ্টি-খাইতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজের রোজ নামচায় লেখা আছে,—Maharaj's birthday celebrated with great eclat. Feeding of about 350 and kalipuja (with Pratima) puja by S. Sarvananda, puja and homa finished at 4 o'clock night when four including Charu took sannyasa. অর্থাৎ খুব জাক জমকের মধ্যে মহারাজের শুভ জন্ম তিথি পূজা সম্পন্ন হইল। প্রায় ৩৫০ জন প্রসাদ পাইয়াছেন। রাত্রিতে কালী পূজা প্রতিমায় হইয়াছিল, পূজক স্বামী শর্ব্বানন্দ। পূজা ও হোম শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ৪টা বাজিল। তখন চারুসহ চারজন সন্ন্যাসগ্রহণ করে। এই চারুই কাশী সেবাশ্রমের সুপরিচিত চারুবাবু। সন্ন্যাসের পর ইঁহার নাম স্বামী শুভানন্দ হইয়াছিল।

আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি, শ্রীশ্রীমহারাজ যেখানে থাকেন সেস্থানকেই আনন্দে মাতাইয়া তোলেন। সুতরাং কাশীধামে মহারাজের

অবস্থানে যে আনন্দ ধারা প্রবাহিত হইতে ছিল তাহা বাধ্য না হইলে কেহই ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অনেকেই এই আনন্দে যোগদান করিতে নিজ নিজ কর্ম্মকেন্দ্র ছাড়িয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন। স্বামী মাধবানন্দ (নির্ম্মল) তন্মধ্যে একজন।

একদিন লক্ষ্মী নিবাসে সকাল বেলা শরৎ মহারাজ ও সান্যাল মহাশয় বসিয়া আছেন এমন সময় শ্রীমান্ নির্ম্মল ও সুধীর মহারাজ আসিয়া লোকাভাবে সকল কেন্দ্রের কাজ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না অতএব মহারাজকে বলিয়া ইহার প্রতীকার করুণ বলিয়া শরৎ মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। কথা-প্রসঙ্গে সুধীর মহারাজ বলিলেন, 'কাজ করতে বল্লে ছেলেরা তপস্যার কথা বলে, যেন তপস্যাই হল বড়, কাজ কর্ম্মসব হল বাজে!' শরৎ মহারাজ বলিলেন,—"তা কি করবে বল? এ দেশের বদ্ধ ধারনা (সংস্কার) জপ-ধ্যান, কাজ কর্ম্ম অপেক্ষা বড়, তাই সকলে বলে,—জপধ্যান করব। স্বামিজীর সেবাধর্ম্ম যে জপ-ধ্যানের সমান কল্যাণপ্রদ তা আমরা এখনও বিশ্বাস করতে শিখি নি। জপ-ধ্যান করতে গিয়ে যদি বাজে কথা ভাবে তবু ও বিশ্বাস করবে, রোগী সেবার চাইতে সে কাজ অনেক ভাল। আমার কিন্তু মনে হয় জপ, ধ্যান ও সেবা উভয় কাজই আদর্শ বজায় রেখে করতে হবে, তা যে না পারবে তার জপ ধ্যানে ও কোন ফল হবে না, সেবা করে ও কল্যাণ হবে না।"

শরৎ মহারাজের কথা শুনিয়া আমার মনে পড়িয়া গেল শ্রীশ্রীমহারাজের কথা। একদিন মহারাজ গঙ্গার ধারে একখানা

বেঞ্চে বসিয়া আছেন। সম্মুখে ঘাসের উপরে বারুই পুরের উকিল কেদার বাবু। আমি একখানা বড় হাত পাখা লইয়া বাতাস করিতে ছিলাম। তখন কেদার বাবু প্রশ্ন করিলেন,—'মহারাজ, নিত্য জপ করা উচিৎ ত ?'

মহারাজ বলিলেন,—'হ্যাঁ করা ভাল, তবে কি জানেন কেদার বাবু সব কথা খুলে বললে আপনারাই শেষটা আমাকে নাস্তিক বলে ভাববেন।'

কেদার বাবু বলিলেন,—'না মহারাজ, আমরা আপনাকে কেউ নাস্তিক ভাববনা। আমাকে কৃপা করে বলুন। সত্য কথা শুনবার জন্যই ত আপনাদের কাছে আসা।'

মহারাজ বলিলেন,—যেমন ক্ষিদে পায়, তেমন জপ ধ্যানে পাওয়া চাই। ভিতর থেকে পাওয়া বোধ না হলে জপে মুখে ফেকো উঠাই সার হবে, সে কাজে কোন ফল হয় না।

জানি না কেদার বাবু 'মুখে ফেকো উঠাই সার হবে' শুনিয়া কি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজের শ্রীমুখে ঐকথা আমার খুব ভালই লাগিয়াছিল।

ইং ১২ই ফেব্রুয়ারী বাং ৩০শে মাঘ সংক্রান্তির দিনে শরৎ মহারাজের ইচ্ছায় আমাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। তাঁহার রোজ নামচায় আছে,—Bhumananda went to calcutta to attend his brother-in-law (ill) at the request of his sister. অর্থাৎ ভূমানন্দ কলিকাতায় রওনা হইল—তাহার অসুস্থ ভগ্নিপতিকে দেখিবার জন্য, দিদির অনুরোধে। আমার ভাগ্যে কাশীর নিত্য আনন্দ উৎসব

এই যাত্রায় শেষ হইল। অতঃপর শরৎ মহারাজের রোজ নামচা সহায়ে আমাদের দেখিতে হইবে তিনি কাশীতে কি ভাবে দিন যাপন করিয়াছিলেন। রোজ নামচায় আছে :—

ইং ১৩ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজা প্রতিমা সহায়ে অদ্বৈতাশ্রমে ও সেবাশ্রমের ছাত্রাবাসে সুসম্পন্ন হইল।

ইং ১৫ই—কেদার, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন।

ইং ১৮ই—দিনের বেলা বুড়ো বাবার সঙ্গে কাল ভৈরব ও বেনীমাধব দর্শন। রাত্রি ১০টার সময় শয়নের পূর্ব্ব প্রস্রাবের সহিত রক্ত পড়িয়াছিল।

ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমহারাজ শিব রাত্রিতে কাশীধামেই থাকিবেন অভিমত প্রকাশ করিলেন।

ইং ২৩শে—হরি মহারাজের স্থানে (সেবাশ্রমে) বসিয়া সভা হইল। সেই সভায় স্থির হইল স্বামী কালিকানন্দ এক বৎসরের জন্য সেবাশ্রমের সহকারী সম্পাদক হইবে।

ইং ২৫শে—সেবাশ্রম সম্বন্ধে পুনরায় সভা বসিল। এই সভায় শ্রীমতী প্রমদা দেবীর উপরে (মেয়ে সেবিকা ও রোগীর ভার) মেয়ে বিভাগের সমুদয় দায়িত্ব অর্পণ করা হইল।

শিব রাত্রির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজার পূর্ব্বে শরৎ মহারাজ কাশীধাম হইতে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ শরৎ মহারাজ কর্ত্তৃক কাশী সেবাশ্রমের সংস্কার সাধনকে বজায় রাখিবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষকে ভুবনেশ্বরে যাইয়া তপস্যা করিবার জন্য সঙ্গে করিয়া বেলুড় মঠে লইয়া আসিয়াছিলেন কিম্বা হরি মহারাজকে যাহা

বলিয়া সেবাশ্রমের কাজে শৃঙ্খলা আনিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইবার অবসর তিনি কাহাকেও দেন নাই। বিরুদ্ধ পক্ষের বাধা অপসারিত হওয়ায় স্বামী কালিকানন্দ কাশী মিশন সেবাশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটি এত দিনে নিয়মানুসারে কাজ করিতে সক্ষম হইলেন।

স্বামী পূর্ণানন্দ শ্রীশ্রীমাকে দেখিবার জন্য অমৃতসর হইতে সেই যে আসিয়াছিলেন তদবধি উদ্বোধনেই আছেন এবং নিত্য সন্ধ্যার পরে শরৎ মহারাজের বসিবার ঘরে যে বৈঠক বসিত তাহাতে যোগদান করিতেন। একদিন পূর্ণানন্দ স্বামী প্রশ্ন করিলেন,—'মহারাজ, কি করিলে আসন সিদ্ধ হওয়া যায়?' গম্ভীর প্রকৃতি শরৎ মহারাজ সুবিধা পাইলে রহস্য করিতে কাহাকেও ছাড়িতেন না। তাই গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, —'যা করে তুমি আসন সিদ্ধ হয়েছ!' কথা শুনিয়া পূর্ণানন্দ স্বামী হাসিয়া ফেলিলেন। তখন শরৎ মহারাজ বলিলেন,— 'ঘর থেকে বেরুবে না দিন রাত বসে থেকে একটা অসুখ বিসুখ না বাঁধিয়ে বোস।' পূর্ণানন্দ স্বামী তখন অন্য বিষয়ে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

নিত্য বৈঠক বসিতেছে আজ পূর্ণানন্দ স্বামী সন্ধ্যার বৈঠকে শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবায় আপনারা কে কে ছিলেন?' শরৎ মহারাজ এই প্রশ্নে স্বামিজী, লাটু মহারাজ, শশী মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, কালী মহারাজ প্রভৃতির নাম করিলেন

কিন্তু নিজের কথা বলিলেন না। তখন সান্ন্যাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—'শরৎও ঠাকুরের সেবা করত, সপ্তাহে তিন দিন, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার ঠাকুরের কাছে যেত।' ছুটির দিনে সেবা করত, ছুটি না থাকলে কলেজে যেত। ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর শরৎ যেমন মেডিকেল কলেজে পড়ছিল তেমনই পড়া শুনা করতে লাগল।' কথা এই পর্য্যন্ত হইতেই শ্রীযুত আশু বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎ মহারাজ আশু বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং জনৈক সেবককে চা আনিতে বলিলেন। কথা তখন অন্য প্রসঙ্গে আরম্ভ হইল।

অন্য একদিন দীক্ষা সম্বন্ধে স্বামী পূর্ণানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! দীক্ষার সঙ্গে গুরু শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয় কি?' প্রশ্ন শুনিয়া শরৎ মহারাজ রহস্য করিয়া উত্তর দিলেন,— অনেকদিন ত কাউকে দীক্ষা দেই নি কেমন করে বলব মন্ত্রের সঙ্গে আর কিছু দিতে হয় কি না!' স্বামী পূর্ণানন্দও নাছোড়বান্দা! তিনিও হাসিয়া বলিলেন,—'আমেরিকায় যে সকলকে দীক্ষা দিয়াছিলেন তখনকার কথাই'—কথা শেষ না হইতেই শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'কি আমেরিকায়, কি এদেশে ফিরে এসে যা দীক্ষা দিয়েছি তা স্বামিজীর আদেশ পালন করা ছাড়া আর কিছু করেছি বলে ত মনে হয় না। তা সেও অনেক দনের কথা, ভুলে গেছি।'

একজন সাধু অন্য রকম প্রশ্ন করিলেন,—'মহারাজ! আমাদের কেন সমাধি হয় না?' শরৎ মহারাজ বলিলেন,—

'একটা পরীক্ষা পাস করবার জন্য ছেলেরা যে পরিশ্রম করে, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় না যদি কারুর সমাধি লাভ করবার আন্তরিকতা থাকে। আসল কথা হচ্ছে আমরা ঠাকুরের হস্তামলকবৎ সমাধির কথা শুনে সমাধি চাই, ভিতর থেকে কেউ চাই না। ভিতর থেকে চাইলে কেন হবে না বাপু তা ত বুঝতে পাচ্ছি না!'

সাধুটি প্রশ্ন করিলেন,—'সমাধি লাভেও গুরুবল প্রয়োজন হয় কি?'

শরৎ মহারাজ,—'শিষ্যের আন্তরিকতা, শিষ্যের মধ্যে সমাধি লাভ করবার ক্ষমতা এ উভয়ই থাকা চাই। তাতে যদি না হয় দেখা যায় তখন গুরু কোথায় আটকাচ্ছে দেখে সে বাধা সরিয়ে দিতে যত্ন করতে পারেন কিন্তু সিদ্ধি সাধকের শক্তি বিকাশের উপরে নির্ভর করে।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'আচার্য্য তোতাপুরীর কথাই ধর না। তিনি যতবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন— সমাধি হল কি, ঠাকুর উত্তরে বলছেন, না হচ্ছে না। তখন তোতাপুরী কেন হচ্ছে না বলে মাটির দিকে চেয়ে যেন কি খুঁজতে লাগলেন, একখানা কাঁচ ভাঙ্গা দেখতে পেয়ে তুলে এনে ঠাকুরের ভ্রূর মধ্যস্থলে কাঁচের তীক্ষ্ণ দিক চেপে ধরে বল্লেন,—মন এইখানে নিয়ে এস। তোতাপুরীর কথা মত ঠাকুর যেমন মন ভ্রূর মধ্যে আনতে সক্ষম হলেন তখনই সমাধিস্থ হলেন।' সাধুটি বলিলেন,—উপনিষদে যে বলেছেন,—গুরু অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন হবে এবং শিষ্যেরও মরিয়া হয়ে (দৃঢ়তম)

জানবার বৃত্তি সজাগ রাখতে হবে, তাই কি?' শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'তাই।'

সাধুটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'এক কলকে তামাক দাও—খেয়ে উঠা যাক্।' আমি তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া আনিলাম। শরৎ মহারাজ তামাক খাইতে লাগিলেন।

একদিন সকালের সংবাদ পত্রে দেখা গেল আশাম চা বাগান হইতে অনেক কুলি কর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার কুলি চাঁদপুরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে তাহাদের ইচ্ছা ছিল গোয়ালন্দ পথে দেশে ফিরিবে। নানাকারণে চাঁদপুরে কুলিদিগকে এক সপ্তাহ থাকিতে হইল। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন হইতে কুলিগণের সেবার জন্য গোয়ালন্দ পথে সেবক প্রেরিত হইল। আমি বরিশাল পথে চাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের আসিবার পূর্ব্বে এ, বি রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের জন্য গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। আমাদের চাঁদপুরে উপস্থিত হইবার পরে ষ্টীমার কোম্পানীতে ধর্ম্মঘট হইল ষ্টীমার চলাচলও বন্ধ রহিল। কুলিগণের চাঁদপুর ত্যাগ করিবার আর কোনও উপায় রহিল না।

চাঁদপুরে আসিয়া মিশন (মে মাস) দেখিলেন কুলিগণের সেবার ভার কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শৃঙ্খলার সহিত কোন দিকই সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কুলিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সর্দ্দি কাশীতে ভুগিতেছিল। হঠাৎ কুলিদের মধ্যে কলেরার প্রকোপও দেখা দিল। প্রত্যহ দশ, পনর

করিয়া কুলি কলেরায় মরিতে আরম্ভ করিল। কংগ্রেসের সেবকগণ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল।

তখন চাঁদপুরে কংগ্রেস ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন ও মাড়োয়াড়ী সেবা সমিতি উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস সেবা ও Politics (হরতাল প্রভৃতি) একসঙ্গে চালাইতে ছিলেন বলিয়া মিশন চাঁদপুরের সর্ব্বজনপ্রিয় কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত হরদয়াল নাগ মহাশয়কে জানাইলেন আপনাদের সহিত সহযোগীতায় সেবা কার্য্য করিতে মিশন সর্ব্বদাই প্রস্তুত যদি সেবার সহিত Politics না করেন। অর্থাৎ বক্তৃতা প্রভৃতি নদীর উত্তর পারে সহরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, নদীর দক্ষিণ পারে কুলি ক্যাম্পে শুধু সেবার কাজ চলিবে। হরদয়াল বাবু মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত ও শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া কুলি ক্যাম্প হইতে সকল রকম রাজনৈতিক আন্দোলন তুলিয়া লইলেন।

মিশনের নেতৃত্বে মিশন, কংগ্রেসও মাড়োয়ারী সেবা সমিতি তিনদল একসঙ্গে সেবাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। কার্য্যারম্ভের পর চার পাঁচ দিন কলেরায় কুলির মৃত্যু সংখ্যা দৈনিক আঠার, কুড়ি, বাইশ, পঁচিশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ক্যাপ্টেন সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় হাসপাতালের ভার গ্রহণ করিলেন। উৎকৃষ্ট চাল পরিষ্কার পানীয় জল, রোগে ঔষধ ও পথ্য প্রত্যেক কুলির বিছানার নীচে খড়,—নানা উপায়ে কুলিগণের কাসি ও কলেরার বেগ কমিয়া আসিল। দেশে ফিরিবার জন্য কুলিগণ উতলা হইয়া উঠিল।

সেই সময় চাঁদপুরের হাটে, ঘাটে, মাঠে Repatriation (কুলিদের দেশে ফিরিবার উপায়) শব্দটি বহুল ব্যবহার হইয়াছিল।

কিন্তু সরকার দেশে ফিরিবার জন্য কুলিদের কোন সাহায্য করিলেন না। কংগ্রেস অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কুলিদিগকে চাঁদপুরে রাখিয়া যাহাতে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারেন তাহার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। এই অবস্থায় মিশন কাজ করিতে সক্ষম নহেন একথা হরদয়াল বাবুকে জানাইলে তিনি শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীকে এক তার করেন। মিশন হইতে ও শরৎ মহারাজকে পত্র দ্বারা সকল কথা নিবেদন করা হইল। উত্তরে শরৎ মহারাজ শ্রীযুত নাগমহাশয়কে ও সেবকদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই ঃ—

The Ramkrisna Misson

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার

কলিকাতা।

৫-৬-১৯২১

মহাশয়,

আপনার টেলিগ্রাম পাইলাম। রিলিফ কাজ সংক্রান্ত সমস্ত ভার স্বামী ভূমানন্দের উপরে দেওয়া আছে। সেখানকার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার সুবিধা থাকায় তিনি স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেই রকমই হইবে। আমরা ভূমানন্দ স্বামীকে জানি। সেখানে যদি তাঁহার থাকার প্রয়োজন থাকে এবং তাহাতে বহু লোকের মঙ্গল হয় তিনি নিশ্চয়ই থাকিবেন এবং সেবা কার্য্য চালাইবেন। ইতি—

নিবেদক

শ্রীসারদানন্দ

সেবকগণের প্রতি স্বামী সারদানন্দের চিঠি :—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

1, Mukherjee Lane
Bagh Bazar
Calcutta
7th June, 1921 (6 p, m.)

শ্রীমান্ ভূমানন্দ

তোমার ৫।৬।২১ তারিখের পত্র পাইলাম। তোমার পত্রে দুইটি বিষয়ের জন্য আমার মত এবং আদেশ চাহিয়াছ। ১ম, Politicsএর সহিত জড়িত হইয়া কাজ করিবে কিনা। হরদয়াল বাবু তোমাদের ঐরূপ করাইবার জন্য তার করিয়াছিলেন. তাহার উত্তরে এই সঙ্গে পত্র দিয়াছি, স্বামী ভূমানন্দের উপর সকল ক্ষমতা দিয়া আমরা পাঠাইয়াছি, দীন দরিদ্র কষ্ট পাইতেছে দেখিলে তিনি সেবা কার্য্য কখন ছাড়িবেন না নিশ্চয় জানি, তিনি দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহা স্থির করেন তদ্বিষয় আমাদের সম্পূর্ণ অভিমত থাকিবে। অতএব তোমার ১ম প্রশ্নের উত্তর দেবার আর প্রয়োজন নাই, তুমি দরিদ্র নারায়ণগণের সেবায় গিয়াছ, যেমন এবং যাহা করিলে উক্ত সেবা করা হয় তাহাই করিবে—Politics করিতে তুমি যাও নাই এবং আমরা ও তোমায় পাঠাই নাই।

তোমার ২য় প্রশ্ন কংগ্রেস নেতাদিগের প্রার্থনামত তোমরা কুলিদিগের আরও ৪দিন খাই খরচ দিবে কিনা? যখন কংগ্রেস

কমিটির টাকার অভাব নাই এবং মিশনের টাকার অভাব রহিয়াছে তখন আমরা টাকা দিব কেন? খুলনার দুর্ভিক্ষ রিলিফ্ কমিটি (যাহার প্রেসিডেণ্ট হইতেছেন Sir P, C, Roy) আমাদের নিকট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য বারংবার সাহায্য চাহিতেছেন, তাঁহারা বলেন অন্নাভাবে মানুষ তথায় মারা যাইতেছে—আমরা যাহা পারি তথায় ব্যয় করিব। আমার ইচ্ছা কুলির সেবা কার্য্য শেষ করিয়া যত শীঘ্র পার খুলনায় যাইয়া তথাকার অবস্থা পরিদর্শন করিয়া তথায় কার্য্য খুলিয়া দাও, উহার জন্য টাকা ও সেবক যাহা পাঠাইতে হয় লিখিলেই পাঠাইব। তোমাদিগের ভিতরে যাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ তাহাদের Replace করিবার জন্য লোক পাঠাইব এবং তুমি যাহাকে উপযুক্ত বুঝিবে—কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহার উপর ভার দিয়া চলিয়া আসিবে। প্রিয়নাথ সম্বন্ধে ও ঐ কথা।

এখানকার কুশল। আমাদের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ তোমরা প্রত্যেকে জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

এই চিঠি আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা হইতে মিঃ এস, আর, দাস সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে প্রচুর অর্থ দিয়া চাঁদপুরে পাঠাইয়া দেন। সেই অর্থে কুলিগণ ষ্টীমারযোগে গোয়ালন্দ হইয়া দেশে ফিরিতে পারিয়াছিল। প্রায় পয়তাল্লিশটি কলেরার রোগী যাহারা তখন রোগমুক্ত হইয়া দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত স্থান ত্যাগ করিতে অক্ষম ছিল তাহার

ভার ক্যাপটেন ব্যানার্জ্জি তথা কংগ্রেস দলের উপরে অর্পণ করিয়া মিশন কুলি সেবাকার্য্যের ইতি করিলেন।

কুলি সেবাকার্য্যের মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার আনন্দ আমরা চাঁদপুরে উপভোগ করিলাম। উদ্বোধনের (কলিকাতা) পত্রে জানিলাম,—এই রথ দ্বিতীয় উপলক্ষ্য করিয়া শরৎ মহারাজ বহু বৎসর পরে নূতন করিয়া আবার দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

জুলাই মাসের শেষভাগে আমরা উদ্বোধনে আসিয়াছি। সেই সময় একদিন স্বামী পূর্ণানন্দ শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —কাশীপুরের বাগানে সেই ১লা জানুয়ারী ঠাকুর যেদিন কল্পতরু হয়েছিলেন সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন? শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'কাশীপুরের বাগানেই ছিলাম।' এই কথা বলিবার পরে শরৎ মহারাজ কাশীপুরের ঘটনা সমস্ত বলিতে লাগিলেন, যেমন জয়রামবাটীতে শ্রীযুত কেদারের প্রশ্নে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন। অধিকন্তু হাজরা মহাশয়ের গল্পটিও এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তাহা এই,—হাজরা ১লা জানুয়ারী ঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য কাশীপুরের বাগানে আসিতেছিলেন। রাস্তায় এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সমস্ত দিন সেখানে কাটাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাশীপুরের বাগানে আসিয়া সকল শুনিয়া নিজের অনুপস্থিতির জন্য মনে মনে ভীষণ ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার দিন কতক পরে হাজরা স্বামিজীর কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমার কিছুই হল না'। স্বামিজী হাজরার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—

'তার আর কি হয়েছে, ঠাকুরকে বলে দিব, আপনারও হবে।' হাজরা এই কথা শুনিয়া আনন্দ মনে চলিয়া গেলেন।

যথা সময়ে স্বামিজী সকল কথা ঠাকুরকে বলিলেন এবং হাজরাকে কৃপা করিবার জন্য আবদার ধরিলেন।

ঠাকুর যত বলেন—আমি কি বলব মার ইচ্ছা হলে হবে, স্বামিজী ততই আবদারের মাত্রা বাড়িয়ে বলতে লাগলেন,—মার ইচ্ছা-টিচ্ছা আমি জানি না—আপনাকে করে দিতেই হবে। অনেকক্ষণ এই ভাবে কথা চলিয়াছিল—শেষ ঠাকুরকে স্বীকার করিতে হইল—মৃত্যু সময়ে হাজরার ইষ্ট দর্শন হবে।

হাজরা মহাশয়কে তাঁহার পুত্রগণ অন্তিমকাল আগত দেখিয়া 'নারায়ণক্ষেত্রে' আনিয়াছেন। মাথার ধারে তুলসী বৃক্ষ, পদতলে অন্তর্জ্জলীর ব্যবস্থা—হাজরা কিন্তু চুপ করিয়া আছেন। হঠাৎ হাজরা বলিয়া উঠিলেন,—'একখানা আসন আন, বলরাম বাবু এসেছেন।' পুত্রগণ মধ্যে একজনে একখানা আসন আনিয়া বিছাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিয়া উঠিলেন,—ওরে আসন নি-আয়—যোগেন স্বামী এসেছেন।' পূর্ব্বের ন্যায় আর একখানা আসন ও রক্ষিত হইল। পরপারের যাত্রী স্তিমিত লোচনে শয়ন করিয়া আছেন। সহসা হাজরার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল শ্রী-ধারণ করিল—তিনি আনন্দে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ওরে আসন নি-আয়, আসন নি-আয়' পরক্ষণে —'এঁ্যা আপনি' বলিবার সঙ্গে হাজরার প্রাণ দেহত্যাগ করিল। এতদিন পরে ঠাকুরের নিকটে স্বামিজীর আবদার বর্ণে বর্ণে রক্ষিত হইল।

এই গল্পের পরে ভক্তগণ প্রণামান্তে প্রসাদগ্রহণ করিয়া যে যার বাড়ী চলিয়া গেলেন। শরৎ মহারাজ কিছুক্ষণ পা দুখানি টান করিয়া পায়ের জড়তা দূর করিয়া ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

শরৎ মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজ প্রসঙ্গে কি একটা কথা লিখিবেন স্থির করিয়াছিলেন (ইং ১৯১৫ খ্রীঃ মে মাসে) যাহা বাবুরাম মহারাজ নিষেধ করায় শরৎ মহারাজ তাহা প্রকাশ করেন নাই, এ সংবাদ আমরা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু বিষয়টি কি তাহা এতদিনে ও জানিতে পারি নাই।

সেদিন বৈঠকে শ্রীশ্রীমহারাজের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। শরৎ মহারাজ উৎসাহের সহিত মহারাজে কথা বলিতেছেন, ভক্তগণ শুনিয়া যাইতেছেন। এ সকল কথা পূর্ব্বেই শুনা ছিল, সুতরাং আমার তখন ইচ্ছা হইতেছিল কতক্ষণে ভক্তেরা উঠিবেন। কারণ সকলের সম্মুখে এ রকম কথা জিজ্ঞাসা করা হয় ত ভাল নাও হইতে পারে। ভক্তেরা উঠিতে দশটা বাজাইলেন। সান্ন্যাল মহাশয়ও উঠিয়াছেন। শরৎ মহারাজ এক একখানা করিয়া পা সোজা করিতেছেন। এমন সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'মহারাজ যে বার আপনি পুরীতে মহারাজের (শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী) সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন সেবার মহারাজের সম্বন্ধে কি লিখেছিলেন যাহা বাবুরাম মহারাজের কথায় প্রকাশ করেন নি ?'

শরৎ মহারাজের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতে ছিল তিনি প্রশ্নটি বুঝিতে পারেন নাই। আমিও কথা আর কিছু না

বলিয়া মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া আছি। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—'কমলে কৃষ্ণ' সেই কথা? আমি বলিলাম, "কোন্ কথা তা ত জানি না।" তখন শরৎ মহারাজ যেন ভাবিতে লাগিলেন, তারপর বলিলেন,—"বাবুরাম মহারাজ 'কমলে কৃষ্ণ' প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন।" তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কমলে কৃষ্ণ কি মহারাজ?'

শরৎ মহারাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"একদিন ঠাকুরের ইচ্ছা হল তাঁহার সহিত মহারাজের কি সম্বন্ধ তাহা জানবার। মা দেখালেন,—একটি পদ্মের উপরে কৃষ্ণ একটি বালকের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বালকটির আকৃতি ঠিক কৃষ্ণের ন্যায়। এই অনুভূতির কথা ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন এবং একথা কেহ যেন রাখাল মহারাজকে না বলেন সে বিষয়েও তিনিই সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সতর্ক করে দেওয়ার কথা আমি বিস্মরণ হয়ে ছিলাম। তাই লীলা-প্রসঙ্গে কমলে কৃষ্ণ লিখব ভেবেছিলাম। ঠাকুরের ইচ্ছা, বাবুরাম মহারাজকে ঐ প্রসঙ্গে বলায় তিনি ঠাকুরের নিষেধাজ্ঞা জানান। তারই জন্য লীলাপ্রসঙ্গে ঐ অংশ আর লেখা হয় নি।"

পূজ্যপাদ হরি মহারাজের বুকে কারবন্‌কল্ হইয়াছে—এ সংবাদ কাশী সেবাশ্রম হইতে শরৎ মহারাজের নিকট যে দিন আসিয়া পৌছিল তার তিন দিনের মধ্যে অর্থাৎ আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে শরৎ মহারাজ ডাঃ কাঞ্জিলালকে সঙ্গে করিয়া কাশী রওনা হইলেন। কাশীতে আসিয়া দেখা গেল হরি মহারাজ প্রায় সমস্ত বুক পাকিয়া পুঁজ হইয়াছে, অস্ত্রোপচার ভিন্ন

অন্য উপায় নাই। তখন শরৎ মহারাজ হরি মহারাজকে পূর্ব্বের ন্যায় ধরিয়া বসিলেন,—কিছুক্ষণের জন্য মনটাকে শরীর হইতে তফাৎ রাখিতে হইবে। কথা শুনিয়া হরি মহারাজ বালকের ন্যায় কান্নার সুরে, কত কি বলিয়া আপত্তি জানাইলেন। শরৎ মহারাজ ও ছাড়িবার নহেন অবশেষে হরি মহারাজ রাজী হইলেন। স্থির রহিল,—পরদিন বেলা ৮।৯ টার সময় ডাঃ কাঞ্জিলাল অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন।

যথা সময়ে চা পান করিয়া শরৎ মহারাজ হরি মহারাজের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! ডাক্তার কাঞ্জিলালও ব্যাগ হস্তে আসিয়া সকল জিনিষ পত্র টেবিলের উপরে সাজাইতে লাগিলেন। অস্ত্রোপচারের জন্য গরম জলে যাহা সিদ্ধ হইবার তাহা হইয়া টেবিলের উপরে রক্ষিত হইল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল একটা ঔষধ (Spray) বুকের উপরে ছিটাইয়া দিতে দিতে গল্প আরম্ভ করিলেন। হরি মহারাজকে ডাক্তার বলিলেন 'একটুও জানতে পারবেন না, লাগলে উঃ করবেন কিন্তু।' হরি মহারাজ কথা শুনিয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। ডাক্তার ছুরি ধরিলেন, এবং লম্বা লম্বা ভাবে চারিটি স্থান কাটিয়া পুঁজ বাহির করিয়া যখন ব্যাণ্ডেজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন তখন হরি মহারাজ 'উঃ' করিয়া উঠিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'উঃ করলেন কেন মহারাজ?' হরি মহারাজ-স্মিত মুখে উত্তর করিলেন,—'তুমি যে উঃ করতে বলেছিলে।' কথা শুনিয়া ঘর শুদ্ধ লোক সকলে হাসিয়া উঠিল। ডাক্তার একটু অপ্রতিভ হইলেন।

হরি মহারাজ ভাল হইতেই সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন এবং ছয় সাত দিন গত না হইতেই অসুখে পড়িলেন।

শরৎ মহারাজের জ্বর হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে পেটে বেদনা। প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া জানা গেল, অসুখ খুব কঠিন আকার ধারণ করিতে পারে যদি প্রথমেই অসুখের গতিরোধ না করা যায়। ডাঃ কাঞ্জিলাল চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। এই সময় শ্রীশ্রীমহারাজ ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে ছিলেন। শরৎ মহারাজের অসুখ খুব কঠিন আকার ধারণ করিতে পারে আশঙ্কায় শ্রীশ্রীমহারাজকে এক খানা চিঠি লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি কৃপা করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

Bengalore City

26-9-21.

প্রিয়—তোমার ২২শে ও ২৩শে তারিখের বিস্তারিত পত্র পাইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। ইতিপূর্ব্বে আমাকে শরৎ মহারাজের সম্বন্ধে কেহই এই প্রকার বিস্তারিত ভাবে পত্রাদি দেয় নাই এবং সে জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া সকল সংবাদ জানিবার নিমিত্ত সান্যালকে একখানি পত্র দিয়াছি। যাহা হ'ক তোমার পত্রে details পাইয়া নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। তুমি প্রত্যহ একখানি করিয়া পোষ্টকার্ডে তাঁহার সকল সংবাদ দিয়া

আমায় নিশ্চিন্ত রাখিবে। চিকিৎসার এবং সেবাদির যেন কোনপ্রকার ত্রুটি না হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখিবে।

আমার শরীর ভাল আছে। ৫।৭ দিনের মধ্যে মাদ্রাজ যাইব। ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

Affly Yours—Brahmananda

ঠাকুরের কৃপায় শরৎ মহারাজ অল্পেই ভাল হইয়া উঠিলেন সত্য কিন্তু পায়ের বাত বাড়িয়া দিন কতক বেশ কষ্ট দিয়াছিল। বাতের ব্যাথার উপশম না হইতেই ললিতবাবু অসুখে পড়িলেন এবং প্রথম হইতেই তাঁহার অসুখ গুরুতর আকারে ধারণ করিল।

শ্রীললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ অনুগত শিষ্য ছিলেন। সুতরাং অসুখে পড়িতেই উদ্বোধন হইতে শরৎ মহারাজ তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিলেন। স্বামী উমানন্দ সেবক ও স্বামী পূর্ণানন্দ রোগীর অবস্থা নির্ণয়ে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় শরৎ মহারাজের শরীর বাতে কাতর থাকিলেও ১৮ই অক্টোবর বৈকালে তিনি ললিতবাবুকে দেখিতে গেলেন। পরদিন ১৯শে সকাল ৭টায় ললিতবাবু দেহ রক্ষা করিলেন।

যাঁহারা শরৎ মহারাজের স্নেহপ্রবণ উচ্চ হৃদয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন তাঁহারা জানিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর বা মায়ের সেবক ভক্তগণের জন্য শরৎ মহারাজের কত বেশী টান ছিল। তাহারই জন্য সেবক বা ভক্তগণের অসুখে বিসুখে, সুখে সম্পদে তিনি সকল অবস্থায় সম সহানুভূতি সম্পন্ন দিলেন। ললিতবাবুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরে

ললিতবাবুর অর্থের ও তাহার স্ত্রীর সকল রকম সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছিলেন।

মায়ের সেবক কিম্বা ঠাকুরের সেবকের জন্য অপর কাহাকেও এত উদ্বেগ ভোগ করিতে দেখি নাই যেমন স্বামী সারদানন্দকে দেখিয়াছি। স্বামী চিদানন্দ (গোঁসাই মহারাজ) কালাজ্বরে ভুগিতেছিল। গোঁসাই শ্রীশ্রীমহারাজের সেবক। সুতরাং তাহার জন্য শরৎ মহারাজ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং যাহাতে 'উদ্বোধনে' থাকিয়া তাহার চিকিৎসা হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। যেদিন গোঁসাইর অসুখ খুব বাড়িয়া গেল, সকলেই তাহার জীবনে হতাশ হইল, সে দিন গোঁসাই বায়না ধরিল—"হরিনাম করবো আর ডাব খাব;" কিছুতেই সে ইন্‌জেকৃশন্ লইবে না। তখন শরৎ মহারাজ আসিয়া গোঁসাইর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন —যেমন করিয়া ওঝা সাপের বিষ ঝাড়িয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হরিনাম করা আর ডাবের জল পান করার— বহু প্রশংসা করিয়া তবে তাহাকে তিনি ইন্‌জেকৃশন নিতে রাজী করিতে পারিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ বর্ষ

১লা জানুয়ারী। এই দিনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর স্মৃতি বিশেষ ভাবে জড়িত আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অসুখের মধ্যে এই দিনে কাশীপুরের বাগানে কল্পতরু হইয়াছিলেন। সেইদিন তিনি কৃপা করিয়া যাহাদের স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহারা ভাবের আতিশয্যে কেহ হাসিয়াছিল, কেহ কাঁদিয়াছিল, কেহ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল। ১লা জানুয়ারী শরৎ মহারাজের নিকটে থাকিলে এই দিনের কথা আমাদের বিশেষ ভাবে মনে হইত, যেহেতু এই কাহিনী আমরা শরৎ মহারাজের নিকটেই প্রথম শুনিয়াছিলাম।

আজ সকালে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলাম। তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার পরে তাঁহার নিকটে বসিলাম এবং অলক্ষ্যে বলিয়া ফেলিলাম,—'এই দিনে কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন।' শরৎ মহারাজ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—'সকাল থেকে আমারও সেই দিনের কথা মনে পড়ছিল। এতদিন ত গেল, কত কি দেখলাম কিন্তু কৈ তেমন শক্তির খেলা ত আর দেখতে পেলাম না। মানুষ যেমন একতাল মাটি নিয়ে যা ইচ্ছা তাই গড়তে পারে, ঠাকুরও মানুষের মন নিয়ে যেমন ইচ্ছা তেমন করে দিতে পারতেন।'

আমি বলিলাম,—'এই দিব্যভাব—দেবার মত শক্তি কি সকলেরই জন্মায় ?'

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'এরকম দিব্যভাবের বিকাশ ও সে ভাবে অপরকে ভরপুর করাবার ক্ষমতা এক আধিকারিক পুরুষেই সম্ভবে' বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ সময় তিনি স্নান করিয়া থাকেন জানিয়া আর কথা না বলিয়া নীচের ঘরে আসিলাম।

সন্ধ্যার পরে শরৎ মহারাজ নীচে আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে একজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শরৎ মহারাজ ভক্তটির কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভক্তটি সকল কথার উত্তর দিয়া শেষে বলিলেন,—'মহারাজ! ঠাকুর যে অবতার তাহা না হয় তাঁহার দিব্যভাব দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারি কিন্তু মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী সে কথা মনে আনিতে পারি না কেন ?' শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'ঠাকুরকে যদি ভগবান্ বলে বিশ্বাস করতেই পেরে থাক তবে এ সন্দেহ তোমার আসে কেন ?'

ভক্তটি শান্তভাবে বলিলেন,—'মহারাজ! আমার এ সন্দেহ কিছুতে দূর হইতেছে না।

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'তা হলে বল ঠাকুরকে অবতার বলে তোমার ঠিক ধারণা হয়নি।'

ভক্ত বিনীত ভাবে বলিলেন,—'না মহারাজ! ঠাকুরে সে বিশ্বাস আমার আছে।'

শরৎ মহারাজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—'তোমার তা হলে বিশ্বাস ভগবান একটি ঘুঁটে কুড়ানীর মেয়েকে বে করেছিলেন ?'

ভক্তটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। এবং আনন্দের সঙ্গে বলিলেন,—'আমার সংশয় দূর হইয়াছে, আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

শরৎ মহারাজ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অনেকেই শুনিয়াছিলেন। কিন্তু 'হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর' ঠাকুর যেমন বলিতেন,—'একটা দেয়াশালায়ের কাটিতে আলো হয়ে থাকে' তেমন ভক্তটির সংশয় এই এক কথাতেই দূর হইল অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন কিছু ঘটিয়াছিল যাহার জন্য ভক্ত আনন্দে বলিয়াছিলেন,—'মহারাজ আমার সংশয় দূর হইয়াছে' —বুঝিতে পারিলাম না।

আমরা দেখিলাম শরৎ মহারাজ উজ্জ্বল মুখে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। ভক্তের চোখ দুইটি আনন্দে মুদিতপ্রায় হইয়াছে। সে দিন কেহ আর কোন কথা বলিলেন না। যেন সকলেই ধ্যান মগ্ন, যেন বাহ্য-জগতের সহিত সকলেই সম্পর্ক হারাইয়া কেহই কোন কথা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। এমন সময় সন্ন্যাল মহাশয় আসিলেন. এবং স্বামী পূর্ণানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ডাক্তার মহারাজ চুপ চাপ বসে আছ যে?' স্বামী পূর্ণানন্দ বলিলেন,—'কথা হচ্ছিল এতক্ষণ।' শরৎ মহারাজ ধীরে ধীরে একটি চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ তোমার আসতে বিলম্ব হ'ল যে?' সান্ন্যাল মহাশয় বলিলেন, 'আমি ঠিক সময়ে এসেছি। তুমিই আজ সকাল সকাল নেবে এসেছ।' 'তা হবে' বলিয়া শরৎ মহারাজ অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। আমরাও ধীরে ধীরে উঠিয়া যে যাহার কাজে গেলাম।

সেদিন ১১ই জানুয়ারী শরৎ মহারাজ আহারের পূর্ব্বে আমাদের ডাকিয়া বলিলেন,—'শুনেছ কাল যে মহারাজ আসছেন ?' অর্থাৎ ভুবনেশ্বর মঠ হইতে শ্রীশ্রীমহারাজ বেলুড় মঠে আসিতেছেন। কথা শুনিয়া আমাদের মধ্যে কে কে হাবড়া ষ্টেশনে যাইবেন তাহা ঠিক হইয়া গেল। মহারাজ আসিতেছেন—এই শুভ সংবাদে ঠাকুরের ভক্ত—গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলেই পুলকিত হইলেন।

পরদিন ১২ই জানুয়ারী শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে শুভাগমন করিলেন। বৈকালবেলা শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিতে বেলুড়-মঠে গেলেন। মহারাজ গঙ্গার ধারে দোতালা বারাণ্ডায় বসিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ প্রথমে ঠাকুর ঘরে প্রণাম করিতে গেলেন। প্রণামান্তে নীচে নামিয়া আসিয়া শরৎ মহারাজ মহারাজকে দর্শন করিতে চলিলেন।

মহারাজ শরৎ মহারাজকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিলেন,—'এস শরৎ।' শরৎ মহারাজ অগ্রসর হইলেন এবং মহারাজের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর মহারাজ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নানা প্রসঙ্গে সময় কাটিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন।

বাতে সময় সময় অচল হইলেও শরৎ মহারাজ লোকের আপদে-বিপদে, আনন্দ-উৎসবে উপস্থিত থাকিতে যথা-সাধ্য উৎসাহী ছিলেন। এই বৎসরও আমরা শরৎ মহারাজকে স্থানে স্থানে গীতা-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে, রোগীর রোগশয্যা পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আনন্দ উৎসবে যোগদান করিতে দেখিয়াছি।

১৫ই জানুয়ারী শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ

মজুমদার মহাশয়ের জন্ম-তিথি উৎসবে ইটালী শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ে গমন করিলেন। ফিরিবার পথে কনিষ্ঠ ভ্রাতা চারুবাবুর কন্যাকে দেখিয়া আসিলেন। পরদিন সংবাদ পাইলেন চারুবাবুর কন্যাটি মারা গিয়াছে।

১৯শে জানুয়ারী বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীস্বামিজীর জন্মতিথি পূজা। শরৎ মহারাজ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। পূর্ব্বে ঠাকুরও স্বামিজীর উৎসবে শরৎ মহারাজ যেমন গান গাহিতেন ইদানীং আর গান গাহিতে পারিতেন না। সুতরাং স্বামিজীর উৎসব উপলক্ষে শরৎ মহারাজের গান যাহাদের পক্ষে লোভনীয় ছিল তাহারা এবৎসর হতাশ হইল। কেহ কেহ শরৎ মহারাজকে অনুরোধও করিয়াছিলেন। উত্তরে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন,—'ইচ্ছা যে আমারও হয় না তা নয় কিন্তু পারি কৈ, গলা যে একেবারেই বসে গেছে।' উৎসবের সময় প্রতি বৎসর তিনি যেমন দরিদ্র-নারায়ণের সেবা আনন্দমনে দর্শন করিতেন এবৎসরও তেমনই দর্শন করিলেন। তারপর লোক-চক্ষুর অন্তরালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর উৎসবান্তে উচ্ছিষ্ট হইতে কণা প্রসাদ প্রতিবৎসর যেমন ধারণ করিতেন এবৎসর ও তাহাই করিলেন। অন্যান্য বৎসর এদৃশ্য কেহ দেখিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু এবৎসর তিনি যখন কণা প্রসাদ ধারণ করিতেছিলেন তখন আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং পরে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'প্রতি বৎসরই ত এই রকম কণা প্রসাদ ধারণ করে থাকি।' সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহারাজকে প্রণাম করিয়া শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিবেন এমন সময় মহারাজ বলিলেন,—'একদিন

উদ্বোধনে ঠাকুর ও মাকে মাদ্রাজী রান্নায় ভোগ দিতে হবে।' শরৎ মহারাজ আনন্দের সহিত বলিলেন,—'তুমি যে দিন বল্‌বে সে দিনেই হবে। তোমায় কিন্তু সে দিন উপস্থিত থাকৃতে হবে।'

২৯শে জানুয়ারী শ্রীশ্রীমহারাজ সকালবেলা সদলবলে উদ্বোধনে আসিয়াছেন। আজ মাদ্রাজী রান্নায় ঠাকুরের ভোগ হইবে। শরৎ মহারাজ মহারাজকে প্রণাম করিয়া পার্শ্বে বসিয়াছেন, মহারাজের সেবকগণ মাদ্রাজী রান্না বান্না কারিতেছেন। মহারাজের শুভাগমনে উদ্বোধনে আনন্দের হাটবাজার বসিয়াছে। যথাসময় ভোগ নিবেদন হইল। শ্রীশ্রীমহারাজ ও শরৎ মহারাজ পৃথক ঘরে বসিয়া প্রসাদ পাইলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সদলবলে শ্রীশ্রীমহারাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন তাঁহারই যে শুভ জন্মতিথি পূজা মঠে সম্পন্ন হইবে।

৩০শে জানুয়ারী সকালবেলা শরৎ মহারাজ বেলুড় মঠে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমেই ঠাকুর ঘরে গেলেন। আজ কিন্তু তিনি তেমন অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিলেন না। অনেকক্ষণ ঠাকুর ঘরে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমিও চুপ করিয়া বসিয়া আছি, কখন তিনি উঠিবেন কখন যাইয়া মহারাজকে প্রণাম করিব। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে প্রণাম করিয়া শরৎ মহারাজ ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইলেন। যেমন গম্ভীর তেমনই দেখিতে পাইলাম। বিলম্বের কোন বাহ্যিক লক্ষণ তাঁহার মুখে দেখিতে পাইলাম না।

শরৎ মহারাজ উপরের বারাণ্ডায় আসিয়া মহারাজের দর্শন না পাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন মহারাজের

জনৈক সেবক শরৎ মহারাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'মহারাজ ঘরের মধ্যে আছেন।' অগ্রে শরৎ মহারজ পশ্চাতে উদ্বোধনের সাধুগণ আসিয়া দেখিলেন, মহারাজকে ভক্তগণ ফুলের মুকুট, ফুলের মালায় সুশোভিত করিয়াছেন। মহারাজ বসিয়া আছেন এবং মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছেন। শরৎ মহারাজ নতজানু হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তারপর কুশলাদি প্রশ্নের পর অনেক কথাই হইল। মহারাজ উঠিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন, পার্শ্বে শরৎ মহারাজ ভিন্ন আসনে বসিলেন, সাধু ও গৃহীভক্তগণ মহারাজকে প্রণাম করিয়া মহারাজের দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। সকলেরই ইচ্ছা মহারাজ কিছু বলেন। শরৎ মহারাজের সহিত নানা কথার পর মহারাজ ভক্তমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'সাধু হবে নিরৈশ্বর্য্য তবু ও যদি তাহার কিছু ঐশ্বর্য্য হয় তা, ঝর্‌ঝরে ত্যাগ ও তীব্র বৈরাগ্যই হওয়া উচিত।' জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহারাজ! গৃহীর কোন ঐশ্বর্য্য থাকা উচিত,—বিদ্যা, ধন, ভক্তি কোনটা?' উত্তরে মহারাজ বলিলেন,—'ভক্তি লাভ করা কি সহজ কথা, লোকে বিদ্যালাভ করতে পারে, ধনবান হতে পারে কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত ভক্তি কখনও লাভ হতে পারে না।' দর্শকগণের মধ্যে একজন মিহি গলায় আবৃত্তি করিলেন,—

ন ধনম্, ন জনম্, ন সুন্দরীম্, কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ি॥

মহারাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—'ও কথা মহাপ্রভুই (চৈতন্যদেব) বল্‌তে পার্‌তেন, যাঁর ভাবের আতিশয্যে জগৎ

ভুল হ'ত, এমন কি নিজ দেহের পর্য্যন্ত হুঁস্ থাক্‌ত না। মানুষের সকল ইন্দ্রিয় বহির্মুখীন; সাম্‌নে রয়েছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। বাসনার জন্য দেহধারণ, ভোগের জন্য স্বাভাবিক স্পৃহা এর মধ্যে থেকে,—ন ধনম্, ন জনম্ বলা মুখে সহজ হতে পারে, কাজে কিন্তু তা হয় না। যেমন লোকে স্বপ্নে এক কাঁদি, দুই কাঁদি, তিন কাঁদি কলা খেতে পারে কিন্তু তাতে পেট ভরে না।' দর্শকগণের মধ্যে কলার উপমায় কেহ কেহ হাসিয়া ফেলিলেন। মহারাজ ও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলেন। তখন শরৎ মহারাজ দর্শকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমরা নীচে কাজকর্ম্ম দেখগে এখন মহারাজকে একটু বিশ্রাম কর্‌তে দাও, বলিয়া মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিয়া নীচে আসিয়া চায়ের টেবিলে বসিলেন।

মহা সমারোহের মধ্য দিয়া উৎসব শেষ হইল। সন্ধ্যায় নিত্য যেমন উদ্বোধনে শরৎ মহারাজের বসিবার ঘরে বৈঠক বসিয়া থাকে আজও তেমনই বসিয়াছে। পণ্ডিত ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আজ বেলুড়ে গিয়াছিলেন। ক্ষীরোদ বাবু এবং উৎসবান্তে বেলুড় মঠ হইতে আগত কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। সন্ধ্যারতি শেষ হইবার পরে শরৎ মহারাজ নীচের ঘরে আসিলেন।

প্রথমে শ্রীশ্রীমহারাজের উৎসবের কথা আরম্ভ হইল। তারপর শ্রীশ্রীমহারাজের সম্বন্ধে ক্ষীরোদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঠাকুর মহারাজকে দেখে কেমন করতেন?' প্রশ্ন করিবার

পর ক্ষীরোদবাবুই বলিতে লাগিলেন,—'মহারাজকে দেখলে আমাদেরই আনন্দ যেন শতগুণে বেড়ে যায় ঠাকুর মহারাজকে দেখলে কি করতেন—?" শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—'মার মুখে যে আনন্দধারা সন্তানকে দেখে ফুটে উঠে তার জমাট আনন্দধারা যেন ঠাকুরের মধ্যে প্রকাশ পেত। মহারাজ নিজেই আনন্দময় পুরুষ, সুতরাং তাঁকে দেখে কারুর যে নিরানন্দ ভাব আসতে পারে তা ত মনে হয় না। মহারাজ যখন যেখানে থাকেন সেখানে যেন একটা আনন্দধারা দিনরাত বয়ে যাচ্ছে।' শরৎ মহারাজের এই কথায় ব্রাহ্মসঙ্গীতের গানের একটি কলি মনে পড়িয়া গেল,—'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা।'

শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল নিত্য যেমন আসিয়া থাকেন আজও তেমনই উদ্বোধনে আসিলেন এবং শরৎ মহারাজের পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তখন সান্ন্যাল মহাশয় নূতন করিয়া মঠে উৎসবের কথা আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

উৎসবের দুই দিন পরে শ্রীশ্রীমহারাজ কলিকাতায় আসিলেন এবং কিছুদিন স্বর্গীয় বলরামবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২৪ ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রি। পূর্ব্বে এই দিনে শরৎ মহারাজকে সমস্ত রাত্রি পূজা ও গানে অতিবাহিত করিতে দেখিয়াছি। এ বৎসর বাতের ব্যথায় বারংবার আক্রান্ত হওয়ায় শিব-রাত্রিতে দুইবার আসিয়া (উদ্বোধনের) ঠাকুর ঘরে বসিলেন, সেও অল্প সময়ের জন্য।

২৮শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম তিথি পূজা। এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্য করিয়া পোর্ট কমিশনার বেলুড়ে 'ফেরি ষ্টীমার ঘাট' খুলিলেন। এই ঘাট বেলুড়ে খোলাইবার জন্য ললিত চট্টোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিলেও ঘাট খুলিবার পূর্ব্বেই কিন্তু তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ তিথি পূজায় যোগদান করিতে ষ্টীমারে মঠে আসিলেন। ষ্টীমার হইতে নামিবার সময় 'জেটি' নীচু থাকায় পায়ে বেশ চোট পাইয়াছিলেন। পরদিন পায়ে বেদনা বাড়িয়া উঠিল।

৫ই মার্চ্চ ঠাকুরের উৎসব দিন। এ দিনে লক্ষ লোক বেলুড় মঠে আগমন করিয়া কীর্ত্তন, ঠাকুর দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকে।

শরৎ মহারাজ বেলা প্রায় সাড়ে বারটার সময় ষ্টীমার যোগে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ঠাকুর ঘরে গেলেন, পরে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া নীচে আসিয়া চায়ের টেবিলে বসিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় তিনটার সময় সমগ্র মঠ ভূমি একবার বেড়াইয়া দেখিলেন এবং অবশেষে যেখানে ভক্তগণ একসঙ্গে প্রসাদ পাইতেছিলেন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বেচ্ছাসেবক ও মঠের সাধুগণ 'শ্রীগুরু মহারাজ-জীকী জয়' বলিয়া শরৎ মহারাজের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। শরৎ মহারাজের রোজ নামচায় লেখা আছে,—Sri R. K. anniversary celebration day, went to Belur Math by Steamer at 12-10, P. M. and returned by motor at 4-20 P. M. by kindness of Sailen &

Dwijen Banerjea অর্থাৎ বাৎসরিক শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব দিন। বেলা ১২টা ১০মিঃ ষ্টীমারে বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। শৈলেন ও দ্বিজেন বন্দোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তাদের মোটর গাড়ীতে বৈকাল ৪টা ২০মিঃ সময় মঠ হইতে রওনা হইলাম।

প্রচলিত প্রথানুসারে ঠাকুরের উৎসবান্তে বেলুড় মঠে—মঠ ও মিশন কর্ত্তৃপক্ষের বাৎসরিক সভা বসিয়া থাকে। এ বৎসর শরৎ মহারাজকে পায়ের ব্যাথা লইয়াই বেলুড় মঠে আসিতে হইল। দায়ীত্ববোধ জিনিষটি তাহাতে অদ্ভুত ছিল। ট্রাষ্টীর সভা হইয়া গেল মহারাজও কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়ীতে আসিলেন। এ যাত্রায় ৪।৫ দিনমাত্র কলিকাতায় ছিলেন। মহারাজ কলিকাতায় থাকিলে শরৎ মহারাজ প্রায় নিত্য মহারাজকে দেখিতে আসিতেন। উদ্বোধনের সকলে যাঁহার যে সময় সুবিধা হইত তিনি সে সময় মহারাজকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। এক স্বামী পূর্ণানন্দ 'আসন সিদ্ধি' ছিলেন অর্থাৎ কোথায়ও যাইতেন না। সে দিন বৈকালে (১৮ই মার্চ্চ) শ্রীশ্রীমহারাজ দোতালার ছাঁদে বেড়াইতে ছিলেন, আমি সেখানে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন পায়চারী করিতেছিলেন।

ছাদের এক পার্শ্বে মহারাজের সেবক শ্রীমান্ গোঁসাই (স্বামী চিদানন্দ) ও ঈশ্বর (স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ) বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট যাইতেছিলাম এমন সময় "শোন জ্ঞানানন্দ" বলিয়া মহারাজ আমাকে ডাকিলেন। আমি দ্রুত মহারাজের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি পায়চারী

করিতে করিতে কথা আরম্ভ করিলেন, আমি তাঁহার পার্শ্বে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। মনে তাঁহার কি ছিল জানিনা কিন্তু কথাগুলি তিনি দুঃখ করিয়াই বলিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে বলিলেন,—"এ কথা তুমি কিন্তু কাউকে বল না।' তারপর বলিলেন,—'কাল মঠে যাচ্ছি, তিন দিন থেকে আবার আসছি।' কথা শেষ না হইতে শরৎ মহারাজ ও কৃষ্ণলাল মহারাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ কথা শেষ করিয়া 'এস শরৎ', 'এই যে কেষ্টলাল' বলিয়া উভয়কে আপ্যায়িত করিলেন। তারপর 'চল নীচে যাচ্ছি' বলিয়া অগ্রে মহারাজ চলিলেন পশ্চাতে শরৎ মহারাজ ও অন্যান্য সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন।

রাত্রিতে (উদ্বোধনে) শরৎ মহারাজের সহিত দেখা হইল। তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহারাজের সঙ্গে আজ কি কথা হচ্ছিল?' বিনীত ভাবে বলিলাম,—'মহারাজ সে কথা বলতে বারণ করেছেন।' অপর কেহ হইলে কত প্রশ্ন হইত 'এমন কি কথা ইত্যাদি' কিন্তু শরৎ মহারাজ বলিলেন,— 'তাত জান্‌তেম না।' মুখে সেই স্নেহের ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। কারণ শরৎ মহারাজের নিকট যাঁহারা থাকিতেন শ্রীশ্রীমহারাজ, শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের কাহাকেও 'স্নেহ করেন, পছন্দ করেন দেখিলে তিনি যে কতদূর খুসী হইতেন তাহা যাঁহারা এই রকম অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ ২০শে মার্চ্চ মঠ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল বেলা বলরামবাবুর বাড়ী

হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি উদ্বোধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজ নীচে আসিয়া মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেলেন।

পরদিন ২৪শে মার্চ্চ সকালে শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম দুই জন দেশী পুলিশের বড় কর্ম্মচারী মহারাজের দর্শনে আসিয়াছেন, মহারাজও তাঁহাদের সঙ্গে ভগবদ্ প্রসঙ্গে নানা কথা বলিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তখন আমি শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট আমাকে মঠের ট্রাষ্টীপদ হইতে রেহাই দিবার প্রার্থনা করিলাম। অনেক কথার পরে তিনি দয়া পরবশ হইয়া বলিলেন,—'আমি কারুরভাবে আঘাত দিতে চাই না, তা আমি ওদের বলে দিব'। অর্থাৎ আমাকে রেহাই দিলেন। ইহার পর মহারাজ উঠিয়া শৌচে গেলেন।

তারপর মহারাজ দুইবার শৌচে গমন করিলেন এবং শেষ বার ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন,—'গোঁসাইকে ডেকে দাও, সে এসে আমায় একটু হাওয়া করুক, পেটটা খারাপ হয়েছে।' আমি তৎক্ষণাৎ গোঁসাইকে ডাকিয়া দিয়া ঘরের দরজাগুলি ভেজাইয়া দিলাম। মহারাজ শয়ন করিলেন, আমি উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলাম। বেলা ২টার সময় সংবাদ আসিল শ্রীশ্রীমহারাজ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। শরৎ মহারাজ সে সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলরাম বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে উদ্বোধনের প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজের রোজ নামচায় লেখা আছে,—Sri Maharaj feeling indisposed—laid

up with cholera since 11 a. m. (noon) শ্রীমহারাজ অসুস্থ—বেলা ১১টার সময় কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন। ২৫শে—মহারাজের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন ছিল। ২৬শে সেই রকম। ২৭শে একটু আশাপ্রদ। ২৮শে—প্রস্রাব হইয়াছে। অবস্থা অনেকটা ভাল। ২৯শে—মহারাজ ভাল আছেন। ৩০শে কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি দেখিয়া ব্যবস্থা করিলেন।

এই জীবন মরণ সন্ধিক্ষণেও রঙ্গপ্রিয় মহারাজ রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—'হেকিমিটাই বা বাদ থাকে কেন!' আর বলিয়াছিলেন,—'শিব সত্য, ঔষধ মিথ্যা।' ৩১শে মার্চ্চ —মহারাজ শ্যামাধানের চাউলের মণ্ড আহার করেন। ১লা এপ্রেল মহারাজের প্রস্রাবে চিনি প্রতি আউন্সে ৮ গ্রেণ ধরা পড়িল। ২রা মহারাজের প্রস্রাব প্রতি আউন্সে ১৪ গ্রেণ চিনি বৃদ্ধি পাইল—মহারাজের অবস্থা আশঙ্কাজনক দাঁড়াইল। ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারকে ডাকা হইল। ৩রা—মহারাজের প্রস্রাবে ২১ গ্রেণ চিনি ধরা পড়িল। ডাক্তার সরকারের চিকিৎসা আরম্ভ হইল। এই সময় মহাপুরুষ ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ৪ঠা—পূর্ব্বদিনের ন্যায় কাটিয়া গেল। ৫ই—মহারাজের জ্বর গাত্রদাহ পিপাসা বৃদ্ধি পাইল অবস্থা ভয়প্রদ হইল। ৬ই—কবিরাজ শ্যামাদাস আসিলেন অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। ৭ই—মহারাজের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। প্রায় সমস্ত দিন এবং রাত্রের কতক অংশ শরৎ মহারাজ মহারাজের নিকটে বসিয়া রহিলেন। ৮ই এপ্রেল—সকালে শরৎ মহারাজ আসিয়া মহারাজের শয্যার পাশে বসিয়াছেন নানা কথার পরে মহারাজ বলিলেন,—'শরৎ

তুমি থাকতে আমায় যেতে হল?' শরৎ মহারাজ অবাক হইয়া মহারাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি আমাদের নিকট অনেক বার বলিয়াছেন,—'একথা মহারাজ কেন যে বলেছিলেন তা আজও বুঝতে পারলেম না।' দিনের অধিকাংশ সময় বলরাম বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন। আমরা তখন ও মহারাজের নিকটেই ছিলাম।

সন্ধ্যার পরে ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমহারাজ স্নিগ্ধ মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—'কমলেকৃষ্ণ' 'একটি ছোট ছেলে কচি হাত খানা দিয়ে পিঠে হাত বুলাচ্ছে, বলছে, আয়।' 'বিশ্বাসের পত্রে ভেসে যাচ্ছি।' 'আমার কেষ্ট কষ্টের কেষ্ট নয়—রামকেষ্ট।' ইত্যাদি।

সন্ধ্যার অনেক পরে উদ্বোধনে ফিরিয়া শরৎ মহারাজকে যখন সকল কথা বলিলাম, তখন যোগীন মা বলিয়া উঠিলেন,—'শ-র-ৎ মহারাজ আর থাকছেন না। মহারাজ নিজের স্বরূপ যে জেনে ফেলেছেন!' শরৎ মহারাজ গম্ভীর ভাবে শুধু 'হুঁ' বলিলেন। আমরা তাঁহাকে নীরব দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় সংবাদ আসিল,—মহারাজ শরৎ মহারাজকে স্মরণ করিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া শরৎ মহারাজের সহিত আমরাও মহারাজকে দেখিতে গেলাম।

বেলুড় মঠ হইতে বলিষ্ঠ সেবাপরায়ন যে সকল সাধু মহারাজের সেবার জন্য আসিয়াছেন—তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে অন্য কোন শিষ্য সেবকের পক্ষে বলরাম বাবুর

বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিবার স্থান ছিল না। তাহারই জন্য যাঁহারা সেবা করিতেন না কিম্বা রাত্রের সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিলেন না তাঁহাদিগকে হয় উদ্বোধনে নতুবা শ্রীযুত হরিপদ দত্তের বাড়ীতে অথবা অন্য কোথায় ও স্থান লইতে হইয়াছিল। এই জন্য এবং বাতের বেদনার জন্য শরৎ মহারাজকে নিত্য উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিতে হইত।

শরৎ মহারাজ সোজা আসিয়া মহারাজের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন মহারাজ ভাবে মাতোয়ারা হইয়া নানা অতীন্দ্রিয় দর্শনের কথা বলিতেছেন এবং একে একে সেবক-গণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই কথাই মহারাজের শেষ কথা বলা। ৯ই এপ্রেল সকাল হইতে দেখা গেল মহারাজের গলায় ঘা হইয়াছে, গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কথা বলা এক বারেই বন্ধ হইয়াছে। তারপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণণাতীত হৃদয় বিদারক। এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মহারাজ পান করিতে পারেন নাই গলায় জল লাগিলে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। এই ভাবে রবিবার ও ১০ই এপ্রেল সোমবার সমস্ত দিন গত হইল। সন্ধ্যার পর ৮-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীমহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলিত হইলেন, মঠের ভাগ্যগগণে অমানিশা আগত হইল। ১১ই এপ্রেল রবিবার সকাল বেলা মঠের সাধুগণ শ্রীশ্রীমহারাজের পূত দেহ মঠে লইয়া গেলেন। শরৎ মহারাজের রোজ নামচায় লেখা আছে, To Belur Math with the procession and then the end of the material form, Return to Calcutta at

4·30 p, m, অর্থাৎ বেলুড় মঠে মহারাজের যাত্রা ; অগ্নিতে দেহের শেষ, কলিকাতায় ফিরিতে সাড়ে চারিটা।

শ্রীশ্রীমায়ের লীলাবসানে মহারাজ সকলের আশ্রয় স্থল ছিলেন। তখন আমরা শরৎ মহারাজের কাছে কোন নিরাশার কথা শুনি নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীমহারাজের মহা প্রস্থানের পর হইতে কথায় কথায় শরৎ মহারাজ বলিতেন,—'মা গেলেন, মহারাজও গেলেন, এখন থেকে তোমরা দেখে শুনে কাজ কর্ম্ম করগে, আমি বাপু, আর কিছু করতে পারব বলে ত মনে হয় না।' ইদানীং শরৎ মহারাজের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা শ্রীকৃষ্ণ বিহনে অর্জ্জুনের অবস্থার অনুরূপ হইয়াছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দ বহুপূর্ব্বে বলরাম বাবুর বাড়ীতে একদিন শরৎ মহারাজকে—মঠের কার্য্য সম্বন্ধে সভা করিয়া কোন ব্যবস্থাদি—কোন আলোচনা হয় না, ইত্যাদি অনুযোগ করায় উত্তরে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"তুমি আমি সকলেই যখন মহারাজকে মানি তখন সভা করে কি হবে ?" তখন অল্পদিন মাত্র মঠে যোগ দিয়া থাকিলেও এই কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ যেন বেদের সেই অদ্বয় পুরুষ যাঁহার সম্বন্ধে ঋষি বলিতেছেন,—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

তখন ও জানিতামনা শ্রীশ্রীঠাকুরই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন কাহার কোথায় স্থান। কে অন্তরঙ্গ—কে বহিরঙ্গ, কে ঈশ্বর কোটি—কে এ দলের নহে—কে অখণ্ডের ঘর। পরে এই সকল কথা লীলাপ্রসঙ্গে কতক পড়িয়াছি—এবং প্রাচীন সাধুগণের

নিকটেও কতক অবগত হইয়াছি। কিন্তু 'কে ঠাকুরের ঘরের নহেন'—অর্থাৎ কে বহিরঙ্গ একথার মৌখিক আলোচনা কখন শরৎ মহারাজের নিকট শুনি নাই। কিন্তু কাজে দেখিয়াছি তিনি প্রথমে মহারাজ পরে বাবুরাম মহারাজ তারপর অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠকে মান্য দিয়াছেন—খোকা মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি বয়ঃকনিষ্ঠগণের সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যগণকে তিনি অন্তরের সহিত সপ্রেম শ্রদ্ধা ও করিতেন ভাল ও বাসিতেন।

১৯০৮ সাল হইতে শরৎ মহারাজের প্রতি কথায় আচার ও ব্যবহারে বুঝিয়াছি,—মঠ ও মিশন বলিতে শ্রীশ্রীমহারাজকে বুঝাইয়া থাকে। মহারাজ কিন্তু পারত পক্ষে মঠের ব্যবস্থা নিজে করিতেন না। প্রথমে তাহা পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ পরে পূজনীয় মহাপুরুষের উপর ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মিশনের কাজ সর্ব্বদার জন্য ন্যস্ত ছিল শরৎ মহারাজের উপরে। শ্রীশ্রীমহারাজকে যে সর্ব্বাগ্রে মান্য দিতে হইবে—তাঁহার অসন বসন তাঁহার সেবা যে সকলের অগ্রে একথা আমরা শিখিয়াছি তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের সশ্রদ্ধ সপ্রেম আচরণ দেখিয়া।

শরৎ মহারাজ চিরদিন মহারাজের শ্রীপাদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন। একদিন ঐ স্থূলকায় মানুষটিকে হাটু পাতিয়া প্রণাম করিতে দেখিয়া বড় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। কর্ম্মে কোলাহল উঠিলেই মহারাজ চাহিতেন শরৎ মহারাজের উপস্থিতি। শরৎ মহারাজকেও দেখিয়াছি কর্ম্ম কোলাহলে মহারাজ বিব্রত হইবেন বুঝিলেই ছুটিয়া আসিতেন তাঁহারই পাশে।



স্বামী ব্রহ্মানন্দ　　　　স্বামী সারদানন্দ

ইহার বেশী দেখিবার মত চক্ষু আমাদের ছিল না। মঠে মহারাজের আহারের পরে আমরা সকলে মিলিয়া মহারাজের প্রসাদ আনন্দ করিয়া খাইতাম। এ আনন্দের ভাগ বাটোয়ারাতে শরৎ মহারাজ 'আমাকে একটু প্রসাদ তোমরা দিলে না' বলিয়া কখন কখন আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইতেন। শরৎ মহারাজের কথায় কাজে ইহা বেশ বুঝিয়াছি—তিনি মহারাজ ও ঠাকুর যে অভেদ এবং মহারাজের প্রসন্নতা যে ঠাকুরেরই প্রসন্নতা তাহা উপলব্ধি সহায়ে জ্ঞাত ছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে যে বৎসর কন্যাকুমারী দর্শন করিয়া উদ্বোধনে ফিরিলাম সে সময় শরৎ মহারাজ একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'মহারাজকে কেমন দেখলে?'

উত্তরে বলিয়াছিলাম—'দেখলাম—'আপনাদের মত তাঁর কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। তাঁর সেবা করতে হলে মতলব ছেড়ে যখন তিনি যেমন বলবেন—তেমনটি করতে হবে। আপনাদের বেশ সুনিয়ন্ত্রিত (Routine life) জীবন কিন্তু মহারাজের কোন বিষয়ে নিয়মও দেখলাম না ভাবের মধ্যে 'ইতি' ও করেন না। খাওয়া দাওয়াতে পর্য্যন্ত এক ঘেয়ে ভাব নাই। তিনি আপনাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ।' এই কথাতে দেখিলাম তিনি প্রসন্ন হইলেন এবং পরক্ষণেই বলিলেন,—'তাহলে তুমি মহারাজকে লক্ষ্য করে দেখেছ!' বাহ্যিক দেখা আবার দেখা। যদি ভিতরের মানুষকে না দেখিলাম। তাই কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। আজ কিন্তু মনে হইতেছে,—আমাদের মহা সৌভাগ্য তাই এমন জন কতক লোক

দেখিয়াছিলাম যাঁহাদের মন বুদ্ধিতে ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

শ্রীশ্রীমহারাজের দেহ রক্ষার পরে ট্রাষ্টীর সভায় স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠ ও মিশনের নব অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে সঙ্ঘের সাধু ব্রহ্মচারীদের মত জানিবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহাতে শরৎ মহারাজ আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু মহাপুরুষ ও অপরাপর ট্রাষ্টীগণের মত হওয়ায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং পরদিন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখা কেন্দ্রে এই মর্ম্মে পত্র যাইতে লাগিল,—ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহারা কাহাকে মঠাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিতে চাহেন তাহা মঠে জানাইবেন।

যথাসময়ে সকল কেন্দ্রের সাধুগণের অভিমত মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার কয়েকদিন পরে ২রা মে মঙ্গলবার বেলুড় মঠে অধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের জন্য ট্রাষ্টীগণের সভা বসিল। মহাপুরুষ সভাপতির পদে বসিয়াছেন। নানা কথাবার্ত্তার পরে শাখাকেন্দ্রের সাধুগণের অভিমত ট্রাষ্টীগণ সম্মুখে পঠিত হইল। স্বামী শুদ্ধানন্দ সবিস্ময়ে দেখিলেন—স্বামী সারদানন্দ শতকরা প্রায় ৯৫টি ভোট পাইয়াছেন। তন্মধ্যে হরি মহারাজ, বুড়ো বাবা, কেদার বাবা প্রভৃতিও আছেন। যখন এই অধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের কাগজ পড়া হইতেছিল তখন শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে ধমক দিয়া বলিতেছিলেন,—'ও সকল রেখে দাও।' মহাপুরুষ কিন্তু বলিতেছিলেন,—'পড়, পড়।' যখন পড়া শেষ হইল এবং অধিকাংশ সাধুর অভিমত জানিবার সুবিধা হইল

তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—'সকলেই যখন শরৎকে চায় তখন শরৎ প্রেসিডেণ্ট হউক।' কিন্তু শরৎ মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—'স্বামিজী আমাকে মঠের সেক্রেটারী করে গেছেন আমি সে পদ ত্যাগ কর্‌ব না।' তারপর বলিলেন,—"আমি ত আছিই যখন যে কাজ পড়বে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিলেই চল্‌বে" বলিয়াই তিনি প্রস্তাব করিলেন,—'স্বামী শিবানন্দ মঠের অধ্যক্ষ হউন।' ট্রাষ্টিগণ একথায় নীরব রহিলেন। শেষ যখন সকলেই বুঝিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ হাতে পাইয়াও স্বামী সারদানন্দ উহা গ্রহণ করিতে নারাজ তখন বাধ্য হইয়া সকলেই শরৎ মহারাজের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ইদানীং শরৎ মহারাজের বড় কাজ হইয়াছে,—জয়রাম বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে মন্দির নির্ম্মান কার্য্য। এই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের তদারকের ভার শরৎ মহারাজ স্বামী উমানন্দের উপরে অর্পণ করিয়া ১৪ই জুন তাহাকে জয়রামবাটী পাঠাইয়া দিলেন। এই মন্দির নির্ম্মান কার্য্যে অর্থ সংগ্রহ করিতে শরৎ মহারাজকে অনেক শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। তখন তাঁহার সেবার জন্য কেহ অর্থ প্রদান করিলে তাহাও তিনি জয়রামবাটী মন্দির তহবিলে প্রদান করিতেন। সর্ব্বদা একটা ভাবনা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল—কেমন করিয়া মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ হইবে।

শরৎ মহারাজ তাঁহার গত জীবনের ঘটনায় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—আমেরিকায় যখন ক্লাস কর্‌তাম্ তখন মনে

মনে ভাবতাম ঠাকুরকে শোনাচ্ছি। তিনি সামনে বসে আছেন তাঁকে নিবেদন করবার জন্যই যেন বলে যেতাম।'

কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেন,—'ঠাকুর, স্বামিজীর দিকে চেয়ে আজীবন কাজ করে যাচ্ছি, লোকে কি বললে না বললে তা কোনদিন দেখবার সময় ঘটে উঠেনি।' শরৎ মহারাজ সকল কাজই যে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া করিতেন এই কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

সুতরাং বাহ্যিক লক্ষণে আমরা তাঁহার উদ্বেগের কারণ লক্ষ্য করিলেও অন্তরে অন্তরে তিনি যে নিঃসন্দিহান ছিলেন, তিনি যে কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিবেন তাহাও তাঁহারই কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কথায় কথায় বলিতেন,—'মার মন্দির নির্ম্মান হয়ে গেলে তখন কোন কাজ থাকবে না।' অর্থাৎ মায়ের মন্দির নির্ম্মান ও প্রতিষ্ঠা করিয়া তবেই আমার বিশ্রাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের মহাপ্রস্থানের পরে শরৎ মহারাজ কাজ ধ্যান জপে বেশী সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দিনগুলি একভাবে কাটিতেছিল। এমন সময় কাশীধাম হইতে হরি মহারাজের পৃষ্ঠে ব্রণ হইয়াছে সংবাদ" আসিল। আমি তখন কুমিল্লায় ছিলাম। হরি মহারাজের অসুখের সংবাদ জানিয়াই শরৎ মহারাজকে লিখিলাম,—'আপনি হরি মহারাজকে দেখিতে কাশী রওনা হইলে আমি আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।' সেই পত্রের উত্তরে তিনি লিখিলেন,—

শ্রীশ্রী৺জয়তি

কলিকাতা
১২।৭।২২

কল্যাণবরেষু—

তোমার ৮।৭।২২ তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। হরি মহারাজের সারিবার আশা ডাক্তারেরা কিছুমাত্র দেয় না। অতএব যাইয়া আর কি করিব। গত মঙ্গলবার কাঞ্জিলালকে পাঠাইয়াছিলাম। সে গত কল্য ফিরিয়াছে। পিট্ জোড়া Curbuncleটি অস্ত্র করিয়া আসিয়াছে তাহাতে কিছু জ্বর কমিয়াছে কিন্তু পেট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ও গায়ে রক্ত নাই, দুর্ব্বল এত যে কথা কহিতে কষ্ট হয়—অল্প কথাই কহেন।

অনুকূল বাবুর অসুস্থতার বিষয় জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। চুনী যাইলে (বায়ু পরিবর্ত্তনে) কুমিল্লা স্কুলের জন্য শিক্ষয়িত্রীর জোগাড় করা ও এক ভাবনা। শ্রীমতী রেণুর M. A. পড়া সুবিধা হইলে অবশ্য মন্দ নহে। তবে চিরকালই আর কত পড়িবে—তাহার ইচ্ছা আছে ত? এখানকার কুশল। প্রফুল্ল ঢাকা গিয়াছে বোধ হয়। রাসবিহারী (অরূপানন্দ) এখানে আসিয়াছে। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

ইদানীং শরৎ মহারাজের দেহই যে অপটু হইতেছিল তাহা নহে। মনও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কোন কাজে পূর্ব্বের উৎসাহ

দেখিতে পাইতাম না। কথায় কথায় বলিতেন,—'মা চলে গেলেন, মহারাজ ও চলে গেলেন ; কোন কাজেই যেন উৎসাহ পাই না প্রবৃত্তিও জাগে না।'

আমরা মহাভারতে পড়িয়াছি, কৃষ্ণ বিহনে সব্যসাচী গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই। গাণ্ডীব গুরুভার বলিয়া বোধ হইত। যাহা ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম তাহা স্বামী সারদানন্দ প্রত্যক্ষ করিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁহার কর্ম্ম পটু মন ও ইন্দ্রিয় বাহ্যিক বস্তু সকল ত্যাগ করিয়া দিন দিন অন্তরের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছিল। তাহারই জন্য কর্ম্মে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি কোনটাই যেন জাগিতে পারিত না।

শরৎ মহারাজের মনের যখন এই প্রকার অবস্থা সেই সময় একদিন কাশীধাম হইতে পত্র পাইলেন। তাহাতে লিখা ছিল, ২১শে জুলাই বৈকাল ৬-৪৫ মিনিটের সময় বেদান্তের একনিষ্ঠ সিদ্ধ সাধক স্বামী তুরীয়ানন্দ শ্রীবিশ্বেশরের পাদ পদ্মে মিলিত হইয়াছেন।

স্বামিজী-গত প্রাণ শরৎ মহারাজ ও হরি মহারাজ বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ডের সিদ্ধ সাধক ছিলেন। কর্ম্ম মূর্ত্তি শ্রীস্বামিজীর অনুশরণ শরৎ মহারাজ চির দিন কর্ম্মের মধ্যে দিয়া করিয়াছেন। জ্ঞান মূর্ত্তি শ্রীস্বামিজীর অনুসরণ হরি মহারাজ স্বাধ্যায়, ধ্যান, ধারণা, সমাধির মধ্য দিয়া করিয়াছেন। হরি মহারাজ ছিলেন স্বামিজীর ভাবে ভরপুর। শরৎ মহারাজ ছিলেন স্বামিজীর ভাবরাশীকে কর্ম্মের মধ্য দিয়া মূর্ত্ত করিবার প্রধান হোতা। দুই জনেই স্বামিজীর ভাবে উচ্ছলিত, দুই

জনেই স্বামিজীর ভাবে ভরপুর তাই দুই জনের মধ্যে প্রীতি এত দৃঢ় ছিল, ভালবাসা এত আন্তরিক ছিল।

শ্রীশ্রীমহারাজের মহাপ্রস্থানের পরে এক বৎসর ঢাকা মঠে ছিলাম। সেই সময় শরৎ মহারাজের পত্রে জানিলাম ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত, ডাক্তার কাঞ্জিলাল দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

ইং ১৯২৩ খ্রীঃ ভাদ্র মাসে উত্তর বঙ্গে যে বন্যা হইয়াছিল শরৎ মহারাজের আদেশে আমাকেও ঢাকা হইতে বন্যার সেবা কার্য্যে যাইতে হইয়াছিল। সেবা কাজ শেষ হইবার পরে উদ্বোধনে আসিয়াছিলাম এবং শরৎ মহারাজের আদেশে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পূজা পর্য্যন্ত উদ্বোধনে ছিলাম। উৎসবান্তে শরৎ মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঢাকা মঠে ফিরিয়া আসিলাম।

ষোড়শ বর্ষ

ঢাকা মঠে আছি। শরৎ মহারাজের পত্রে জানিলাম তিনি ২৯শে জানুয়ারী কাশীধামে যাত্রা করিবেন। বঙ্গ দেশে থাকিয়াও তাঁহার সহিত কাশী যাইতে পারিলাম না ভাবিয়া মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কর্ম্ম যে বন্ধনের কারণ ইতিপূর্ব্বে কখনও ইহা স্বীকার করি নাই, মনেও কখন জাগে নাই। কিন্তু এখন মনে আসিতে লাগিল,—কাজ লইয়া ঢাকাতে না আসিলে ত এমন হইত না!

শরৎ মহারাজ কাশীতে আছেন, মহাপুরুষও আসিয়াছেন। এই সময় কাশী আশ্রমে যে আনন্দোৎসব চলিয়াছে তাহা কল্পনায় অনুভব করিলাম কিন্তু লুব্ধ মন সে সুখ সায়রে অবগাহন করিয়া ধন্য হইতে পারিল না।

ঢাকার কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে নানা রকম গোলমালের আশঙ্কা দেখিয়া শরৎ মহারাজকে সমস্ত কথা নিবেদন করিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কাশীধাম। অদ্বৈতাশ্রম

২৫শে মাঘ ২৯।

পরম কল্যাণীয় ভূমানন্দ,

তোমার ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

শিবানন্দ স্বামী কনখলে গিয়াছেন ৺শিবরাত্রির পূর্ব্বেই ফিরিবেন, ফিরিলে তাঁহাকে ঐ পত্র দেখাইব। * * * তোমার plan সম্বন্ধে আমার অভিমত চাহিয়াছে। আমি মোটের উপর বলিতেছি উহা আমার মন্দ মনে হয় নাই, তবে তোমার ত জানাই আছে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর, ও শ্রীশ্রীমহারাজের দেহ রক্ষার পর হইতে আমি কার্য্য সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন হইয়া রহিয়াছি। কারণ ঐ বিষয়ে মন যায় না—ত কি করিব? যদি ঠাকুরের ইচ্ছায় আবার কর্ম্ম প্রবৃত্তি আসে ত দেখা যাইবে। * * * এখানে আসিয়া আমরা একটু ভাল বোধ করিতেছি। যোগীন মা, আমার, সান্ন্যাল মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

এই পত্র পাইবার পরে পারত পক্ষে শরৎ মহারাজকে কাজের কথা বলিয়া বিরক্ত করিতাম না। তিনি ও কর্ম্মের বিষয়ে কিছু লিখিতেন না। ইতি মধ্যে একবার ৪।৫ দিনের জন্য কুমিল্লায় যাইতে হইল। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে কুমিল্লা হইতে ফিরিয়া ঢাকা মঠে আসিয়া শরৎ মহারাজের আশীর্ব্বাদ পত্র পাইলাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কাশীধাম। লাক্‌সা

১০ই চৈত্র, ২৯।

কল্যাণবরেষু,

তোমার ২১শে তারিখের চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। কুমিল্লা

যাইবার কথা সরলা ও রেণুকণার পত্রে জানিয়াছিলাম। * * * মহাপুরুষ তোমাকে কোন কিছু লিখেন নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি এখন ভুবনেশ্বরে গেছেন। তোমার দিদিকে যেখানে লইয়া গেলে উপকার হইবে বুঝিবে সেখানে লইয়া যাইবে বই কি। তদ্‌বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা বাহুল্য। * * * তুমি আমার ও যোগীন মার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার চিঠিখানা মহাপুরুষকে পাঠাইয়া দিতেছি। কারণ উহা পড়িলে তাঁহার ঐ বিষয় স্মরণ হইবে এবং তোমাকে ঢাকার কার্য্যাদি যাহা হয় লিখিতে পারেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

পুঃ—আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জয়রামবাটীর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করিয়াছি। আগামী শুক্রবার ১৬ই তারিখ এখান হইতে কলিকাতা রওয়ানা হইবার ইচ্ছা এবং কলিকাতা হইতে সমস্ত যোগাড় যন্ত্র করিয়া চৈত্রের শেষাশেষি কিম্বা বৈশাখের প্রথমে জয়রামবাটী যাইব মনে করিয়াছি। ইতি—

শ্রীসাঃ

সুতরাং শরৎ মহারাজের চিঠিতেই প্রথম জানিলাম, অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে (বৈশাখ মাসে) জয়রামবাটী গ্রামে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে নানারকম জল্পনা কল্পনা ঢাকা মঠে চলিতে লাগিল। ঢাকা হইতে কে কে যাইবে তাহাও প্রায় ঠিক হইল শুধু আমিই মীমাংসা করিতে পারিলাম না—যাইব কি যাইব না। নানা কারণে তখন ঢাকা মঠ ছাড়িয়া

চলিয়া আসা সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছিল না। তবুও মোটামুটি স্থির রাখিলাম,—শরৎ মহারাজ যখন ঢাকা মঠের সকল সংবাদ জ্ঞাত আছেন তখন জানিয়া শুনিয়া যদি ডাকেন, নিশ্চিত যাইতে হইবে।

উৎসবের দশ দিন মাত্র বাকী থাকিতে আমাকে যাইবার জন্য শরৎ মহারাজের আদেশ লিপি আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্র পাইয়া রওনা হইয়া তাঁহার পাদমূলে আসিলাম এবং নূতন করিয়া আদেশ পাইবার প্রতীক্ষায় রহিলাম। সন্ধ্যার সময় শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'কাল তোমাকে ঘাঁটাল যেতে হবে। সেখানে রাজেনকে এই ফর্দ্দখানা দিয়ে বলে আসবে ফর্দ্দের জিনিষপত্র সে যেন ওখান থেকে নিয়ে যায়। তুমি ঘাঁটাল থেকে যত শীঘ্র পার ফিরে আসবে, আমার সঙ্গে তোমাকে জয়রামবাটী যেতে হবে।'

কিন্তু ঘাঁটাল হইতে ফিরিয়া আসা আমার হইল না। শ্রীমান্ রাজেন (স্বামী বিজ্ঞানন্দ) আমাকে একপ্রকার জোর করিয়া জয়রামবাটী যাইতে বাধ্য করিল। আমি সকল কথা পত্রে নিবেদন করিয়া উৎসবের কাজ যাহা রাজেন আমার উপরে বরাত দিয়াছিল সেই কাজের জন্য সেই দিন বাঁকুড়া রওনা হইলাম। পরদিন বিষ্ণুপর হইয়া বেলা ১১টার মধ্যে জয়রামবাটী আসিয়া পৌছিলাম।

শ্রীশ্রীমার মহাপ্রস্থানের পরে জয়রামবাটী কখন যাইতে হইবে এমন কথা ভাবি নাই। সুতরাং জয়রামবাটীতে আসিয়া শত কাজের মধ্যে নিজকে যুক্ত করিয়াও যখন দেখিলাম একটা

দারুণ অভাব মনকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে তখন নদীর ধারের শ্মশানে সেই বট গাছের মূলে আসিয়া বসিলাম—যে স্থানে শরৎ মহারাজ বিশ্রাম করিবার জন্য নিত্য আসিয়া বসিতেন এবং কখন কখন গুণ গুণ করিয়া গাহিতেন,—"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই—।"

নিত্য উদ্বোধন হইতে শরৎ মহারাজের পত্র আসিতেছে। সকল পত্রের মধে একটা অফুরন্ত উৎসাহের শ্রোত যেন চলিয়াছে। এত বড় একটা কাজে কোন গোলযোগ ঘটিতে পারে এমন সংশয়ের ভাব তাঁহার কোন চিঠিতে ছিল না। তিনি যেন সকল কাজের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাইতেছিলেন, যেন তিনি জানিয়াছিলেন,—এই কাজে বিন্দুমাত্র গোলযোগ ঘটিতে পারে না। প্রতিদিন তাঁহার পত্র আসিত। প্রতিদিন পত্রের ভাবে সেবকগণকে নববলে বলীয়ান করিয়া তুলিত। সকলেই প্রাণপন করিয়া কর্ম্মে লাগিয়া যাইত।

ইং ১৫ই এপ্রেল সকালের গাড়ীতে শরৎ মহারাজ সদলবলে জয়রামবাটী যাত্রা করিলেন। বৈকালবেলা আসিয়া বিষ্ণুপুরে পৌছিলেন। অতঃপর শরৎ মহারাজের সহিত মন্দির প্রতিষ্ঠার সকল পরিচয় ধারাবাহিক ভাবে 'উদ্বোধনে' যাহা প্রকাশ হইয়াছিল নিম্নে তাহার আংশিক বিবরণী দেওয়া গেল :—

"সুরেশ্বর বাবুর বাসায় আসিতে সন্ধ্যা হইল। তাহার পর ঘণ্টাদুই আমরা * কথা বার্ত্তা, গল্প গুজবে কাটাইলাম। * *

---

* ১৩৩০ সনের উদ্বোধনে ব্রহ্মচারী কুমার চৈতন্য 'সুব্রহ্মণ্য পরিচয়ে নব্য 'বঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা' প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল।

আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় খাইবার ডাক পড়িল। এক এক করিয়া সারি দিয়া সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পঙ্গত বেশ বড়ই হইল—উঠানে কুলাইল না—একটি ঘরও লইতে হইল। বাড়ীর প্রাঙ্গণ আজ রাত্রে জম-জমাট হইয়া উঠিল—হাসির 'গর্‌রা' —আনন্দের তুফান্,—প্রসাদ বিতরণ পূরাদমে চলিতে লাগিল। পড়ার আশ-পাশ হইতে মা ও মেয়ে, পিতা-পুত্র, স্বামী স্ত্রী দলে দলে আসিতে লাগিলেন—আচার্য্যকে (স্বামী সারদানন্দ) একটি বার দেখিবার তাঁহাদের কি সাগ্রহ উৎকণ্ঠা! বাড়ীর ছোট ছেলে-মেয়েরা বিস্ফারিত, স্তিমিত নেত্রে সেই বিরাট-পংক্তির একধার হইতে অপরধার কেবল দেখিতে লাগিল, কেহ কেহ মা'র কোলে ঘুমাইয়াছিল, জাগিয়া বুঝি ভাবিল—আচ্ছা, এত মানুষ কোথা থেকে এল? এরা কা'রা?—কে বলিবে,—কা'রা এরা?

"পদের পর পদ আসিতে লাগিল—শেষ আর হয় না। সুন্দর সুগন্ধ কামিনী চালের ভাত, সুক্ত, শাক, ভাজা, চর্চ্চড়ী, চমৎকার কলাইএর ডাল, মাছভাজা, মাছের কালিয়া, টক, দধি, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হরেক রকমের মিষ্টান্ন ইত্যাদি। গৃহস্বামীর ভাষায় 'ঝোলভার্ত খাওয়া'—শেষ হইল।

"কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর যাবার যোগাড় হইতে লাগিল। আমাদের জন্য ২৪ খানি গরুর গাড়ী প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আচার্য্যকে স্বাচ্ছন্দ্যে লইয়া যাইবার জন্য বাঁকুড়ার সাধুবৃন্দ এক-খানি ফোর্ডমার্কা 'হাওয়াগাড়ী' বিষ্ণুপুরে হাজির করিয়াছিলেন। স্থির হইল, আচার্য্য রাত্রিটা সেইখানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতে ঐ

দ্রুতযান-যোগে আমাদের এই পথের পরবর্ত্তী বিশ্রামাগার—কোয়ালপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণমঠে আমাদের আগেই সোমবার সকাল পৌঁছিবেন। কারণ গরুর গাড়ীর কলেরগাড়ীর সহিত কোন-কালেই আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, ইহা সকলেই জানিতেন। যাহা হউক, মালপত্র সব বোঝাই হইলে আমরা সেনজা মহাশয়-দিগের নিকট বিদায় লইয়া একে একে একে গাড়ীতে উঠিলাম। প্রথমে তিনখানি গাড়ী মালঠাসা করিয়া এক একজন যাত্রী সহ, প্রস্তুত করা হইল। বাকি প্রত্যেক গাড়ীতেই কিছু কিছু মাল দেওয়া হইল—গড়ে দুইজন করিয়াই লোক চাপিল। কোন কোন গাড়ীতে তিনজনও ছিলেন। * * *

"দারুণ গরম। কোয়ালপাড়া—মঠে আচার্য্যকে অভিবাদন ও বরণ করিবার জন্য পশ্চিমদ্বারী আশ্রমবাটীর সমক্ষে মঙ্গল-কলস স্থাপিত। দেখিলাম—মালা ঝুলিতেছে। ভিতরে নাতিদীর্ঘ একটি উঠান—উঠানে একটি মরাই। পশ্চিম ও দক্ষিণে সাধুদের থাকিবার ঘর। উত্তরে ঠাকুর ঘর। দক্ষিণধারের একতলার ঘরে তল্পীতল্পা সব নামাইয়া হাবড়া ষ্টেশনে—যাত্রীদের মত সবাই গড়াগড়ি দিলাম। সে ঘরের ঢুকিবার দরজাটি বড়ই ছোট—আন্দাজ হাত দুই হইবে। লম্বা ও মোটাসেটা মানুষের বড়ই বেগতিক। অনেকেরই মাথা ঠুকিল। ঠাকুরপ্রণাম, সন্ন্যাসীদের প্রণামাদির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লইলাম। কেহ কেহ আশ্রম প্রাঙ্গণের কুয়াতে, কেহ বা বাহিরে পুষ্করিণী হইতে স্নান সারিয়া লইলেন। চা'ও মিলিল। অনেকে উহা ছাড়িয়া সরবৎ ধরিলেন। তাহার পর জল-খাবার।

"আন্দাজ দুইটার সময় আমরা সকলে উঠানে একটি সামিয়ানার তলে পেট ভরিয়া অন্নপ্রসাদ পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলাম। স্বামী কেশবানন্দজী বেশ সুচারু বন্দোবস্তই করিয়াছিলেন।

"তখন গোধুলি। 'দেখ যাত্রী যায়, জয়গান গায়' পল্লীপথে গল্পগুজব করিতে করিতে সকলে মিলিয়া চলিয়াছে। খুব আনন্দ হইল, বড় ভাল লাগিল। চারিধারে খোলা মাঠ—যেথায়ই চক্ষু যায়, কেবল প্রশস্ত-বিস্তৃতি—সবই উন্মুক্ত বাধাহীন নিঃসঙ্কোচ। সহরের সভ্যতা পাঁচিলে-ঘেরা দেওয়ালে বেড়া-দেওয়া—পার্টিসনের দাপটে মানুষের অন্তরাত্মাকে চীনা মেয়েদের পায়ের মত বুটের ভিতর জমাটভাবে খঞ্জ, বদ্ধ করিয়া চাপিয়া রাখার চেষ্টা সহরের বাহিরে নাই। মাথার উপর অনন্ত আকাশ—একখানি নীল কম-ছবি, স্নিগ্ধ-সুচারু সে রূপের ছটা। নীচে সবুজ ক্ষেত্রে, সবুজ শস্যে, সবুজ গাছে, সবুজ পাতায়—কেবল সবুজেরই মেশামেশি। স্থানীয় এক ভদ্রলোক আমাদের প্রায় গ্রামের শেষ-সীমানা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন—তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ হইলাম। তিনি বলিলেন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কাটে ভাল, কিন্তু বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির আক্রমণ আরম্ভ হয়। বর্ষায় সব কবিত্ব-ভাবুকতা-স্বাচ্ছন্দ্য ম্যালেরিয়ার চাপে মরিয়া যায়। কোয়াল-পাড়ায় আশ্রমের পূর্ব্বদিকে পাণা-ভরা পুকুরটি দেখিয়াই কতকটা বুঝা গেল। ঐরূপ পুকুর-খানা-ডোবাই 'এনোফিলিস্' মশার সূতিকাগার।

"ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আঁধার ঘনীভূত হইতে আরম্ভ হইল। কলুপুকুর, তাঁতি আহের খাল, যমুনা, দেশড়া—তাহার পর

আমোদর নদ। অবশেষে পথের শেষ—জয়রামবাটী। আমরা আলো জ্বালাইয়া ফেলিলাম। অন্ধকার বৃদ্ধির সহিত পায়ের ক্ষিপ্রতা কমিতে লাগিল। অনভ্যস্ত স্থানে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইল। আমাদের ভিতর ঐ অঞ্চলেরই এক সাধুজী অগ্রগামী হইয়া পথ দেখাইতে লাগিলেন। আল, গর্ত্ত, খানা—যেখানে যাহা পড়িতেছিল—পূর্ব্ব হইতে দলের সকলকে সাবধান করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

"এমনি-ধারা পায়ে-চলার পথ ধরিয়াই প্রাচীন ভারতের মানুষ তীর্থযাত্রা করিতে বাহির হইত। তাহারাও আমাদেরই মত ছোটবড় মণ্ডলী রচিয়া চলিত। পালি-সাহিত্যে যে যাত্রীদের কথা আছে—যাঁহারা বাণিজ্যের পথ দিয়া পায়ে চলিয়া ভারতের পশ্চিম প্রান্ত ভরুকচ্ছ (ব্রোচ) হইতে পূর্ব্ব রাজগৃহ (রাজগীর) পর্য্যন্ত যাওয়া-আসা করিতেন, তাঁহাদের স্মৃতিই অন্তরে জাগিল। অবশ্য, আমাদের মাত্র তিন মাইল পথ। যাঁহারা পূর্ব্বে দ্বারকা বা পুরী পায়ে চলিয়া যাইতেন তাঁহাদের—আনন্দ, আগ্রহ, কষ্টসহিষ্ণুতা ভাব-ভক্তি কত অধিক ছিল তাহার কতকটা ছায়া পাওয়া গেল।

"পথ ফুরাইল। আমরা আন্দাজ আটটার সময় অন্ধকারে আমোদরতীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তথা হইতে মাঠের পারে,—বনানীর ঘনতমিস্রার ভিতর হইতে যেন সৌদামিনী চমক দিল—শ্বেত শ্রীমন্দির দীপের আলোয় ঝলসিয়া উঠিল। এই পল্লীর 'ব্রজবুলি'তে বলিতে গেলে—'হা-ই উ-বাগে, লি-লি কর্‌ছে'। একজন গান ধরিলেন—'ঐ যে দেখা যায় আনন্দ-

ধাম—ইত্যাদি'। মহামায়ার 'জয়' দিয়া ক্রমে শ্রীধামে পৌঁছিলাম —৩রা বৈশাখের রাত্র। মন্দিরের নিকটেই একটি দাওয়া ও ঘর আমাদের জুটিল। আঁধারে আর কিছুই দেখা গেল না। মাল অন্যপথ দিয়া খানিক পরে পৌঁছিল।

"আন্দাজ এগারটার সময় প্রসাদাদি পাইয়া আমরা ঘুমাইলাম। সব চুপ্ চাপ্। সকালে জাগা যাবে। * * *

"সভ্য সহরের কাজ সব কলে চলে। সময়ের মূল্য সেখানে বড় বেশী; মানুষের জীবন-সমস্যা হরেক-রকমের। কোন এক উৎসব বা আমোদ-প্রমোদ, তাহা যতই বড় আকারে হউক না কেন, অল্প সময়ের ভিতর সারা—শেষ হইয়া যায়। দলে দলে মানুষ আসে, যোগ দেয়, চলিয়া যায়। কথা এক কাণ দিয়া শুনে, অপর কাণ দিয়া বাহির করিয়া দেয়। হৃদয় একটি ভাব বসিতে না বসিতে কর্ম্মকোলাহল ও বাহিরের অসংখ্য চাঞ্চল্য আসিয়া সব ধুইয়া-মুছিয়া সাফ করিয়া ফেলে।

"পল্লীতে কিন্তু সেরূপটি হইবার উপায় নাই। সেখানে বৃহদাকারে কোন অনুষ্ঠান হইলে বেশ সময় থাকিতে আয়োজনের পর্ব্ব আরম্ভ হয়। একটি সাদা-সিধে কথার উল্লেখ মাত্রেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে কেন আমরা এ উৎসব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত—চমকিত হইয়াছি, কেনই বা আমরা উহাকে 'বিরাট' আখ্যা দিতেছি। মোটামুটী বলিতে গেলে কয়দিন মিলাইয়া সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় বার তেরহাজার লোক অন্নপ্রসাদ পাইয়াছিল। কাজেই এ পূজার বোধন যে মাস খানেক পূর্ব্বেই বসিবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি? সাক্ষাৎভাবে

যাঁহাদের উপর কর্ম্মের ভার পড়িয়াছিল তাঁহারা একপক্ষ পূর্ব্বেই কেহ কাশী কেহ ঢাকা, কেহ বেলুড়, কেহ কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীধামে পৌছান। মহাবলে মহোৎসাহে তাঁহাদের সাহচর্য্যে স্থানীয় সেবকবৃন্দ উদ্‌যোগ পর্ব্বে আত্মনিয়োগ করিলেন —বৃহৎ পাকশালা ও পংক্তিভোজনের ছাউনি-নির্ম্মাণ, চারিটি বৃহৎ গাছ খরিদ করিয়া কাটাইয়া উহা হইতে রাঁধিবার কাঠ প্রস্তুত করিয়া রাখা, ভিয়ান পাতিয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত শেষ করিয়া রাখা,—দলে দলে মাতৃপূজায় ভক্তবৃন্দ আসিবেন, তাঁহাদের থাকিবার জন্য গ্রামের ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের বাহিরের ঘরগুলি ছাড়িয়া দিবার জন্য আবেদন-অনুমোদন করিয়া রাখা,—ইত্যাদি। তরীতরকারী বাদে উৎসবে ব্যবহার্য্য 'পাকামালের' বাজার কতক কলিকাতা, কতক ঘাঁটাল হইতে করা হইয়াছিল।

"বৃহস্পতিবার উৎসব। আজ মঙ্গলবার মা তাঁহার কাজে, আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য দূর দেশান্তরে ছেলে-মেয়েদের আহ্বান-লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। দিনের পর দিন তাঁহার প্রাঙ্গণে সন্তানেরা আসিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে যেন অলক্ষ্যে রব উঠিতে লাগিল—'মা, আমরা এসেছি।' আজ হইতে বিশেষভাবে এই আসার পালা সুরু হইল। একজন কর্ম্মী বলিতেছিলেন—এইরূপ দিনের পর দিন আমাদের পল্লী-উৎসবে কেহ গাড়ী কেহ বা পাল্কী হইতে আনন্দময় হাসিভরা মুখ লইয়া উৎসব-ভূমিতে নামিতে লাগিলেন—এ দৃশ্য আমি খুবই উপভোগ করিতেছিলাম, বড় ভাল লাগিল! সত্য কথা।

সকলেই আমরা চার পাঁচদিন থাকিয়া আনন্দ করিব বলিয়াই গিয়াছি। মধ্যম মাতুল মহাশয় শ্রীযুত কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ও যে সকল সন্ন্যাসী কর্ম্মিবৃন্দ পূর্ব্ব হইতে ওখানে ছিলেন তাঁহারা সকলেই সাদরে আমাদের সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। চেনামুখগুলি দেখিয়া পরস্পরে খুবই আনন্দ হইল।

"ভোরে ঘুম ভাঙ্গিল। ঘর-দোর মন্দিরাদি সকলের অবস্থিতি আলোয় বেশ ফুটিয়া উঠিল। আমাদের যেখানে স্থান হইয়াছিল উহা শ্রীমন্দিরের সমক্ষে, পূর্ব্বদিকে। তৎসংলগ্ন ধর্ম্মঠাকুরের ঘর —প্রত্যহ একটি ব্রাহ্মণ বালক পূজা করিয়া যান। শ্রীসারদেশ্বরী দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ঠিক পাশেই। মন্দিরের সামনে উত্তর-দক্ষিণ ব্যাপিয়া একটি লম্বা পথ চলিয়া গিয়াছে। তাহারই দুইধারে গ্রামের খড়ে-ছাওয়া মাটীর বাড়ীগুলি ও তৎসংলগ্ন বৈঠকখানা শ্রেণী। গ্রামস্থ সকলেই আমাদের জন্য বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দিনের পর দিন যেমন ভক্তেরা আসিতে লাগিলেন সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া প্রয়োজন মত আমরা ঘরগুলি পাইতে লাগিলাম। নানাজনে নানাপথ দিয়া আসিয়াছিলেন —বিষ্ণুপুর, আরামবাগ, বদনগঞ্জ, রামজীবনপুর ইত্যাদি। সকল পথেই স্থানীয় ভক্তবৃন্দ দূরাগত ভ্রাতাদের যথেষ্ট সাহচর্য্য করেন।

"মন্দির-বাটীর পশ্চিমধারের জমিতে পাকশালার জন্য একটি ও পংক্তিভোজনের জন্য তৎসংলগ্ন একটি বড় লম্বা ও একটি তদপেক্ষা ছোট ছাউনী প্রস্তুত হইয়াছিল। সেবকবৃন্দ অনেক রাত্রে এস্থানে শয়নও করিতেন। ইহা ছাড়া শ্রীমন্দিরের বিস্তৃত

বারাণ্ডা ও তাহার পিছনে স্থানীয় সাধুবৃন্দের পাকা আশ্রমবাটী ও পূর্ব্বধারে লম্বা রাস্তার উপর শ্রীশ্রীমার বসত-বাড়ী ত ছিলই।

"গ্রামের এই অঞ্চলে ৩।৫টি পুকুর। পশ্চিমে ঘোষেদের পুকুর, মন্দিরের পাশে উত্তরে সামুই পুকুর, পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমার বাটীর পিছনে পুণ্য-পুকুর এবং আরও দক্ষিণে আগাইয়া গিয়া বাঁড়ুয্যেদের পুষ্করিণী। উত্তরে একটি বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র—তাহার পরে আমোদর নদ। আবার মন্দিরের সমক্ষে একটি কূয়া—কাজেই জলাভাবের বিশেষ আশঙ্কা নাই।

"জয়রামবাটীর উত্তরে দেশড়া, কোয়ালপাড়া, পূর্ব্বে তাজপুর, আনুড়, কামারপুকুর, আরামবাগ, দক্ষিণে জিবটা, রামজীবনপুর, পশ্চিমে সিওড়, শিরোমণিপুর। যে মাটী জগন্মাতাকে ধারণ করিয়াছে উহা বড় সামান্য নহে। তাই সেখানে অতি দূরদেশ হইতে এই অজস্র ধারায় ভক্ত-সমাগম। আর সেই জন্যই সেই দেশের অনুষ্ঠান-কথা বিশদ করিয়া কহিবার, লিখিবার মাদৃশ অযোগ্যেরও এই সামান্য প্রয়াস।

"এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশী। স্বাস্থ্যের অভাব বড়ই দারুণ—ব্যাধির তাড়না একান্ত মর্ম্মন্তুদ। তবে ভূমি অত্যধিক উর্ব্বরা বলিয়া ইহার উপর দারিদ্র্যদোষে অনাহারে মানুষকে তিল তিল দহিতে হয় না। ছোট এই গ্রামে প্রায় চারিশত লোকের বাস—তন্মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু জোতজমি আছে, মরাই-ভরা ধান আছে।
প্রচুর শস্য হইয়া থাকে। জমি দুই প্রকার—মাঠের জমি ও কালাজমি। মাঠের জমিতে বিভিন্ন রকমের ধান হয়। মজার

সব নাম। যথা—রাঙ্গীবোল্‌দেজ্‌, পাৎসাভোগ, ধূলে-কল্‌মা, হেমৎ ধান ইত্যাদি। কালাজমিতে বর্ষার লেউলি, আউস ঝাঁঝি ইত্যাদি ধান ছাড়া রবিশস্যও হয়। ইহা ছাড়া শাক্‌শব্জী ও অন্যান্য শস্য নানা প্রকার হইয়া থাকে। বিভিন্ন রকমের কলাই জন্মায়—যথা মাস, মুগ, মটর, মুসুর, টুমুর। গম, যব, সরিষা, হলুদ। গুলিউচ্ছে, কুমড়া (যাহার প্রচুর তরকারী হইয়াছিল), বেগুন, ঝিঙ্গে, পিঁয়াজ, রসুন, নানা প্রকার শাক, আখ, মূলা, খেঁড়ো, কাঁকুড়, গোল আলু ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় আম-কাঁঠাল-নারিকেল গাছ ক্বচিৎ দেখা যায়। ঐসকল ফলের প্রয়োজন হইলে দূর হইতে আনাবতে হয়।

"গ্রামের দেব-দেবীর ভিতর আছেন বাঙ্গালার বৌদ্ধযুগের স্মারক ধর্ম্ম ঠাকুর, যাত্রাসিদ্ধি, নারায়ণ ও মা সিংহবাহিনী। আমরা যে বৈঠকখানাটিতে থাকিতাম সেইখানেই প্রতিবৎসর শ্যামা পূজা হইয়া থাকে—প্রতিমা আসে। তাহা ছাড়া শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে বাৎসরিক ৺জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যবস্থা তিনিই করিয়া গিয়াছেন উপরন্তু অতঃপর জননী জগদ্ধাত্রীর শ্রীসারদা মূর্ত্তিতে চিরস্থায়ীভাবে নবমন্দিরে স্থাপনা হইল। এ দেবীকে লইয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে একদিন কত খেলাই না খেলিয়াছে—তাঁহার সহিত ঝগ্‌ড়া-অভিমান করিয়াছে, আবার তাঁহারই আদর-যত্ন-স্নেহ, আশ্রয়-অভয় পাইয়া ধন্য হইয়াছে। ইঁহারা বিশেষ ভাবে তাঁহাকে আপনার জন হিসাবে পাইয়াছিলেন। কেহ 'মা', কেহ 'পিসীমা', কেহ 'দিদি', কেহ 'মাসীমা', কেহ 'দিদিমা' বলিয়া ডাকিতেন। মায়ায় আত্মগোপন করিয়া সকলকে ভুলাইয়া রাখিলেও ছাইচাপা

অগ্নির দাহিকাশক্তি ও প্রচণ্ড তেজ কোথায় যাইবে? স্বর্ণখণ্ডকে অজ্ঞানে পিতল ভাবিয়া লইলেও তাহার আসল মূল্য তাহাতেই থাকিয়া যায়,—চমক ভাঙ্গিলে মানুষ তাহা বুঝে। ঘুমের ঘোরে ঔষধ সেবন করিলেও তাহার কার্য্য হয়। মায়াজীবী মানুষ সংসারে ভুলিয়া থাকিলেও সে পরমবৈদ্যের কৃপাভেষজ ব্যর্থ হইবার নহে—অন্তিমে মুক্তিরূপ মহা-আরোগ্য লাভ তাহার অবশ্যম্ভাবী।

"ভোরে সেদিন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। খালিগায়ে দাওয়ার উপরে বসিয়াছিলাম, একটু শীত বোধ হওয়ায় গায়ের চাদরখানি টানিয়া লইতে হইল। তাহার পর একে একে সকলে জাগিলে একজোট হইয়া আমোদরতীরে উপস্থিত হইলাম। পথের দুইধারে ছোট বড় অনেক ক্ষেত—তাহাতে নানাপ্রকার টাট্‌কা তরীতরকারী জন্মিয়াছে। সবুজ ক্ষেত্রে শ্বেত তিলফুল-গুলির শোভা বড়ই মনোরম। গ্রামের মহিলারা আসিয়া তাঁহাদের নিত্যব্যবহারের জন্য শাক কুমড়াদি যাহা প্রয়োজন লইয়া যাইতেছেন। ঝির ঝির করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে লাগিল—প্রভাতের বালার্ক পল্লীর পূর্ব্বগগন সিন্দুররাগে রঞ্জিত করিয়া উদিত হইল। আমোদরের তীরে সেই প্রফুল্ল সময়ে বড়ই মনোমদ—শ্বেত কনকচাঁপা ও রক্তকাঞ্চন পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত। প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সারিয়া লইয়া কেহ কেহ মন্দিরমুখী হইয়া তরুতলে জপরত হইলেন, কোন কোন যুবক ব্যায়ামের নিত্য-অভ্যাস ছাড়িতে না পারিয়া লজ্জা ছাড়িয়া বালুর ঢিপির উপরেই মাল-কোঁচা আঁটিয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল,

কেহ বা উহারই ভিতর খানিকক্ষণ পাঠ করিয়া লইলেন। মনোহর তানে সহসা শ্রীমন্দিরের নহবতের সানাইয়ে বাজিয়া উঠিল,—'জননীর দ্বারে আজি ঐ শোন গো শঙ্খ বাজে।' পথের পাশে ঝোপের ভিতর কাল-কোকিল সেই সুরে সুর মিলাইয়া যেন গাহিল—'জননীর দ্বারে আজি ঐ শোন গো শঙ্খ বাজে'—। দূর হইতে মন্দিরের অপূর্ব্ব শোভাসম্পদ সকলে উপভোগ করিতে লাগিলেন,—ঐ প্রসঙ্গে নানা গল্প-আলাপন চলিতে লাগিল। চূড়ার উপরে সোণার পাতে 'মা' লেখা একটি পতাকা রবিকরে ঝলসিয়া উঠিল। সকলেই উল্লাসিত। এক দল প্রাতঃকৃত্যাদি কাজকর্ম্ম সারিয়া মাঠের মাঝে আলের উপর দিয়া শ্রীমন্দিরমুখে ফিরিতেছেন—পথে আর এক অসমাপ্ত-কর্ম্ম নূতন দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সাদরে 'সুপ্রভাত' বলা হইল। আমোদর মুখে ভক্তসঙ্ঘের এই যাতায়াতের প্রবাহ কয়দিনই অবিরাম চলিতে লাগিল। অপর পার হইতে আগত এই অঞ্চলের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমরা মন্দির সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত ও মনোভাব জানিবার জন্য দুইচারিটি প্রশ্ন করিতাম। সকলেই বলিতেন 'বেশ হয়েছে বাপু—সে আর একবার করে বল্‌তে।'

"তাহার পর জননীর মন্দির-দ্বারে সকলে যাওয়া গেল। এখনও মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, বাহিরের ঠাট্ সব প্রস্তুত। মন্দিরটি বেশ বড়ই হইয়াছে—সাদা ধপ-ধপে। সপ্তদ্বার, ছয় গবাক্ষ। ভিতরকার শয়নগৃহের দুইটি দরজা ধরিলে নবদ্বার। বৌদ্ধস্তূপ ও মুসলমান গম্বুজ—এই দুই রীতির সংমিশ্রণ। উপরের,

পতাকাটি যেন দূরাগত যাত্রীকে অনুক্ষণ ধ্রুবতারার ন্যায় লক্ষ্য স্থির করিয়া দিতেছে, আর পথ-শ্রান্তকে অভয় দিয়া বলিতেছে—তোর শ্রম সার্থক, পথের শেষে এসেছিস্, মায়ের মুখ দেখে প্রাণ জুড়া। চারিধারের বেড়া দেওয়া বিস্তৃত বারাণ্ডায় লাল সিমেন্টের মেজে। ঠিক সাম্‌নে হিন্দুস্থানের মন্দিরের ন্যায় একটি বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান আছে, ছোট ছেলেরা উহার লম্বা দড়িসহায়ে ক্ষণে ক্ষণে গুরু-গম্ভীর ধ্বনি তুলিয়া আনন্দ করিতেছে। চারিধারের শুচি-শুভ্র দেওয়ালে সপার্ষদ শ্রীশ্রীঠাকুরের ছায়াচিত্র স্থাপিত হইয়াছে, চিত্র-গুলি সব জীবন্ত জ্বলন্ত মূর্ত্তি। ভিতরে কাল-পাথরের বেদীর উপর দেবীর আসন—তৎসংলগ্ন শ্বেতপ্রস্তরের একটি নিম্ন-বেদিকা। ভিতরের দেওয়ালেও সশিষ্য যুগাবতারের আলেখ্য শোভা পাইতেছে। ভিতরে দীপ ঝুলাইবার জন্য গম্বুজকেন্দ্র হইতে একটি লৌহশলাকা লম্বমান রহিয়াছে। বাহিরের আলো ও বায়ুচলাচলের জন্য কাচমুণ্ড কয়েকটি গবাক্ষ-গোলক (Skylight) মন্দিরগাত্রে উপরে ফুটান রহিয়াছে। প্রাচীন ও নবীন দুই প্রথারই মিলন। নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া 'সেকেলে' বলিবার উপায় নাই। আবার প্রাচীন ধারা একেবারে বিনষ্ট—সম্পূর্ণ আধুনিক 'নবডৌল' ও বলিতে পারিবে না। ভিতরে মাথার উপর দৃষ্টিপাত করিলে গম্বুজগাত্রে একটি সুন্দর কমল চিত্রিত দেখা যায়। সাদার পাশে গম্বুজের বৃহৎ গোলপরিধি ব্যাপিয়া চমৎকার একটি লাল রেখা টানা আছে। সেই রেখায় মন্দির-শোভা আরও বাড়িয়াছে। ভিতরের মেজেটি লাল-কালো সিমেন্টের।

"পিছনের সিঁড়ি দিয়া উপরে ছাদে উঠিলাম। গোল গম্বুজটির চারিপাশে একটি সুপ্রশস্ত বারাণ্ডা। সমস্ত গ্রামের নয়নাভিরাম একখানি দৃশ্যপট তথা হইতে দেখা যায়। ধরিত্রী গিয়া অতিদূরে যেথায় দিক্‌চক্রবালের সহিত মিলিয়াছে—যতদূর চক্ষু চলে—সমস্তই সুন্দর পরিস্ফুট। চারিধারে অসংখ্য বাঁশ, তাল ও তেঁতুলগাছের শ্রেণী। ম্যালেরিয়া-বর্জ্জিত গ্রীষ্মে পূর্ণিমার প্রশান্ত রাত্রের শুভ্র-কোমল-আলোকে মৃদুমন্দবায়ু সেবনের সহিত এখানে বসিয়া পরস্পরে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলাপন বড়ই প্রাণারাম হইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

"শ্রীমন্দির দৈর্ঘ্যে ৩৩ × ৬ফুট, প্রস্থে ১৯ × ৬ফুট। বাহির বারাণ্ডার পূর্ব্বদিকে ১০ফুট, পশ্চিমে ৯, উত্তরে ও দক্ষিণে ৮ফুট ৯ইঞ্চ করিয়া। গম্বুজসমেত সমস্ত মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৪৫ফুট। নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য কলিকাতা হইতে কয়েকজন কারিগর লইতে হইয়াছিল, স্থানীয় মজুরি অবশ্য ছিলই।

"মঠের যে সকল শ্রদ্ধেয় কর্ম্মিবৃন্দ অশেষ প্রকারের বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া এই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ভার লইয়া এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের শ্রম সার্থক, উদ্যম অদম্য, কার্য্যকৌশল অতুল, তপস্যা প্রসংশনীয়। * * *

নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠস্থাপনা বা অক্ষয়তৃতীয়ার মহোৎসবে

"এই পরমপুণ্য শুভসুন্দর তিথিতে সত্যযুগের" (১) আরম্ভ।

(১) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের কথা অর্থাৎ অনন্ত কালকে ভাগ করিয়া দেখাইবার দুঃসাহস বেদে দৃষ্ট হইবে না। আচার্য্য শঙ্করের

প্রলয়ের পর জগৎ রচনা—আমাদের প্রচলিত কল্পের প্রথম আরম্ভ দিবস। ইহাই পুরাণের বচন—আর সেইজন্য ইহাই পুরাণ-ধর্ম্মী ভারতবাসীর প্রাণের বিশ্বাস। এই তিথিতেই প্রতিষ্ঠোৎসব ধার্য্য হইয়াছে। অতি প্রত্যূষে সেবকমণ্ডলী শয্যাত্যাগ করিয়া আজিকার মঙ্গলপ্রভাতকে সহৃদয়ে সানন্দে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মাতৃমন্দিরে সহসা ললিত ভৈরবী রাগিণীতে ভজনের আরাব উত্থিত হইল—শান্ত সুমধুর সঙ্গীত। 'নিরমল ঊষাকালে' মাতৃঅর্চ্চনার উদ্বোধন। যোগ্যকালে যোগ্যকার্য্য। বেলুড়মঠ হইতে সেই সবেমাত্র একটি ছোট মণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই অন্যতম মাতৃপূজার প্রথম ঋত্বিকরূপে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন—যেন অলক্ষিতে কলকাটী সব প্রস্তুত ছিল।

"তাহার পর আমোদর-নীরে সেই গতায়াতের পালা। সকলেই তাড়াতাড়ি সেখানে স্নানাদি সারিয়া কার্য্যে যোগদানমানসে সমুৎসুক। আজ তথায় দল বেশ বড় হইল। কাজকর্ম্ম সব

প্রভাবে পরাজিত বৌদ্ধগণ মৌখিক বেদগ্রহণ করিলে ও বহুদিনের সংস্কার বশতঃ যাহাতে কর্ম্ম-কাণ্ড এ ভারতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারে এই জন্যই যুগ বিভাগ। অর্থাৎ যুগ বিভাগ করিয়া তাঁহারা বলিলেন. যাহা সত্যযুগে ছিল তাহা ত্রেতায় হইতে পারে না, যাহা ত্রেতাতে ছিল তাহা—দ্বাপরে এবং যাহা দ্বাপরে ছিল তাহা কলিতে একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইল। ভারতবাসী আজও যে বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেছেন না তাহা যুগ বিভাগ রূপ সংস্কারের মোহে আচ্ছন্ন বলিয়াই। এই বেদ বিরোধী পুরাণ বাদ যে দিন গত হইবে সেই দিন মানুষ বুঝিতে পারিবে বৈদিক কর্ম্মকে দূরে রাখিবার জন্য শাস্ত্রের নামে কত বড় ধাপ্পাবাজী রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার।

সারিয়া কেহ কেহ তীরস্থ গাছতলায় বসিয়া খানিকক্ষণ আলাপ করিলেন। সেই সুন্দর সকালে সবই মধুময় বলিয়া বোধ হইল। বায়ু মধুভারাক্রান্ত হইয়া সৌগন্ধ ক্ষরণ করিতে লাগিল, আমোদরে স্নিগ্ধ শীতল মধুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল, আর সমস্ত বনস্পতি মধুময় প্রতিভাত হইল।

"কিয়ৎকাল পরে সকলে মন্দিরে ফিরিলেন। কিছু জলযোগ করিয়া যে যার কাজে ব্যাপৃত। মন্দিরের দক্ষিণ দালানে স্তূপীকৃত তরিতরকারী লইয়া অনেকে কুটিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য-ধারে ফুলভার হইতে পূজার যোগ্য নিখুঁত সুন্দর ফুটন্ত ফুল পরিষ্কার করিয়া বাছাই চলিতে লাগিল। তাহার পর পিছনের পুরাতন দ্বিতল আশ্রমবাটীর উপরকার ঘর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীমা ও শ্রীশ্যামার আলেখ্য আচার্য্য স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া শ্রীমন্দিরের বেদীর উপর স্থাপনা করিলেন।

"'যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশেরই এক মানুষ' আমরা সঙ্গে পাইয়াছিলাম। পরমারাধ্য আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ স্বয়ং তরণীর হাল ধরিয়া কর্ণধাররূপে সেই জনস্রোতের মাঝে অধিষ্ঠিত ছিলেন—অধরে ছিল তাঁহার দীপ্ত হাসি, সমগ্র মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শ্রী, চক্ষুর্দ্বয়ে মাতৃসুলভ কৃপা-করুণা-মমতার কনককিরণ, বাহুদ্বয়ে বরাভয়, আশীর্ব্বাদ, সান্ত্বনা ও আশ্রয়। মাতৃমন্দিরের কল্পনা, পত্তন, নির্ম্মাণ, পরিসমাপ্তি, তত্ত্বাবধান ও রক্ষণ—সমস্তই তাঁহার। তাই বিশেষ করিয়া ইহা তাঁহার বড় আদরের—প্রাণের সামগ্রী।

"আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া একজন সহৃদয় পরম পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী

মহারাজ সত্যই কহিয়াছেন—'আপনি ধন্য! শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের জন্যই, যেমন একদিন লীলারসময় হরির অপূর্ব্ব লীলানিকেতন শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, আজ আপনার প্রসাদেও তেমনিই—আমাদের পুণ্যপীঠ শ্রীশ্রীজয়রামবাটীও বিখ্যাত হইল। শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহাভিষিক্ত ও কৃপাসিদ্ধ আপনি ভিন্ন,—আর কাহার সাধ্য যে এমন অদ্ভুত কার্য্য করে?'—সাধু উক্তি। * * *

"নয়টা বাজিতেই উৎসব বেশ জমিতে আরম্ভ হইল। স্থানীয় এক সঙ্কীর্ত্তন দল আসিয়া উচ্চকণ্ঠে গান ধরিল—"আয় রে আয় হরি বলে সবাই মিলে নাচি ভাই।" খোল-করতালের প্রখরধ্বনিতে তখন দশদিক মুখরিত। গায়কেরা ঘুরিয়া বার বার গাহিলেন—একবারে তাঁহাদের আশা মিটিল না। তাহার পর এক অভিনব দৃশ্য—মহোৎসবে আনন্দের আর এক অপূর্ব্ব পর্ব্ব। একসঙ্গে চৌদ্দখানি ঢাক জমায়েৎ হইল। মন্দিরের সমক্ষে ঢাকীরা বিনা বিলম্বে একটি গোল চক্র রচিয়া যেন সমর ক্ষেত্রে নামিবার জন্য প্রস্তুত। সুশ্যাম তাহাদের শরীর, সুদৃঢ় তাহাদের মাংসপেশী, সমুন্নত তাহাদের বক্ষ—ম্যালেরিয়া সহিয়াও তাহারা বলিষ্ঠ, বীর্য্যশালী। সকল ঢাকগুলিই সুকোমল পাখীর পালকের আচ্ছাদনে ঢাকা—কঠোর-কঠিন বুকের উপর কান্ত-কোমল আবরণ। বাদ্যযন্ত্র তাহাদের নিকট জড়পদার্থের সমষ্টিমাত্র নহে—উহা জীবন্ত প্রাণময়। সেইজন্যই উহার এত সাজগোজ, আভরণ অলঙ্কার। ক্রমে গুরুগম্ভীর গর্জ্জন আরম্ভ হইল,—হে বীর! অগ্রসর হও, জয় মা রণরঙ্গিনী বলিয়া শত্রুকূল বিনষ্ট করিয়া

বিপদে আত্মরক্ষা কর—এই বাণীই যেন মেঘমন্দ্র ঢাকগর্জ্জন হইতে প্রতিক্ষণ উত্থিত হইয়া দর্শকবৃন্দের প্রাণ মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে কাড়া-নাকাড়াও একজোটে তর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাই ক্ষণেকের জন্য সানাই শান্ত হইল—তাহার ক্ষীণশক্তি ইহাদের সঙ্গে সুর রাখিতে পারিতেছিল না। চারিদিক হইতে বাদ্যের সেই মহা-আহ্বানে গ্রামের লোকে ঘর ছাড়িয়া কাজ ফেলিয়া উপস্থিত। মা জাগ্রতা। ঢাকীদের ভিতর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পটু সে চক্রের মাঝে বীর সৈনিকের ন্যায় দাঁড়াইয়া বাজনার গতি ব্যাপ্তি বিস্তৃতি তাল ফাঁক সমস্ত দেখাইয়া দিতে লাগিল এবং বাকি সকলে একসঙ্গে একতালে সেই আদর্শ অনুসরণ করিতেছিল। যাঁহারা কলিকাতার ইডেন-উদ্যানের বাঁধান ছাউনীতলায় গোরার 'ব্যাণ্ড্' শুনিয়া চমকিত হন তাঁহারা আজ দেশের এই সমর-বাদ্য শুনিয়া গর্ব্বিত স্তম্ভিত পুলকিত। সুন্দর মনোরঞ্জন দৃশ্য দেখিয়া ও বাদ্য উপভোগ করিয়া সকলেই পরম পরিতুষ্ট। ডাক্তার দুর্গাবাবু আমাদের কাণে কাণে বলিলেন—ঠাকুর ও মা এসেছেন to revive old India—প্রাচীন ভারতকে সঞ্জীবিত পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার জন্য। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—কথা অতি সত্য।

"এই সময়ে গ্রামের একটি ছোট শিশু বাজনা শুনিতে ও বিরাট-জনতা দেখিতে দেখিতে আনন্দে মা'র কোলে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। তা'র ছোট হাত দু'খানি ও পা দুটি যত জোরে পারিল ছুঁড়িতে লাগিল। তখনও তাহার

কথা ফুটে নাই—আধ আধ বুলিতে প্রাণের পরম আহ্লাদ কেমন করিয়া ও কি যে বলিল—কে জানে? তাহার পর হঠাৎ সে নিথর নিস্পন্দ। মুখে শব্দের আর লেশমাত্র নাই, কেবল চোখ দু'টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত। সেই শিশুর মত আমরাও সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত;—কেমন করিয়া কি ভাবে জোটপাট হইয়া মহোৎসবের প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ণ পরিপুষ্ট হইতে ছিল—কে বুঝিবে?

"মন্দিরের ভিতর তখন প্রতিষ্ঠাপূজা পূরামাত্রায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নবদ্বার উন্মুক্ত। নানা দিক হইতে সমুৎসুক ভক্তবৃন্দ ও জননীরা জোড়করে ব্যাগ্রবদনে একটিবার 'দর্শনের তরে' প্রবাহাকারে ক্রমাগত আসিতে লাগিলেন। ক্ষৌমবস্ত্র-বিভূষিতা মা,—পদযুগলে সদ্যপ্রস্ফুটিত ভাবভক্তিবিমিশ্রিত অসংখ্য কমলদল। বায়ু ধূপ-ধূনার পুণ্যধূমে পরিপূর্ণ। শ্বেতপ্রস্তরের নিম্নবেদিকার উপর উত্তরাস্য আসনস্থ শুভ্রশির মাতৃপূজার ঋত্বিক্—স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পূজার সমস্ত উপকরণ সহ সহকারীদল। অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি—মন্ত্রোচ্চারণ চলিল। এদিকে শ্রীমন্দিরের সমক্ষে অত্যুচ্চ মঞ্চের উপরে নহবৎ-বাদকেরা সানাইয়ে সুর ধরিল।

"যিনি একদিন সান্ত হইয়া আমাদের দেখা দিয়াছিলেন—আজ তিনি অনন্ত—বিরাট। পল্লীর নিভৃত পূজা-প্রান্তরে আট হাজার মাথা তাঁহার পাদপদ্মে লুণ্ঠিত অবনত হইল। আট হাজার কণ্ঠ মা বলিয়া ডাক দিল। কে জানে কোন্ সকালে কেমন করিয়া মা তুমি সকলকে আহ্বান করিলে—কোন সুদূর

সাগর পারে কোন্ অজানা দেশ হইতে তোমার দেবদূতদের দলে দলে কাতারে কাতারে এখানে মিলাইয়া দিলে? জননী, আজ এই বিরাট মণ্ডলীর উপর তোমার কৃপা-করুণা দেখিয়া সন্তান মুগ্ধ স্তব্ধ বিস্ময়াপ্লুত। দেশ মাতৃকা তুমি—আমাদের কলুষভরা হৃদয় তোমার নির্ম্মল করস্পর্শে নিষ্কলঙ্ক কর। ব্যভিচারী আমাদের প্রাণ, চঞ্চল চিত্ত, অহংকারাচ্ছন্ন বুদ্ধি। অবোধ আমরা—কাতরে তোমারে কহিতেছি,—মা আমাদের ফেলিয়া দিলে চলিবে না। বারবার ভুল হইয়াছে, তথাপি কোলে তুলিয়া লইতে হইবে। মা আমাদের মানুষ কর—তোমার করিয়া লও। তোমার নিকটে আমাদের চাহিবার অনেক আছে, কারণ আমরা যে সর্ব্বগুণহীন! তাই আমাদের অভাব অনেক, ভিক্ষা অনেক। দাও মা, আমাদের বীর্য্য দাও, স্থৈর্য্য দাও, জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য দাও, সংযম দাও, তপস্যা দাও—আর দাও কার্য্যে একপ্রাণতা। শুনেছি, তোমার নাম কপাল-মোচন। তুমি আশীষ-করে আমাদের ললাটের সকল কুকর্ম্ম রেখা মুছিয়া ঘুচাইয়া দাও। আমরা বিশ্বের মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াই।

"এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মন মুগ্ধ। চারিধারে কোলাহল, ভক্তের বিপুল জনতা। পদে পদে লোক ঠেলিয়া যাইতে হইতেছে। কি দেখিলাম?—দেখিলাম মন্দিরের চত্তরের উপর উৎসব-মুখরতার মাঝে নিস্তব্ধ নীরবতা, কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে মোক্ষ-মুক্তিলাভেচ্ছুর শান্ত সৌম্য মুদ্রায় উপবেশন। সমস্ত বিস্তৃত উত্তর বারাণ্ডাটিতে স্তরে স্তরে শ্রেণীর পর শ্রেণী

কৃপাপ্রার্থীরা দলে দলে প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন—কখন্ তাঁহাদের তরে রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইবে, জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় তিনি আঁখি খুলিয়া দিবেন; কখন্ ডাক আসিবে, জন্ম সার্থক করিয়া আহ্বান-বাণী ঝরিবে। চক্ষে তাঁহাদের আশার চাতক-চাহনি, বাক্যহারা মুখে উপনিষদ্-ঋষির সেই প্রাচীন বচনের অস্ফুটধ্বনি—হে আচার্য্য, হে ভগবন! 'উপৈম্যহং ভবন্তং'—তোমার দ্বারে বদ্ধাঞ্জলি আমরা উপস্থিত। তোমার ঐ অভয়চরণে শরণ দাও, করুণা করিয়া তুমি আমাদের তোমার করিয়া লও, মায়ামোহের বন্ধন খুলিয়া দাও। দ্বাদশ-বর্ষের বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সেখানে দেখিলাম। ধন্য ইহারা—সার্থক ইহাদের জন্ম—আজ ইহারা মাতৃ-মণ্ডপে বরাভয়করা মায়ের দুয়ারে ব্রহ্মিষ্ঠ গুরুর কৃপালাভে কৃতার্থম্মন্য।

"এদিকে অসংখ্য ভাবস্তব্ধ দর্শক ও ধ্যান-জপ-রত ভক্তপরিবেষ্টিত মন্দির মধ্যে মায়ের পূজা চলিতে লাগিল। আচার্য্য আসিয়া একমনে স্থিরনয়নে একটির পর একটি সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত সমনুষ্ঠিত শুভকার্য্য দেখিতে লাগিলেন। তদ্‌ভাবাপন্ন—তন্ময়। প্রথমে শ্রীগুরুপূজা। তাহার পর বাস্তুপুরুষের পূজা। আজ আর একবার শ্রীগণপতির পূজা হইল। তৎপরে ক্রমে ব্রহ্মা, ষোড়শোপচারে বিদ্যাদায়িনী বাণী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা, বসুধারাপ্রদান, ষোড়শোপচারে প্রজাপতি ব্রহ্মা। এতগুলি আনুষাঙ্গিক পূজার পর আজিকার আসল বিশেষ যাহা—শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীমা'র অস্থি-স্নান ও ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা। ইহাই প্রতিষ্ঠা-

অনুষ্ঠান। তাহার পর হোমকুণ্ডে সমিধের উপর অগ্নিযোজনা হইল। তাহাতে বহুক্ষণ ধরিয়া হবিরাহুতি চলিল। আবার ধূপ-ধূনার ঘন জাল বিস্তারিত হইল। মন্দির মথিত করিয়া ক্রমাগত 'স্বাহা'রব উত্থিত হইতে লাগিল। ভিতরে ও বাহিরে চারিধারে জোড়করে অসংখ্য সন্তান দণ্ডায়মান—মা তাঁহাদের ভিতর প্রকট—জীবন্ত—জ্বলন্ত। ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণার সমক্ষে থরে থরে বিরাট ভোগরাগাদি একটির পর অপর একটি সুবিন্যস্ত হইল। বিরাট অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন। ভোগ নিবেদন হইয়া গেল। ভোগারতি আরম্ভ হইল। বাহিরের বড় ঘণ্টাটি ঢং ঢং রব তুলিয়া তাল ধরিল। সতৃষ্ণনয়নে গলবস্ত্র কৃতঞ্জলিপুটে সন্তানের দল দণ্ডায়মান। আরতি হইয়া গেলে পর জয়ধ্বনি করিয়া আরত্রিক গান ও স্তব পাঠ আরম্ভ হইল। তাহার পর বহু কণ্ঠ একত্রিত হইয়া ভজন আরম্ভ করিলেন।

"এদিকে অজস্র তরিতরকারী কুটা চলিতে লাগিল। পাকশালে পঁচিশজন সূপকার কোমর বাঁধিয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত, তাহাদের যোগান দিবার জন্য বহু কর্ম্মী নিযুক্ত। রন্ধনশালা সংলগ্ন বহুজনসমাকীর্ণ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সহসা কিয়ৎকালব্যাপী ঘণ্টাধ্বনি শুনা গেল। সেই আহ্বান সকল কর্ণের জন্য। কে কোথায় আছ এস—মা অন্নপূর্ণার অফুরন্ত ভাণ্ডার আজ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত—কে অভুক্ত, কে ক্ষুধিত—এস—মাতৃপ্রসাদ গ্রহণে ধন্য হও, জীবন সার্থক কর। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মীরা সুবৃহৎ ছাউনীর এক ধার হইতে অন্যধার পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর পংক্তির পর পংক্তি কুশাসনশ্রেণী

সাজাইয়া দেওয়া হইল। পাতা, লবণ, জলভাণ্ডে জল পড়িল। প্রথম দলে এই গ্রামের কেবল ব্রাহ্মণেরা বসিলেন। কতকটা সামাজিক ভোজ। তখন আন্দাজ বেলা সাড়ে বারটা। জগদম্বার কৃপায় তাঁহার 'ভিখারী' ছেলেরাই বদান্য ধনকুবেরের ন্যায় অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। নানাবিধ ভাজা, ডাল, কুমড়ার তরকারী, মাছের কালিয়া, চর্চ্চড়ী, অম্বল, দধি, বোঁদে, পায়েশ ইত্যাদি।

"এক পংক্তি উঠিতেছে, নিমেষে স্থান পরিষ্কার হইতেছে—অপর এক দল বসিতেছে। বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এই অফুরন্ত প্রসাদ বিতরণের পালা চলিল। বহু দূরস্থিত গ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিতেছে নিকটবর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এই বিরাট অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য বুঝিয়া মিথ্যা আত্মসম্মান ত্যাগ করিয়া মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। বিশেষভাবে নিমন্ত্রণের জন্য বৃথা অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই। এখানে আজ সকলের নিমন্ত্রণ। তাই দরিদ্র নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লীসমাজের বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চকুলের পুরুষ ও স্ত্রী, বালক বালিকা সকলেই সমভাবে সমবেত। সাধুবৃন্দ উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান সমাদর, সেবা ও আপ্যায়ন করিলেন। এরূপ মহদাচরণ মহতেই সম্ভব। ভক্তিমতী মহিলাদিগের একটি সুন্দর আচরণ দেখা গেল। বিরাট পংক্তিভোজনের পর তাঁহারা প্রসাদ হিসাবে ভুক্ত অন্নের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট পাইলেন পরম যত্নের সহিত আঁচলে বাঁধিয়া লইলেন—ভক্তের ভাবশ্রীক্ষেত্রে উচ্ছিষ্টের স্থান নাই।

যেখানে সঙ্কীর্ত্তন নামগানাদি হইতেছিল শ্রীমন্দিরের সমক্ষে সেই স্থানের পবিত্ররজও সংগ্রহ করিলেন।

"আপনভোলা কর্ম্মীর দল সারাদিবস নিজেরা অভুক্ত থাকিয়া ভক্তসেবায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সর্ব্বদাই তটস্থ। মুখে অনুক্ষণ আহ্বান বাণী, মায়ের জয়গান,—আঁখি অমিলন, দেহ শ্রান্তিক্লান্তিহীন। গৃহস্থ ভক্ত-দিগের ভিতর অনেকেই আপনার বংশমর্য্যাদা, কৌলিন্য, অর্থ-আভিজাত্যের সকল সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া দরিদ্রনারায়ণমণ্ডলীকে অন্ন-জল পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সুন্দর সে দৃশ্য। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে দরদর-ধারায় ঘর্ম্ম বহিতেছে—কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই—থাকিলে কাজ করা চলে না। অন্নশালায় এই প্রসাদ গ্রহনের প্রবাহ দুইচারি ঘণ্টার পর আজ নিরস্ত হয় নাই। রাত বারটা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। আজ বাঙ্গালা 'ম্যয় ভুখা হুঁ'র দেশ—এখানে এইরূপ অন্নবিতরণ অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ দান আছে কি না জানি না। পরে কর্ম্মিবৃন্দের নিকট হইতে জানিলাম সেই দিনে অন্যূন ৪০ মণ চাউল ও তদনুপাতে অন্যান্য জিনিষ খরচ হইয়াছিল।

"দারুণ গ্রীষ্মে জলের অত্যন্ত অধিক প্রয়োজন। সকাল, দ্বিপ্রহর, বৈকাল—তিনবেলাই 'ডাক বসাইয়া' কূয়া, ঘোষেদের পুকুর, সুদূর বাঁড়ুয্যে পুকুর হইতে জলতোলা হইতে লাগিল। শেষে যখন বাল্‌তিগুলির পরিবেশন বিভাগে ডাক পড়িল তখন অগত্যা নিরুপায় হইয়া কতকগুলি বড় বড় মাটির কলস আমদানী হইল। বিশেষ ভারি। ক্ষীণ দুর্ব্বল যাঁহারা তাঁহাদের তখন

বাধ্য হইয়া বিশ্রাম লইতে হইল এবং দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবকগণ তখন যেন সুবিধা পাইলেন ও অধিক ঔৎসুক্যের সহিত পরম আনন্দে কাজ আরম্ভ করিলেন। দ্বিপ্রহরের প্রখর তপনতাপে ছায়াবিহীন শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে পালা-ক্রমে যাঁহাদের স্থান পড়িয়াছিল তাঁহারা 'কাঠ-ফাটা' রৌদ্র কাহাকে বলে বেশ বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে কর্ম্মীদের মহোৎসাহের নিকট প্রখরোত্তাপ নিরুদ্যম হইয়া গেল। হৃদয় যখন ভাব-ভক্তি-প্রেমে ভরিয়া উঠে তখন শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়। মাঝে ক্লান্তি খুব বেশী হইলে দেখা গেল পুকুর-পাড়ে একটি গাছের সুশীতল ছায়াতলে একখানি মাদুর বিছাইয়া জলবিভাগের যিনি নেতা তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বোঁদে, ঠাণ্ডা সরবতাদি দানে পরিতুষ্ট ও পাখার হাওয়ায় শান্তি বিদূরিত করিতেছেন। দিল্‌ওয়ালা দরদী।

"চারিধারেই কর্ম্ম-প্রচেষ্টা। কাজ যত বেশী হইতেছিল তাহার তুলনায় বাহ্যিক হৈচৈ গোলমাল তত নাই। মুখ এক প্রকার বন্ধ, হাত-পাঁয়ের নিঃশব্দ ব্যবহারই বেশী। একটি গল্প মনে পড়ে—সেতুবন্ধনের সময় অমিতবলশালী তেজোদৃপ্ত বানরকুল তাহাদের সকল শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া যতদূর সম্ভব ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কাজে আপনাদের নিযুক্ত করিল। কিন্তু শক্তি অতি সামান্য বলিয়া বেচারী কাঠবিড়ালী চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিল না। ভগবান তাহাকে যতটু শক্তি দিয়াছেন তাহারই প্রয়োগ অকুণ্ঠ অন্তরে সে করিল। অতি ক্ষুদ্র ছোট হইলেও শ্রীভগবানের দয়াদৃষ্টি সেইজন্যই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তাই

তাঁহার আশীর্ব্বাদের ঋজুরেখা আজিও কাল তাহার পিঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাহার সেই সযত্ন সেবা দয়াল-দেবতার চক্ষে উচ্চস্থান পাইল। আজিকার এই বিরাট উৎসব-যজ্ঞেও যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য তিনি তাহাই কায়মনোবাক্যে মায়ের কাজে নিয়োগ করিলেন।

"আপনার আত্মাভিমান আত্মম্ভরিতা ঘুচাইয়া যোগ্যতম ব্যক্তির নিকট এই যে আত্মসমর্পণ—পাঁচজনে মিলিত হইয়া একজোটে সুচারু শৃঙ্খলা ও সুপদ্ধতির সহিত কর্ম্মপ্রচেষ্টা—ইহা দুর্ভাগা বাঙ্গালীর পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথা। জাতি হিসাবে এ শিক্ষা আমাদের মহা প্রয়োজনীয়। কারণ দলাদলি ভেদাভেদ—ইহা বাঙ্গলার সনাতন ব্যাধি। শুধু বাঙ্গলায় বলি কেন, ইহারই জন্য এই সাধের ভারত আদিকাল হইতে অত্যাধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ভুগিয়া আসিতেছে। একতার স্বর্ণশৃঙ্খলে সংবদ্ধ সেই বিরাট উৎসব রত জনমণ্ডলীকে দেখিয়া বোধ হইল বাস্তবিকই ইহারা ঋগ্বেদের ঋষির মিলনমন্ত্র সার্থক করিয়াছেন। এই কর্ম্মীরদলের ব্রত এক, উদ্দেশ্য এক, মন্ত্র এক, যজ্ঞ এক, দেবতা এক, মন এক, চিত্ত এক, সাধনা এক,—মাতৃপূজা, সুষ্ঠু সুচারু উপায়ে উহার সমাধান। ঋষি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'সংগচ্ছধ্বং' তোমরা মিলিত হও, 'সংবদধ্বং' একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, 'সংবো মনাংসি জানতাং' তোমাদের মন পরস্পর একমত হউক; 'সমানং মাংএমভি মংত্রয়ে বঃ' আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত (দীক্ষিত) করিতেছি। 'সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো

যথা সুসহাসতি'—তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও। মাত্র কয়েকদিনের জন্য নহে—জীবন-ভোর এই একত্বের বাঁধনে বাঁধা থাকিতে হইবে;—হে নবীন ভারত! পারিবে কি? তোমাকে আজ সত্যব্রত সত্যসঙ্কল্প সত্যকাম হইয়া মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। জাতির জীবনমঞ্চে আত্মসম্মানের মহা আহ্বান আসিয়াছে। আজ এই একত্বের বাণী সফল করিয়া তোল। সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

"বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। উৎসবভূমিতে দারুণ ভিড়। চারিধারে জনস্রোতের ঠাসাঠাসি—মেশামিশি। জনতার মধ্যে পূর্ব্বপরিচিত একজন চিররুগ্ন ক্ষীণদেহ ভক্তকে হঠাৎ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম—শরীর একান্ত দুর্ব্বল হইলেও মনের টানে তিনি এখানে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া আজ দ্বিপ্রহরেই একটি ছোট সঙ্গীতের আসর আমাদের কালীঘরেই বসিল। মহামায়ার মনোহারী ভজন। প্রায় দুই ঘণ্টা চলিল। বেশ জমিয়াছিল। এই চক্রকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

"বৈকালে কেহ কেহ কিছু কিছু ছুটী লইয়া আমোদর তীরে নিত্যকৃত্যাদি সমাপন করিয়া কিছুক্ষণের জন্য হাঁফ ছাড়িতে উপস্থিত হইলেন। যাঁহাদের ইচ্ছা হইল তাঁহারা নদীতে দ্বিতীয়বার স্নান করিয়া শান্ত স্নিগ্ধ হইলেন। এদিকে অন্য কর্ম্মীর দল তাঁহাদের স্থান লইলেন। উৎসবক্ষেত্রে

"দীয়তাং ভুজ্যতাং" রব সমভাবেই চলিতে লাগিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মন্দিরে ও আশে পাশে দুই চারিটি চেরাগ সবেমাত্র প্রজ্জ্বলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মন্দিরের ঠিক সামনের আঙ্গিনাতে প্রায় জন পনের লাঠিয়ালকে ঘেরিয়া অসংখ্য লোক তাহাদের হাতসাফাই উপভোগ করিতেছেন। আচার্য্যও দ্রষ্টা—মন্দিরের উপরের চত্বরে সমাসীন। খোলোয়াড়গণ খুব বলবান—বীর। প্রাচীন মল্ল-ভূমির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া সকলেই পরিতুষ্ট। তাহাদের অনেকের মাথায় এক টুক্‌রা করিয়া লাল ন্যাকড়া, পরণে সামান্য লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত খানিকটা কাপড়, কাহারও কাহারও মাত্র লেংটী। খেলিবার পদ্ধতি বেশ চমৎকার। একজন কৌশলে সকল দ্রষ্টাকে বিষয়বর্ণন করিল। যে দক্ষ ব্যক্তি খেলা দেখাইবে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া একজন বলিল—'ভাই, সেই খেলাটি দেখাবি—যাতে লাঠিটি পর্য্যন্ত দেখা যাবে না?' অমনি বন্ বন্ করিয়া লাঠি ঘুরিতে লাগিল—ক্রমে প্রায় অদৃশ্য। সকলেই বারবার বাহবা দিলেন। বিরাট মণ্ডলী খেলা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। দক্ষলোকে বড় আসরেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

"সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আজ প্রথম নবমন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নূতন সাজে নূতন বেদীর উপর সমাসীনা মা—চতুর্দ্দিকে অনিমেষ নয়নে অসংখ্য সন্তানের দল দণ্ডায়মান। সকলে প্রাণ ভরিয়া মায়ের নবরূপ দেখিতে লাগিলেন। পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূরালোক মায়ের বদন মণ্ডলে

প্রতিফলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন সজীব হইয়া উঠিলেন,—হাসিমাখা আনন্দময়ী মূর্ত্তি।

"তাহার কিয়ৎকাল পরে গত রাত্রের ন্যায় আজিও সকলে একসঙ্গে বসিয়া মায়ের নাম করিতে লাগিলেন। 'মাকে কি দেখেছিস তোরা বল্ সত্যি ক'রে, মায়ের নব নব নবরূপে ভুবন মন হরে।' সঙ্গীত শুনিয়া পরিতৃপ্ত। শেষে আচার্য্যের দাওয়ার সমক্ষে সামিয়ানা তলে স্থানীয় দলের কীর্ত্তন শেষ হইলে তাঁহাকে আবার খানিকক্ষণ ব্রহ্মময়ীর নাম শুনাইয়া আমাদের গায়কেরা সেই দিনকার মত গীতবাদ্য সমাপন করিলেন।

"স্বামী ভূমানন্দজী এই সময় আচার্য্যকে আজিকার একটি বড় মজার কথা বলিলেন। বহু দূর স্থান হইতে আগত একদল মেয়েছেলে পংক্তি ভোজনে বসিয়াছেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। খানিকটা খাওয়া-দাওয়া হইয়াছে। হঠাৎ এক ভীষণ আতঙ্কের কলরব উঠিল—ছেলেধরা! সকলে ভোজন অর্দ্ধসমাপ্ত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং যে যাহার পথ দেখিতে উদ্যত হইলেন। কে রটাইয়া দিয়াছে যে এই খাওয়ানর উছিলায় সাধুরা ছেলে চুরি করিয়া রাখিবার মতলব করিয়াছেন; —তাই ছেলেধরার আতঙ্ক! এই আতঙ্ক দূর করিয়া সকলকে আবার বসাইতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

"কাঙ্গাল গরীব মেয়েরা, শিওড়, দেশড়া, কোয়ালপাড়া, শ্যামবাজার, বদনগঞ্জ, কামারপুকুর, তাজপুর, আনুড়, সাতবেড়া রামজীবনপুর, ঝরিয়া, বেলটে প্রভৃতি বহুদূর স্থান হইতে দলে



দলে কাতারে কাতারে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত। কাঁকে দুই একটি করিয়া অনেকের ছেলে মেয়ে, পরণে শতছিদ্র জীর্ণবাস, রুক্ষকেশ, ক্ষীণদেহ। ইহাই আজিকার নিছক বঙ্গপল্লী। বাস্তবকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাত্রে দূরস্থানে আলোকহীন হইয়া তাহাদের পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া দুষ্কর। তাই লম্বা পথের দুই ধারে সারি সারি সকলে শুইয়া রহিল।

"হঠাৎ ভিড়ের ভিতর সন্ধ্যার সময় একদল মাথায় পাগড়ী বাঁধা 'ব্যাগপাইপ'ওয়ালা আসিয়া দেখা দিল। তাহাদের বাজনার সুমিষ্ট মধুর স্বরে সকলেই তুষ্টি লাভ করিলেন। তাহারা মুসলমান। মহোৎসব হইবে খবর পাইয়া কোয়ালপাড়ার পথে আসিতেছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সেখানে বিশ্রাম করিয়া ঠিক সময়ে এখানে উপস্থিত হইতে পারে নাই—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

"বিরাট অনুষ্ঠান রাত্রি বারটার পর শেষ হইল। সকলেই কর্ম্মভারাক্রান্ত, কিন্তু প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল। আজ রাত্রে শয়ন— এক মস্ত সমস্যা। যিনি যেখানে পারিলেন স্থান করিয়া লইলেন। যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহারা এই দুপুর রাত্রে ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরিয়া ব্যাপার দেখিয়া একেবারে নির্ব্বাক্। নিরুপায়—অগত্যা এদিকে-সেদিকে এক আধটুকু স্থান করিয়া সকলে রাত্রি কাটাইলেন।

"আসল দিন কাটিয়া গিয়াছে—মায়ের দয়ায় অসম্ভব সম্ভব, অলীক বাস্তব হইয়াছে। চিন্তা-উদ্বেগ যথেষ্টই থাকিবার কথা —কিন্তু তাঁহার কাজ তিনিই আচার্য্যকে নিমিত্ত করিয়া সুচারুরূপে

সম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন। এতদিন যাঁহার মনের উপর ভাবনার ভীষণ বোঝা চাপিয়াছিল, তিনি আজ পরম শান্তিস্বাচ্ছন্দ্য পাইলেন। 'তুকুড়ি সাতের খেলা' হইয়া গেলে খেলুড়ে যেমন নিশ্চিন্তমনে ক্রীড়াবিশেষে রত থাকিতে পারেন—অতঃপর সেই-ভাবেই উৎসবের খেলা চলিতে লাগিল।

"শুক্রবার ৭ই বৈশাখ। গতকল্যকার জের আজও কতকটা চলিল। অন্ত দিবারাত্রে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইলেন। বেলা আন্দাজ তিনটার সময় যখন পংক্তিভোজন পুরাদমে চলিতেছিল, তখন হঠাৎ ঈশানকোণে ঘনঘটা করিয়া একটি বড় গোছের ঝড় তুলিল। ক্রমে অবিরত ধারাপাত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দামিনী চমকিল। অর্দ্ধেক-অসমাপ্ত অন্ন হাতে লইয়া খোলা জায়গা হইতে ছাউনীর ভিতর অনেককেই উঠিয়া যাইতে হইল—কর্ম্মীরা জলঝড়ে ভিজিয়াই পরিবেশন চালাইলেন। এই অসুবিধা ছাড়া মোটের উপর গতকল্যকার অত্যধিক পরিশ্রম ও গরমের পর অন্তকার এই বারিপাত খুবই আনন্দ দিল ও বিশেষ শান্তি-সোয়াস্তির কারণ হইল। শুষ্কভূমি, নীরস তরু ও কর্ম্মীর ক্লান্তকায়া এই সেচনের ফলে সরস ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

এ অঞ্চলের লোক যে বেশ 'খাইয়ে' তাহার একটি প্রমাণ আজ চক্ষের সমক্ষে পাওয়া গেল। একজন প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ় বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়াই নির্ব্বিকারচিত্তে খাইতে লাগিলেন। বলিলেন—'বাবু, আমাকে বহুদূরে যেতে হবেক শীঘ্র যা দিবার 'দি' যাও'—এই বলিয়া প্রচুর তরকারী ও

অন্যান্য উপকরণাদিসহ একটি ছোট বাল্‌তির এক বাল্‌তি অন্ন-প্রসাদ নিঃশেষ করিল—বড় ক্ষুধা তাহার।

"আজ সর্ব্বশুদ্ধ বাইশজন আচার্য্যের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইলেন। যাঁহাদের কাজকর্ম্মের বিশেষ তাড়া ছিল তাঁহারা অদ্যই গম্যস্থানাভিমুখে রওনা হইলেন। আরামবাগ ও বিষ্ণুপুরের ভক্তেরা নিজ নিজ স্থানে যাত্রা করিলেন—কারণ দূরাগত ভ্রাতৃবৃন্দের তাঁহারাই আশ্রয়। সন্ধ্যার পর আরাত্রিক নিত্য ভজনাদি সমাপনান্তে ভক্তবৃন্দ একজোট হইয়া শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ঘনঘন করতালির সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্বরে নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন:—'মা আছেন আর আমি আছি ভাব্‌না কি আছে আমার'—মরমের ভাষা প্রাণের ভাব—'ভুলে থাকি তবু দেখি, ভুলেও না মা একটীবার, স্নেহের আধার মা যে আমার, আমি যে মা'র মা আমার'।

"আজ রাত্র প্রায় তিনটার সময় নিস্তব্ধ নিভৃত মন্দিরে ব্রহ্মচর্য্যের হোমকুণ্ডে ও বিরজার প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞজ্বালে আচার্য্যের কৃপায় আট জন ব্রহ্মচর্য্য ও এগারজন সন্ন্যাস লাভে জন্ম-সার্থক করিলেন। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। শ্রীস্বামিজী যাঁহাদের চাহিয়াছিলেন, ইঁহারা সেই 'অভীঃ'রই দল—'Purest freshest flowers at the altar of God।' আজ ইঁহারা মায়ের রাঙাচরণে শরণ লইলেন। এই চির-অনুগত সন্তানদিগের জীবন-কমলই অত্র অনুষ্ঠিত শক্তিপূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—যোগ্য নিবেদন।

"শনিবার ৮ই—প্রত্যুষে উঠিয়া আমোদরতীরে যাইবার সময় গুরুগম্ভীর স্বরে ঐক্যতানে মন্দিরের ভিতর হইতে অবিরাম 'স্বাহা' 'স্বাহা'রব উচ্চারিত হইতেছে শুনা গেল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মহামন্ত্রের স্বর্গীয় ঝঙ্কার। দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী বাঙ্গলার যুবকবৃন্দ বিরজার যজ্ঞকুণ্ডে আপনাদের সর্ব্বস্ব আহুতি দিতেছেন—মান অভিমান, কামক্রোধ লোভাদি ষড়্‌রিপু প্রভৃতি যাহা কিছু। সন্ন্যাস চূড়ান্ত আত্মাহুতি। তাঁহাদের শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি—অঙ্গে ভিখারীর গৈরিক বস্ত্র, কণ্ঠে সর্ব্বজীবে 'অভীঃ' 'অভীঃ' বাণী মৈত্রীমন্ত্র। আচার্য্যের অনাবিল আশীর্ব্বাদের পূত ধারায় তাঁহারা সদ্যোস্নাত নবজাত তেজোদৃপ্ত দিব্যমানব।

"আজও পূজা-অর্চ্চনায় কাটিল। দ্বিপ্রহরে ঘটে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-মাতার আবাহন ও পূজা হইল। সাতজনের দীক্ষালাভ। রাত্র ১১ টার পর কালীপূজা ও চারিজনের তন্ত্রোক্ত পূর্ণা-ভিষেক। ভক্তসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে লাগিল।

"পরদিন রবিবার—বিশেষভাবে সংখ্যার হ্রাস অনুভূত হয়। ১০ই আচার্য্য ও তাঁহার সহিত অনেকে প্রতিষ্ঠাব্রত সাঙ্গ করিয়া তথা হইতে শ্রীধাম কামারপুকুরে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করেন। তাহার পর কোয়ালপাড়া মঠে তিন দিন, আবার বিষ্ণুপুরে দিন দুই যাপন করেন। শেষোক্ত দুই স্থানে অনেকেই তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হন। বহুদিন যাঁহারা আশাপথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের শুভকামনা সফল হইল। কোয়ালপাড়ায় কুড়িজন ও বিষ্ণুপুরে দশজন দীক্ষালাভে ধন্য হন।

"স্বামী মহেশ্বরানন্দজী প্রমুখ বাঁকুড়ার সাধুবৃন্দের, আচার্য্যকে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে লইয়া যাইয়া দুই একটি মাঙ্গলিক কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া লইবার একান্ত ইচ্ছা, সফল হইল। বহু ভক্তের সহিত তিনি তথায় যাইয়া পাঁচদিন অতিবাহিত করিলেন। সেখানে ক্ষুদ্রাকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্ম্মিত মন্দির গৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইল। সেবকদিগের ঐকান্তিক যত্ন ও পরম আগ্রহের কথা সকলেই বলিয়াছেন। আশ্রমের ফাঁকা বেষ্টনীর শান্ত শীতল বায়ু ও সুন্দর অবস্থিতির প্রশংসা আচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি। এখানেও সর্ব্বশুদ্ধ তেত্রিশ জনকে তিনি কৃপা করেন।

"সর্ব্বশেষে ১৯শে বৈশাখ এখান হইতে যাত্রা করিয়া ২০শে বৃহস্পতিবার সকালে তিনি কলিকাতায় পৌছান।"

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বাঁকুড়া হইতে উদ্বোধনে ফিরিয়াছেন। এখন আমাদের তেমন কাজের ব্যস্ততা ছিল না সুতরাং কাশী-ধামে শরৎ মহারাজ কি করিতেন, কেমন ছিলেন সকল কথা জানিবার একটা আগ্রহ ছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে সেবকগণের সহিত কাশীর গল্প হইত। উল্লেখযোগ্য অনেক কথা থাকিলেও একটি বিষয়ের কথা আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের সীমাহীন সহনশীলতা সকল অবস্থায় অব্যাহত থাকিলেও, কাহার মুখে বিশেষতঃ মঠের সাধুদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর কিম্বা শ্রীশ্রীমার কাজের সমালোচনা কিম্বা কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বভাবের প্রতি কটাক্ষ করিতে যাইয়া ঠাকুর বা মার কাজে সন্দেহ সূচক কোন কথা শুনিলে

তিনি সহ্য করিতেন না। বিষম ধমকুনি দিয়ে বলিতেন,—'খুঁটি ধরে যার যেমন ইচ্ছা ঘুরতে থাক কিন্তু খুঁটি ছেড়ে দিয়ে ঘুরতে যেও না মুহূর্ত্তে তলিয়ে যাবে।'

ইং ১৯২২ খ্রীঃ এর শেষভাগে শরৎ মহারাজ কাশী ধামে আসিয়াছিলেন। আমরা সে সময় ঢাকা সহরে ছিলাম। সেই সময় নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল যাহা তাঁহার সেবকগণের নিকট পরে যেমন শুনিয়াছিলাম তাহা যথাযথ বিধিবদ্ধ করিলাম :—

একদিন উভয় আশ্রমের সাধুগণ শরৎ মহারাজের নিকটে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন এমন সময় একজন সাধু শরৎ মহারাজকে বলিলেন,—মহারাজ! অমুক মার নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধু হয়েছিলেন কিন্তু শেষটা তাকে বে করতে হ'ল কেন? কথা বলিবার দোষে কণামাত্র অগ্নি স্পর্শে বারুদের স্তূপ যেমন জ্বলিয়া উঠে শরৎ মহারাজ এত সহনশীল এত গম্ভীর, এত চাপাপ্রকৃতির হইয়াও জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—'কি বল্লে তুমি?' আক্ষেপকারী সেই রুদ্র রোষের সম্মুখে মস্তক নত করিয়া রহিলেন। তখন শরৎ মহারাজ উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—মা কাকে কোন পথ দিয়ে তাঁর কাছে টেনে নেবেন তা যখন আমরা কেউ জানি নে, কার কোন বাসনা কি ভাবে পুরণ করিয়ে মা কেমন করে তাঁর ছেলেদের গতি মুক্তি দিবেন তা যখন কেউ বুঝতে পারিনে তখন কে কি করলে না করলে সে দিকে দৃষ্টি না রেখে, লোকের দোষ দর্শন না করে যাতে আমাদের ঠাকুর মায়ের পাদ পদ্মে মতি থাকে তার জন্য দিন রাত প্রার্থনা

করা কর্ত্তব্য। আমি ত বাপু তাকে মন্দ বলতে পারলেম না কিম্বা সে অন্যায় করেছে সে কথাও মনে আনতে পারি নি। তুমি আমি সকলেই মায়ের হাতে খেলে যাচ্ছি। তিনি যাকে যেমন ইচ্ছা তাকে দিয়ে তেমন খেলিয়ে নিচ্ছেন। বেশী আর কি বলব—খুঁটি ধরে যার যেমন ইচ্ছা ঘুরতে থাক কিন্তু সাবধান! খুঁটি ছেড়ে দিয়ে ঘুরতে যেও না মুহূর্ত্তে তলিয়ে যাবে।' কিছুক্ষণ স্তব্ধের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিয়া গদগদ ভাবে বলিতে লাগিলেন,—'তাঁর লীলা, তাঁর খেলার সামান্য মাত্রও বুঝতে পারলেম না। জীবন ব্যাপী পরিশ্রমের ফলে মাত্র এই বলতে পারি'—পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার কথা ফুরাইল। তিনি সুমধুর কণ্ঠে গাহিলেন,—

'ও তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী (আমি) অবাক হয়েছি।
এতদিন ত সঙ্গে করে ফিরালি মা বৃথা মোরে
এখন আমি মনে মনে হার মেনেছি—॥
ও তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।"

উভয় আশ্রমের সাধুবৃন্দ শরৎ মহারাজের মধ্যে গভীর উচ্ছাশ দেখিয়া পুলকিত হইলেন। শরৎ মহারাজের ঠাকুর ও মার পাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। শরৎ মহারাজের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস বাক্যে প্রকাশ পাওয়ায় আক্ষেপ-কারীর পক্ষে সে স্থান তখন অসহ্য বোধ হইতেছিল। আক্ষেপ-কারী ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

এইবার ঢাকা ফিরিতে হইবে। শরৎ মহারাজকে নিবেদন করিলাম। তিনি ভাল দিন দেখিয়া দিলেন। সেই দিন

রাত্রির গাড়ীতে ঢাকা রওনা হইলাম। দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্দ্দিষ্ট কাল ঢাকায় থাকা পূর্ণ হইল। শারদীয়া পূজার অধিবাশের দিন ঢাকা মঠ হইতে যাত্রা করিয়া সপ্তমী পূজার দিন সকালে উদ্বোধনে আসিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলাম। তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পূজা গত হইল। বিজয়ার দিন সন্ধ্যার সময় সকলে আসিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলাম। তিনি দাঁড়াইয়া আমাদের সকলের সঙ্গে বিজয়ার কোলাকুলি করিলেন। কি আনন্দ!

একদিন নীচে বসিবার ঘরে সন্ধ্যার পর হরি মহারাজের প্রসঙ্গে কথা হইতেছে দেখিয়া বাহিরের রকের উপরে বসিলাম। শুনিলাম শরৎ মহারাজ বলিতেছেন,—'হরি ভাই পুরুষকারের জীবন্ত মূর্ত্তি। নিজ অধ্যবসায়ে তিনি শাস্ত্রজ্ঞ হয়েছিলেন। কঠোর সাধনা করিতে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। হিমালয়ের যে প্রদেশে হিন্দু স্থানী শরীর সাধুগণ ভয় পেয়ে থাকেন হরি ভাই এমন স্থানে কুঠিয়া বেঁধে তপস্যা করেছেন, নিত্য প্রায় ২।৩ মাইল দূরে গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে আনতেন।'

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরি মহারাজ আমেরিকায় কত দিন ছিলেন?' শরৎ মহারাজ বাঁধা প্রাপ্ত হইয়া থামিয়া গেলেন। সান্ন্যাল মহাশয় হরি মহারাজের আমেরিকা প্রবাশের গল্প আরম্ভ করিলেন।

আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঠাকুরের শিষ্যগণ সকলেই যেন একটা ভাব আশ্রয় করিয়া সকল কাজ

করিতেন। একটা ভাব আশ্রয় করিয়া যাহা বলিবার বলিতেন। কিন্তু তাহাতে প্রশ্ন হইলেই দেখিয়াছি সে গল্প হয় বন্ধ হইয়া গেল নতুবা সংক্ষেপে সমাপ্ত হইল। এই জন্য আমরা কখন প্রশ্ন করিতাম না। কিন্তু বাহিরের লোক কালেভদ্রে একদিন আসিয়া সেই একদিনে সকল সংবাদ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়া প্রাচীনগণের ভাবে ব্যাঘাত জন্মাইয়া গোলে পড়িতেন ভিন্ন কখন সকল জানিয়া লইতে পারেন নাই। নিত্য আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

একদিন ডাক্তার কাঞ্জিলালের শেষ দিনের কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। ডাক্তার দুর্গাপদবাবু অগ্রে শরৎ মহারাজ পশ্চাতে ধীরে ধীরে কাঞ্জিলালের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। একটু অগ্রসর হইয়াই দুর্গাপদবাবু ফিরিয়া শরৎ মহারাজকে খুব চুপিসারে বলিলেন—কাঞ্জিলাল দেহরক্ষা করিয়াছেন। দুর্গাবাবু এমন ভাবে শরৎ মহারাজকে সঙ্গে করিয়া বারাণ্ডায় আসিলেন যাহাতে সকলেই বুঝিলেন,—রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত না জন্মে এই জন্য তাঁহারা বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তারপর যখন সকলে বুঝিল কাঞ্জিলালের নিঃশ্বাস পড়িতেছে না তখন সকলে কাঁদিয়া উঠিল। এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিবার পরে বলিলেন, —কাঞ্জিলালের স্ত্রী তাঁর মেয়ের বাড়ী ধারে পৃথক বাড়ীতে আছেন, আর চিতু শিমি (কাঞ্জিলালের অপর পক্ষের কন্যাদ্বয়) তাদের মামা হৃষীর (শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়) বাড়ীতে আছে।

এই হৃষীবাবুকে তাঁহার বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে এক ব্যক্তি চল্লিশ হাজার টাকা নগদ দিতে চাহিয়াছিলেন। হৃষীবাবু খুব ভোরে

উঠিয়া উদ্বোধনে আসিয়া শরৎ মহারাজকে সকল কথা নিবেদন করিয়া—কি করিবেন জানিতে চাহিলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'তুমি যা স্থির করেছ তাই করবে।'

হৃষীবাবু বলিলেন,—কিছু স্থির করতে না পেরেই ত আপনার কাছে এসেছি।

শরৎ মহারাজ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—স্থির কর্‌তে পেরেছ বলেই ত এখানে এসেছ।

হৃষীবাবু টাকা নিবেন না বলিয়াই ত পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার ঐ টাকা গ্রহণে সম্মতি থাকিলে যে তিনি কখন আসিতে পারিতেন না, শরৎ মহারাজের কথার ইঙ্গিতে এই কথা বুঝিতে পারিয়া হৃষীকেশবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলন।

আজ এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের সহিত গোস্বামী শ্রীবিজয়কৃষ্ণের একদিনের আলাপের কথা মনে জাগিতেছে। ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানে চিকিৎসার জন্য রহিয়াছেন। একদিন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি উপবেশন করিলেন। তখন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত ত দেখলে ষোল আনা কোথায়ও দেখলে কি?" উত্তরে গোঁসাইজী বলিলেন,—'না মহাশয়, কোথায়ও এক আনা কোথায় ও দুই আনা এমন কি বড় জোর বার আনা দেখেছি কিন্তু ষোল আনা 'মানুষ' এখনও দেখি নাই।' ঠাকুর বলিলেন,—"মিথ্যাকথা বলছ।"

গোস্বামী শ্রীবিজয়কৃষ্ণের মুখ লাল হইয়া উঠিল। মিথ্যা-কথা! তিনি ভাবিতে লাগিলেন—মিথ্যাকথা কেমন করিয়া বলিলাম? তাঁহাকে গম্ভীর ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার ষোল আনার ভাব একটা নিশ্চিত রয়েছে, না হলে তুলনা করলে কেমন করে?

গোঁসাইজীর মুখ পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—'আমার ষোল আনার ধারণা আপনি।'

ঠাকুরও হাসিয়া বলিলেন,—তা যেই হক, বল একজন তা হলে দেখেছ যার সঙ্গে তুলনা করে তবে তুমি এক আনা দু আনা এমন কি বার আনা বলতে পেরেছ।"

গোঁসাইজী মৌন থাকিয়া ঠাকুরের কথাই সমর্থন করিলেন। মানুষ অজ্ঞাতসারে অনেক সময় নিজেকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের দিব্য দৃষ্টি লাভ হইয়াছে তাঁহারা মানুষের কাজের মধ্য দিয়াই তাহার প্রকৃত মনোভাব যে কি তাহা জানাইয়া দিয়া থাকেন।

শরৎ মহারাজের নিকট যে শুধু হৃষী বাবুই এই রকম অবস্থায় পড়িয়া আসিয়াছিলেন তাহা নহে। যাঁহারা সকল অবস্থায় শ্রীশ্রীমহারাজের নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইদানীং শরৎ মহারাজের নিকট সদা-সর্ব্বদা পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিতেন।

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে এক দিন শরৎ মহারাজ আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাল সান্যাল মহাশয় বলছিলেন মাদ্রাজ রেল লাইন ভেসে গেছে। তোমরা ত খবরের

কাগজ পড়, কি হয়েছে বল ত ?” আমি বলিলাম,—ক্রমাগত তিন দিন ভয়ানক জল হওয়ায় গঞ্জাম (মাদ্রাজ) জেলায় বন্যা হয়েছে। সেই বন্যায় রেল লাইন ভেসে গেছে, পুল ভেঙ্গে গেছে, মাদ্রাজ মেল বন্ধ আছে।’

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—তোমরা যাবে কি ?

আমি বলিলাম,—‘তা কেমন করে বলব। মঠ থেকে যদি কাজের ব্যবস্থা হয় আর আমায় যদি পাঠান যেতে প্রস্তুত আছি।’

সেই দিন বৈকালে মঠ হইতে উদ্বোধনে লোক আসিয়া শরৎ মহারাজকে জানাইলেন,—‘মঠ হতে গঞ্জাম জিলায় কাজ হবে কি না তা তদন্ত করবার জন্য লোক পাঠান হবে। প্রয়োজন হলে ভূমানন্দ মহারাজকেও যেতে হবে।’

শরৎ মহারাজ বিপন্নের জন্য সেবা কার্য্য আরম্ভ হইতেছে জানিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—“ভূমানন্দ বলছিল সে যেতে রাজী আছে।”

মঠের লোক মঠে ফিরিয়া গেলেন।

গঞ্জাম হইতে ফিরিয়া পুরী আসিয়াছি। ইচ্ছা ছিল শ্রীশ্রীমার উৎসবের পূর্ব্বেই উদ্বোধনে ফিরিব। এই কয় দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন করিব। পুরী আসিয়া ‘শশী নিকেতনে’ আশ্রয় লইয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীমার উৎসবের পূর্ব্ব দিন পুরী হইতে যাত্রা করিব স্থির ছিল। কিন্তু নানা কারনে রওনা হইতে পারিলাম না। মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। শরৎ মহারাজকে সকল কারন নিবেদন

করিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি সেই পত্রের উত্তর উৎসবের পরে দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখাছিল,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

কলিকাতা
৩১।১২।২৩
১৫ই পৌষ

পরম কল্যাণীয়,

শ্রীমান্ ভূমানন্দ, তোমার ২৯শে তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমার কৃপায় উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এখানে ৭ শতের অধিক (অন্যান্য বারের অপেক্ষা অধিক) মেয়েরা এবং বেলুড়ে ২॥০ হাজারের অধিক ভক্তেরা প্রসাদ পাইয়াছিল। তুমি না আসায় আমি বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম তুমি অসুস্থ হইয়াছ—এখানে দেখা শুনা কে করিবে। যাহা হউক সব ভালয় ভালয় হইয়া গিয়াছে এবং তুমিও ভাল আছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। * * * রেণুকণা তাহার জন্ম দিনে সন্ধ্যায় এখানে আসিয়াছিল। ভাল আছে। আমার শরীর ভাল আছে। যোগীন মার ইতি পূর্ব্বে অনেক দিন শরীর ভাল ছিল। উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে আবার কিছু খারাপ ও দুর্ব্বল হইয়াছে। গোলাপ মার পায়ে বাতের ব্যথা আছে। তবে কাজ কর্ম্ম কিছুই বন্ধ হয় নাই। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ জানিবে। যোগীন (সম্বিদানন্দ) উৎসবের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া উৎসবে খুব খাটিয়াছে। অন্য সকলেও যথা সাধ্য খাটিয়াছে।

সকলে ভাল আছে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের উৎসবের কয়েক দিন পরে একদিন নীচের বসিবার ঘরে বৈঠক বসিয়াছে। ভক্তগণ আসিয়াছেন। ঘর খানা ছোট বলিয়া বাহিরের রোয়াকেও অনেকে বসিয়াছেন। এমন সময় স্বামী পূর্ণানন্দ বিনীত ভাবে শরৎ মহারাজকে যেন সংবাদ দেওয়া হিসাবে বলিতে লাগিলেন,—'মহারাজ! ইদানীং দুই এক খানা মাসিক পত্রিকা কর্ম্মে প্রবৃত্তি জাগাবার জন্য অতি মাত্রায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন। তাঁরা বলেন,—মুক্তি নিয়ে কি হবে! তাঁদের মতে—জপ ধ্যান করা আর বৃথা সময় নষ্ট করা একই কথা!'

শরৎ মহারাজ গম্ভীর ভাবে সকল কথা শুনিলেন। তারপর গভীর ভাবে বলিলেন,—"কর্ম্ম বিমুখ দেশে কর্ম্মের প্রেরণা যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা দেশের মঙ্গলকামী সন্দেহ নাই। যাঁদের কথা তুমি বলছ তাঁরা কি বলেছেন তা আমি কখন পড়ে দেখি নি। তবে তুমি যা বলছ তা যদি তাঁদের মত হয় তাহলে বলতে হবে—জপ ধ্যান যদি না করবে তবে ভাব বজায় রাখবে কেমন করে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—'কর্ম্ম কে কচ্ছে না—বলতে পার? যার প্রাণ আছে সেই কর্ম্ম কচ্ছে। তবে সে কাজ হয় ত সকলের ভাল লাগে না। আমরা যে কাজ ভালবাসি তা যদি আদর্শ হয়

তবে আদর্শে পৌঁছিবার জন্য সে কাজ করতে অপরকে বললে দোষের কিছু হবে না জানি কিন্তু যদি বলি আমরা যা বলছি তাই এক মাত্র পথ—বাকী সব ঠিক নহে—তা হলে কিন্তু সত্যের অপলাপ করা হবে।

"যাঁরা কর্ম্ম বলতে শুধু অর্থোপার্জ্জন মনে করেন তাঁদেরও ত লৌকিক, সামাজিক কাজ গুলো করতে দেখা যায়! কর্ম্ম বলতে যাঁরা দেশের সেবা মনে করেন তাঁদের মধ্যেও ত অর্থোপার্জ্জনে যে সময় ব্যয় হচ্ছে তা কি তবে বাজে?

"আসল কথা কি জান,—দল বাড়াবার জন্য যিনি যেমন তিনি তেমন বলে যাচ্ছেন। বিচার করে দেখতে গেলে জপধ্যান ও কর্ম্ম কপালের ঘাম পায়ে ফেলে যে অর্থোপার্জ্জন করা তাও কর্ম্ম। এই কর্ম্মের মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ বিচার করে দেখতে পারলে দেখা যাবে সমাজের উন্নতির জন্য সকলগুলিই ভাল। এর যেটি না করবে সে দিকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর সেই অসম্পূর্ণ পথে যত অমঙ্গল এসে মানুষকে ভাব হারা, লক্ষ্মীছাড়া করে ছাড়বে।

"ভাব হারা হয়েই না দেশের এত দুঃখ। কেন সে ভাব হারা হল? কেন সে একটা বিশেষ ভাব নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে না? তার মানে—যে কর্ম্মদ্বারা মানুষের চিত্তশুদ্ধি হলে সে আর কাউকে মন্দ দেখতে পারে না, যে কর্ম্মেরদ্বারা মানুষের শিক্ষা দীক্ষা আরম্ভ হলে কর্ম্মে কোলাহল, বিচ্ছেদ ঘটে না সে কর্ম্ম কেউ করে না বলেই আমরা সকলেই প্রায় নিজকে বড় মনে করি আর সকলেই 'অহং' এ পূর্ণ

হয়ে নিজ মত প্রবল রাখতে গিয়ে আমরা বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়ে থাকি।

"জপ-ধ্যান—আত্মানুসন্ধানের সোপান বলে উহা সকল কর্ম্মের মধ্যে রাখতে হবে। যীশুখ্রীষ্ট যেমন তাঁর শিষ্যগণকে ye are the salt of the earth বলেছিলেন, আমার ও মনে হয় আত্মানুসন্ধানের জন্য জপধ্যান ও Salt of the work, এর অভাব যেখানে ঘটে সে সম্প্রদায়ের কাজই যেন আলুনি হয়ে যাচ্ছে—যেন কি করবে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছে না।" শরৎ মহারাজ এ পর্য্যন্ত বলিবার পরে শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আদর আপ্যায়িত করিতে যাইয়া প্রসঙ্গের এই খানেই ইতি হইল।" *

* পুরীধাম হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরে প্রথমে স্বামী পূর্ণানন্দ ও পরে দুইজন গৃহীভক্ত যাঁহারা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নিকট এই প্রসঙ্গ শুনিয়াছিলাম। সেদিন শরৎ মহারাজ নাকি প্রত্যেকটি কথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন।

সপ্তদশ বর্ষ

এই নববর্ষের প্রথম দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন লাভ করিলাম। জগন্নাথের বিপুল বপু, বিরাট মন্দির দেখিয়া মানব-মন বিরাটের দিকে অগ্রসর হইতে চাহে, অনন্ত গর্জ্জন রত নীলাম্বুরাশী দেখিয়া মানব মন অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। যতদিন পুরীতে ছিলাম মনে সকলই বিরাট, সকলই সীমাশূন্য বলিয়া বোধ হইত।

উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিয়াছি। মনে অসীম ভাবের এক অস্পষ্ট ছায়া ধীরে ধীরে সীমাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আসিয়া মনকে ক্রমাগত আঘাত করিয়া সঙ্কুচিত করিতে লাগিল। মঠের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—সকলেই যেন নিজের সুখ সুবিধার জন্য পথ খুঁজিতেছে। উদ্বোধনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—কর্ম্ম কোলাহল বাড়িয়াছে কিন্তু তাহা কাহাকেও যেন আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। এক শরৎ মহারাজকে দেখিলাম,—বড় কোমল, বড় উদার, অত্যধিক সহানুভূতি সম্পন্ন। কেন তাঁহাকে এমন দেখিলাম তাহা দেখিবার মত চক্ষু কোন দিনই ছিল না বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আজ তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন তাঁহার সকল জিনিষপত্র এখন আমাদের হাতে। সে জিনিষের মধ্যে তাঁহার ডায়েরী বা রোজনামচাও রহিয়াছে। সেই রোজনামচা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি,—

যিনি আপনার মাঝে আপনি ডুবিয়া যাইতেছিলেন তিনি বিষয়ানন্দে মাতিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ দেখাইতে পারেন না। স্বামী সারদানন্দের রোজনামচা যাহা ইংরাজীতে লেখা, সাধারণের সুবিধার জন্য তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল,—

ইং ৪ঠা জানুয়ারী দ্বিতীয় বার দর্শন হইল। প্রথম দর্শন হইয়াছিল বোধহয় ১২ই ডিসেম্বর, ২৩ খ্রীঃ, চন্দ্রমোহনের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ব্যাঙ্গবাবুর পুত্র অসুস্থ পার্ব্বতীকে দেখিতে গিয়াছিলাম।

ইং ১২ই জানুয়ারী আমার জন্ম তিথি। বয়স ৫৮ বৎসর ১৮ দিন বৃদ্ধ হইয়াছি।

ইং ১৭ই জানুয়ারী তৃতীয়বার জগন্মাতার দর্শন।

" ২২শে " চতুর্থবার " "

" ২৩শে " পঞ্চম দিনের মিলন। (5th day of Communion)

ইং ২৪শে " ষষ্ঠ দিনের মিলন।

" ২৫শে " সপ্তম দিনে বিশেষ মিলন ও পুনরায় দর্শন। (7th day special communion, repeating of Darsana)।

ইং ২৬শে " মিলন। এই ভাবে ৩০শে পর্য্যন্ত মিলন সমভাবে চলিয়াছে।

ইং ৩১শে " অল্প সময়ের জন্য মিলন। (C. Poor)।

" ১লা ফেব্রুয়ারী মিলন।

" ২রা " অল্প সময়ের জন্য। (C. Poor)

ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রথম অদর্শন Settled non-c।

(1st day of non-c) Settled non-cর নীচে শরৎ মহারাজই underline করিয়াছেলন। সুতরাং বোঝা গেল তিনি ইচ্ছা করিয়াই দর্শন বন্ধ করিয়াছিলেন।

ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী দর্শনের চাকা ঘুরিয়াছে পুনরায় মিলন আরম্ভ হইল। (the circle c. began again)।

ইং ৯ই ফেব্রুয়ারী দর্শন ও massage * (2nd C. Massage)।

ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী গভীর মিলন, অন্তর স্পর্শিত, Massage। (Intense C. Touching centre Massage)।

এই ভাবে দিন দিন ভক্তের সহিত জগন্মাতার যে মিলন ও বিরহ চলিয়াছিল তাহার পরিণতি হইল ১৯শে তারিখের দর্শনে।

ইং ১৯শে ফেব্রুয়ারী মিলন। মা দেখাইলেন,—তুমি আমাতে অবস্থিত। (C. You in me)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচর মায়ের দ্বারী স্বামী সারদানন্দ যখন জগন্মাতার মধ্যে অবস্থিত. থাকিয়া আনন্দ ঘন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে ছিলেন তখনও তাঁহার আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা সমভাবে রহিয়াছে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হইবে।

---

* Massage অর্থ বৈজ্ঞানিক ভাবে ডলাই মলাই। ইহাতে দুর্ব্বল ব্যক্তির স্নায়ু ও পেশী সকল সবল হয়। এখানে Massage অর্থ কি জগন্মাতা নিজ হস্তে টিপিয়া দিয়া সন্তানের স্নায়ু ও পেশী সবল করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে নিত্য নূতন উপলব্ধি করিতে যাইয়া আনন্দের বেগ ধারণ করিতে সক্ষম হয়?

মানুষ সামান্য উপলব্ধির আনন্দে যেখানে আত্মহারা হইয়া পরে সেখানে শরৎ মহারাজ জগন্মাতার দর্শন করিবার পরেও ব্যাঙ্গবাবুর (শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বসু) পীড়িত পুত্রকে দেখিতে গেলেন। যাইবার সময় উদ্বোধন-অফিসের সহকারী শ্রীমান্ চন্দ্রমোহন দত্তের নূতন বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করিলেন।

ফাল্গুন মাস। জনৈক বড়লোক আসিয়াছেন। তিনি শরৎ মহারাজকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। আবদারের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া না গেলে তিনি আব্দার পথে যত রকম উৎপাত তাহা সহ্য করিয়া যাইতেন। এই ভদ্রলোকটি জয়রামবাটীতে মায়ের মন্দির নির্ম্মাণে যথেষ্ট অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন—সুতরাং ইঁহার মনে ধারণা ছিল 'গুরুদেবকে' (এই সম্ভাষণে ভদ্রলোকটি শরৎ মহারাজকে সম্বোধন করিতেন) যা বলিবেন তিনি তাহাই শুনিবেন।

নীচের ঘরে বেলা প্রায় ৪টার সময় শরৎ মহারাজ ও সেই ভদ্রলোকটি কথা বলিতেছিলেন। মহারাজের স্বভাব ছিল আস্তে আস্তে কথা বলা। কিন্তু যাঁহার সহিত কথা হইতেছিল তিনি কানে কম শুনিতেন বলিয়া কথাগুলি একটু জোরে হইতেছিল। কি কথা যে হইতেছিল তাহা তখন কেহ জানিতাম না। হঠাৎ শরৎ মহারাজের সুমধুর স্বরলহরী সপ্তমে উঠিল। সকলে সবিস্ময়ে শুনিলেন মহারাজ বলিতেছেন,—'তোমার টাকায় আমি মুতে দি—লোভ দেখিয়ে আমায় দিয়ে কাজ করাবে?' সেই গর্জ্জনে উদ্বোধন বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। আমরা দূর হইতে দেখিলাম ভদ্রলোকটি মহারাজের পা দুখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছেন,—'আমি অন্যায় করেছি আমায়

ক্ষমা করুন।' চির ক্ষমাশীল কল্যাণ দাতা স্বামী সারদানন্দ ক্ষমা না চাহিতেই চিরদিন ক্ষমা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং ভদ্রলোকটির দীনতা দর্শন করিয়া শরৎ মহারাজ চির মধুর কণ্ঠে অন্য কথা আরম্ভ করিলেন। যে কথার জন্য এতবড় উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা চাপা পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পরে ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন। ভদ্রলোকটি যাইবার পরে আমি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— 'রায় কি বলেছিলেন ?'

উত্তরে শরৎ মহারাজ হাসিয়া বলিলেন,—'পাগলা লোক কি বলতে কি যে বলে ফেলে তার ঠিকানা নাই। সেদিন আশী হাজার টাকার এক মোকদ্দমায় হেরে মরেছেন। মোকদ্দমা করবার সময় আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে বলেছিল আমি সকল কথা শুনে ওকে বলেছিলাম—তুমি মিথ্যা মোকদ্দমা করবে আর আমি যাব আশীর্ব্বাদ করতে—না ? আজ বিলাত আপিল করবে স্থির করে এসেছে—আশীর্ব্বাদ চাইতে। আমি পারব না বলায় 'পাঁচ হাজার টাকা প্রণামী দিবে যেমন বলেছে আমিও তেমনই আচ্ছা ধমকানি দিয়েছি।'

আজিকার 'টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম্ম' যুগে পাঁচ হাজার টাকা প্রণামী গ্রহণ না করিয়া 'তোমার টাকা আমি মুতে দি' যিনি বলিতে পারিয়াছিলেন তিনি কোন্ যুগের লোক তাহা পাঠক বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী ঠাকুরের শিষ্যের পক্ষে ইহা যে খুব বড় ত্যাগের কথা তাহা কোন দিনই আমাদের মনে হইবে না।

সহসা পঞ্চনদে প্লেগের সংবাদ দৈনিক খবরের কাগজে প্রচারিত হইয়া সমস্ত ভারতে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। প্লেগে প্রতি সপ্তাহে কত লোক যে মরিতেছে তাহার সঠিক সংবাদ জানা না গেলেও লোক ক্ষয় যে ভীষণ আরম্ভ হইয়াছে এ কথা সরকার পক্ষ হইতেও স্বীকার করা হইয়াছে। 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' সেবাব্রত বেলুড় মঠের সাধুগণ এই সংবাদ পাঠ করিলেন কিন্তু মঠ কর্তৃপক্ষ সেবাকার্য্যে পঞ্চনদে যাইতে কোন উৎসাহ দেখাইলেন না। স্বামী চিদানন্দ একা পঞ্চনদে যাইতে প্রস্তুত জানাইলেও মঠ কর্তৃপক্ষ তাহাকে উৎসাহিত না করিয়া শরৎ মহারাজের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। চিদানন্দ উদ্বোধনে আসিয়া কেহ প্লেগের সেবা করিতে যাইতে ইচ্ছুক কিনা জানিতে চাহিলে স্বামী উমানন্দ, স্বামী অসিতানন্দ (শরৎ মহারাজের সেবক—সাতু) এবং স্বামী ভূমানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। চিদানন্দ, আনন্দে শরৎ মহারাজের অনুমতি লাভ করিবার জন্য উপরের ঘরে গেলেন।

শরৎ মহারাজ সকল শুনিয়া বলিলেন,—'যা বলেছ তাতে আমার সম্মতি থাকিলেও এখন বুড়ো হয়েছি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হতে বলবার বয়স আমার গত হয়েছে। তোমরা যেতে চাও যাবে—আমি কিন্তু কাউকে যেতে বলতে পারব না।' সেখানেই ঠিক হইল দুই দিন পরে চৈত্র সংক্রান্তি দিনে মিশন সেবকগণ উদ্বোধন (কলিকাতা) হইতে পঞ্চনদে যাত্রা করিবেন।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিনে মঠ হইতে স্বামী চিদানন্দ উদ্বোধনে আসিয়াছে। উদ্বোধনে স্বামী অসিতানন্দ, উমানন্দ ও আমি প্রস্তুত

ছিলাম। ঠিক হইল বোম্বে মেলে আমরা রওনা হইব। এই দিন নানা অছিলায় শরৎ মহারাজ বার বার আমাদের ডাকিতে লাগিলেন। কখন চিদানন্দ, কখন উমানন্দ, কখন অসিতানন্দ, এবং কখন ভূমানন্দের ডাক পড়িতেছিল। যাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইল আমরা সকলে যাইয়া শরৎ মহারাজের ঘরে বসিলাম। ঘর নিস্তব্ধ কেহ যেন কোন কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শরৎ মহারাজ প্রথম কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ঠাকুরকে মাকে প্রণাম করে মায়ের আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য নিয়ে যাত্রা করগে। খুব সাবধানে থাক্‌বে।' আমরা ঠাকুরঘরে আসিয়া প্রণাম করিলাম এবং নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া যাত্রা করিলাম। তারপর জনে জনে শরৎ মহারাজ গোলাপ মা ও যোগীনমাকে প্রণাম করিলাম তাঁহারা সকলেরই মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা যোগীনমা ও গোলাপ মার সহিত ইহাই আমার শেষ দেখা।

হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখা গেল শরৎ মহারাজে দুইটি শিষ্যা কল্যাণীয়া রেণুকণা দাশগুপ্তা (দেরাদুন মহাদেবী কন্যা পাঠশালার তখনকার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী) ও কল্যাণীয়া সুকুমারী দেবী দেরাদুন চলিয়াছেন।

নববর্ষের প্রথম দিনে (১লা বৈশাখ) আমরা মোগল সরাইতে গাড়ী ছাড়িয়া দেরাদুনের গাড়ীতে উঠিলাম। সমস্ত দিন রাত্রি ধরিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। পরদিন সকাল বেলা আমরা হরদ্বারে নামিয়া কণখল সেবাশ্রমে গেলাম এবং মধ্যাহ্নে তথায় আহারাদি করিয়া বৈকালের গাড়ীতে লাহোর রওনা হইলাম।

পরদিন ২রা বৈশাখ বেলা প্রায় ১২টার সময় আমরা পঞ্চনদের রাজধানী লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলাম এবং মালপত্র লইয়া হীরামণ্ডী কালীবাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীকালী-মাতার সেবক ভট্টাচার্য- মহাশয় অতি উদার প্রকৃতির লোক। তিনি আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বৈকাল বেলা শরৎ মহারাজকে তার করিয়া আমাদের পৌঁছ সংবাদ জানাইলাম।

যথা সময়ে স্বামী চিদানন্দ ও আমি মুলচাঁদ প্লেগ হাঁসপাতালে রোগী সেবা বরণ করিলাম। স্বামী অসিতানন্দ ও উমানন্দ সহরের পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী পরিষ্কার করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্বামী অসিতানন্দ মাহিয়ানা করা লোকের সহিত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যে নির্ভীকতার সহিত প্লেগ আক্রান্ত বাড়ীগুলি পরিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া লাহোরবাসী রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যের উপর শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন। সমস্ত কর্ম্মের তালিকা দিয়া শরৎ মহারাজকে পত্র দিয়াছিলাম। যথা সময় শরৎ মহারাজ উত্তরে লিখিলেন,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

উদ্বোধন
কলিকাতা
৬।৫।২৪

পরম কল্যাণীয়,

ভূমানন্দ তোমার পত্র খানা যথা সময় পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমাদের উপর সমস্ত Supervisionএর ভার দিয়াছে এবং Dr.

Satyapal প্রভৃতি তোমাদের খুব যত্ন লইতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার চিঠি খানা শ্রীমান্ অনঙ্গকে দিয়াছি —Report বাহির করিবার যদি কিছু সুবিধা হয়। Rohtak (পাঞ্জাবের একটি জিলা) হইতে শ্রীমান্ ধ্রুবেশ্বরানন্দের পত্র ও পাইয়াছি। * * * আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ তুমি সতত জানিবে এবং গোঁসাঞি (স্বামী চিদানন্দ) উমানন্দ, সাতু (স্বামী অসিতানন্দ) প্রভৃতিকে জানাইও।

ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

প্লেগের কাজের জন্য জুন মাসে স্বামী চিদানন্দ ও আমি পেশাওয়ারে গিয়াছিলাম। সেখানে প্রথমেই লোকজনের সহিত পরিচিত হইতে যাইয়া দেখিলাম তাহাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য, আমরা কি খাই—মাছ মাংস খাই কিনা। শাস্ত্র সম্বন্ধে এদেশবাসীর জ্ঞান অন্য দেশ অপেক্ষাও কম দেখিলাম। আমাদের মনে হইয়াছিল উর্দ্দু ভাষার অত্যধিক প্রচলনের ফলে এবং বহু শতাব্দী বিদেশী বিজাতির আক্রমণের গতি রোধ করিতে যাইয়া পাঞ্জাবীগণ আর্য্য সভ্যতার সহিত অনেক দিন সম্পর্ক হারাইয়া ফেলিয়াছে। আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাও জানিতে পারিয়াছি শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর নাম অতি অল্প সংখ্যক লোকেই শুনিয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম অনেকের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। যথা সময়ে পেশাওয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলাম এবং কিছুদিন এদেশে থাকিবার সংকল্প করিলাম।

স্বামী সারদানন্দ

প্লেগ হাসপাতালে প্রায় আড়াইমাস কাজ করিবার পরে দেখা গেল প্রকৃতির বিধানে পঞ্চনদে প্লেগের প্রকোপ কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। Rohtak জিলা হইতে সেবকগণ কাশীতে ফিরিয়া গেলেন। লাহোরের কাজও বন্ধ হইল। সেবকগণ কলিকাতা ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলেন, একা আমিই লাহোরে রহিলাম ইচ্ছা ছিল, এই প্রদেশটি ভাল করিয়া দেখিয়া যাইব।

পাঞ্জাবের আব হাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে অতীব ভীষণ, শীতের সময়ে দারুণ শীত পড়ে রাত্রে ঘরে আগুন না রাখিলে যেমন সুনিদ্রা কিছুতেই হইতে পারে না, গরমের সময় ও তেমনি ভীষণ গরমে পাখা ব্যবহার ও ঠাণ্ডা জল পান না করিয়া থাকা যায় না। সে গরম বাঙ্গালী কখন কল্পনা করিতে পারে না। জুন মাসের শেষ দিকে আমার হৃদপিণ্ডে যন্ত্রণা অনুভব করিলাম এবং লাহোরের ভাল ভাল ডাক্তার দিয়া বুক পরীক্ষা করাইলাম তাঁহারা সকলেই আমাকে লাহোর ত্যাগ করিয়া গরমের দিনগুলি দেরাদুনে কাটাইয়া সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় লাহোরে আসিতে উপদেশ করিলেন। আমি শরৎ মহারাজকে শরীরের অবস্থা এবং ডাক্তারগণের উপদেশ নিবেদন করিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন,—

ঙ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা

১৩।৭।২৪

পরম কল্যাণীয়,

ভূমানন্দ তোমার ৯ই তারিখের পত্র পাইয়া চিন্তিত রহিলাম।

খুব সাবধানে থাকিও। ওদেশে যদি সুবিধা না হয় আমার মতে তুমি এখনে চলিয়া আসিও Treatmentএর (চিকিৎসাদির) সকল ব্যবস্থা করা যাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার শরীর একরূপ চলিয়া যাইতেছে কিন্তু পূজণীয়া গোলাপ মার শরীর ভাল যাইতেছে না। পূজণীয়া যোগীনমার দেহ ত্যাগের (১) পর হইতেই তাঁহার heartএর অসুখ খুব ঘন ঘন হইতেছে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এখানকার ও মঠের অন্যান্য সকলের সম্প্রতি কুশল। আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা সতত জানিবে।

ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের দুইটি সেবিকা যোগীন মা ও গোলাপ মা। যোগীন মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদ পদ্মে মিলিতা হইলেন। স্বামী অরূপানন্দ (মায়ের সেবক রাসবিহারী মহারাজ) উদ্বোধন পত্রিকায় যোগীন মার জীবনী যাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার (ইং ১৯২৪ খ্রীঃ) রাত্রি ১০টা ২৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্টা স্ত্রীভক্তগণের অন্যতমা পরমভক্তিমতী যোগেন মা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাগবাজারের বাটীতে ৭৩ বৎসর বয়সে মহাসমাধিযোগে শ্রীপ্রভুর পাদপ্রান্তে মিলিত হইয়াছেন। যোগেন মা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী খড়দহের সুবিখ্যাত ধনাঢ্য জমিদার ঘরের গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার স্বামীর

(১) ইং ৪ঠা জুন ১৯২৪ খ্রীঃ যোগীন মা উদ্বোধনে দেহ রক্ষা করেন।

নাম স্বর্গীয় অম্বিকা চরণ বিশ্বাস। ইঁহারই পূর্ব্ব পুরুষ স্বনামধন্য প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস সুপ্রসিদ্ধ প্রাণতোষিণী তন্ত্র সঙ্কলন করেন।

"নানা কারণে স্বামীর সংসারে বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় যোগেন মার মনে প্রথম জীবনেই তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, এবং এই সময় হইতে তিনি কলিকাতা বাগবাজারে তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করিতে থাকেন। ঠাকুরের পরম ভক্ত বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু সম্পর্কে যোগেন মাতার আত্মীয় ছিলেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট লইয়া যান। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি অচিরেই তাঁহার কৃপালাভ করেন এবং অদ্ভুত ত্যাগ ও তপস্যা সহায়ে ধর্ম্মজীবনে দিন দিন উন্নতি করিতে থাকেন।

"দক্ষিণেশ্বরে দুই চারি বার যাতায়াতের পর পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়েই প্রায় সমবয়সী ছিলেন। এই হেতু প্রথম দর্শনেই মার সহিত তাঁহার খুব ভাব ও পরস্পর টান জন্মিল। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমি যখনি যেতুম মা আমাকে নিজের সব কথা বল্‌তেন, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতেন। আমি মায়ের চুল বেঁধে দিতেম, মা আমার হাতের চুল বাঁধা এম্‌নি ভালবাসতেন যে তিন চারি দিন পরেও নাইবার সময়ে মাথার চুল খুলতেন না। বল্‌তেন ও যোগেনের বাঁধা চুল, সে আবার আস্‌লে সেই দিন খুল্‌বো। আমি সাত আট দিন পর পর যেতেম। দক্ষিণেশ্বরে কখনো কখনো রাত্রে নহবতে থাক্‌তেম, আমি আলাদা শুতে চাইতেম, মা কোন মতেই ছাড়তেন না,

কাছে টেনে নিয়ে শুতেন। সেই প্রথম দর্শনের কিছু কাল পরে মা যখন দেশে রওনা হলেন, যতদূর নৌকা দেখা গেল দাঁড়িয়ে রইলেম। নৌকা অদৃশ্য হতে নহবতে এসে খুব কাঁদতে লাগলেম। ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে আস্‌তে আস্‌তে তা দেখতে পেয়ে ঘরে গিয়ে আমাকে ডাকালেন। বল্লেন 'ও চলে যেতে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে'। এই সব বলে আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ঠাকুর তাঁর তান্ত্রিক সাধনার সব ঘটনা বল্‌তে লাগ্‌লেন। দেড় বছর পরে মা যখন এলেন ঠাকুর মাকে বলেছিলেন 'সেই যে ডাগর ডাগর চোক মেয়েটি আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি যাবার দিন নহবতে বসে খুব কাঁদছিল' মা বল্লেন 'হাঁ—তার নাম যোগেন।'

"ঠাকুর বাগবাজারে যোগেন মার বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। 'কথামৃতে' উহা 'গণুর মার বাড়ী' বলিয়া উল্লেখ আছে। গণু যোগেন মার কন্যার নাম। ঠাকুরের সহিত যোগেন মার অনেক সময় অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। 'লীলা-প্রসঙ্গে' স্থানে স্থানে "জনৈক স্ত্রীভক্ত বলেন" এইরূপে উহার ইঙ্গিত আছে। ঠাকুর যোগেন মাকে বলিয়াছিলেন 'তোমাদের আর কি বাকী গো! (নিজের শরীর দেখাইয়া) তোমরা দেখলে খাওয়ালে, সেবা করলে।'

"ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় যোগেন মা বৃন্দাবনে ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে যান। যোগেন মা বলেন "মার সঙ্গে আমার দেখা হতেই 'ও যোগেন' বলে মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে

লাগলেন। বৃন্দাবনে আমরা দুজনেই খুব কান্নাকাটি করতাম। একদিন ঠাকুর দেখা দিয়া বললেন,—'হ্যাঁগা, তোমরা এত কাঁদছ কেন? এইত আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? এই এ ঘর, আর ও ঘর!'

"এই সময় যোগেন মা বৃন্দাবনে ভগবৎধ্যানে এত তন্ময় হইতেন যে একদিন লালাবাবুর ঠাকুরবাটীতে বসিয়া সন্ধ্যার পরে ধ্যান করিতে করিতে গভীর সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। স্থির ভাবে বসিয়াই আছেন। রাত্রির ভোগারতি শেষ হইবার পর যখন মন্দিরের বহির্দ্বার রুদ্ধ হইবে তখনও ইনি উঠিতেছেন না। সেবায়িতগণ ডাকিতে লাগিলেন,—'এ মাই ওঠ, এ মাই ওঠ'। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হুঁস হইল না। এদিকে এত রাত্রি হইয়াছে তবুও বাসায় ফিরিতেছেন না দেখিয়া মার আদেশে শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামী আলো লইয়া খুঁজিতে বাহির হইলেন এবং যোগেন মা অনেক সময় পূর্ব্বোক্ত মন্দিরেই বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেন জানিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তখনও হুঁস হয় নাই। যোগানন্দ স্বামী ঠাকুরের নাম শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ঠাকুর ও মায়ের প্রসঙ্গে এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি ইদানীং আমাদের বলিয়াছিলেন 'তখন আমার এমন মন হয়েছিল যে, জগৎ যেন নাই।'

"কলিকাতার বাড়ীতেও তাঁহার আর একবার সমাধি হয়। স্বামিজী তাহাতে বলিয়াছিলেন 'যোগেন মা, তোমার দেহ যাবে সমাধিতে। যার একবারও সমাধি হয়, দেহত্যাগের সময় তার সেই স্মৃতি আবার আসে'।

"আর একবার দর্শনাদি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, এক সময়ে তাঁহার এমন এক অবস্থা হইয়াছিল 'যখন যে দিকে চাই সর্ব্বত্রই ইষ্ট দর্শন। তিন দিন অমন ছিল'। যোগেন মার দুইটি বাল-গোপাল মূর্ত্তি আছে। তিনি কত সস্নেহে তাঁহাদের সেবা পূজা করিতেন। এবং ভাবাবস্থায় দর্শনাদি পাইতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—'একদিন ধ্যান করতে করতে দেখি কি—দুইটি অনুপম সুন্দর বালক হাস্‌তে হাস্‌তে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়িয়ে বল্‌ছে 'আমরা কে চেন?' বল্লুম 'তোমাদের আবার চিনি না? এই তুমি বীর বলরাম, আর তুমি কৃষ্ণ।' ছোটটি (কৃষ্ণ) বল্লে তুই আমাদের ভুলে যাবি,—ঐ ওদের জন্যে' এই বলে আমার নাতিদের দেখালে'। বাস্তবিক যোগেন মার একমাত্র কন্যার মৃত্যু হওয়ায় নিরাশ্রয় দৌহিত্র তিনটির উপর কিছু কালের জন্য তাঁহার মন পড়ে এবং ঐ উচ্চ ভাবাবস্থা অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করে।

"গৃহীর ন্যায় থাকিলেও তিনি তন্ত্রমতে পূর্ণাভিষিক্ত ছিলেন, এবং বিরজা হোমও করিয়াছিলেন। বেলুড় নীলাম্বর মুখুয্যার বাড়ীতে মা যখন পঞ্চতপা করেন তখন যোগেন মাও এই সঙ্গে পঞ্চতপা করিয়াছিলেন। মা বলিতেন 'যোগেন খুব তপস্বী, এখনও কত ব্রত উপবাস করে'। বৈধী পূজার্চ্চনা বিষয়ে তাঁহার যেরূপ নিষ্ঠা ও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল,—স্ত্রীলোকদের ত কথাই নাই,—পুরুষদের মধ্যেও খুব কম লোকেরই সেরূপ দেখা যাইত। তিনি কখনও বৃথা সময়-ক্ষেপ করিতেন না। অবসর সময়ে গীতা 'ভাগবত' চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তি-

গ্রন্থ ও পুরাণাদি কখনও বা ঠাকুরে সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে এই সব গ্রন্থ, বিশেষতঃ চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি অনেক স্থল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, এবং পুরাণাদির আখ্যায়িকাসমূহ যথাযথ বিবৃত করিতে পারিতেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার "হিন্দু ধর্ম্মের আখ্যানসমূহ" (Cradle Tales of Hinduism) প্রণয়নে পূজনীয়া যোগেন মার গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পৌরাণিক জ্ঞান হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। নিবেদিতা নিজেই পুস্তকের ভূমিকায় তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও তাঁহার জপধ্যানে এত অনুরাগ ছিল যে শত কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যেও তিনি যে সময়ে যতক্ষণ জপ ধ্যান করিবার তাহার একটুও ব্যতিক্রম হইতে না। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের পর ঘাটে বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা তন্ময় হইয়া জপ ধ্যান করিতেন। দুরন্ত শীত বর্ষায়ও তাহা একদিন বন্ধ যাইত না। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতাম,—লোকের ত একদিনও বাদ যায়, আলস্য হয়! ধ্যানের সময় এমন তন্ময় হইতেন যে, অনেক সময় চোকের ভিতর (ধ্যানের সময় তাঁর চক্ষু ঈষদুন্মুক্ত থাকিত) মাছি ঢুকিয়া খুঁটিত, তাহা তিনি টের পাইতেন না। মা ইদানীংয়ের স্ত্রীভক্তদিগকে বলিতেন 'যোগেন গোলাপ এরা কত ধ্যান জপ করেছে সে সব আলোচনা করা ভাল—এতে কল্যাণ হবে।'

"এই শেষ অসুখের সময়ও যখন উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল না, তখনও তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিতে হইত—নিয়মিত জপ-

ধ্যান এবং কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, চৈতন্য-চরিতামৃত, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ শুনিবার জন্য। ধ্যান-ধারণায় তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ থাকিলেও তিনি দৈনন্দিন সংসার কর্ম্মে উদাসীন ছিলেন না। নিত্য স্নানাহ্নিক অন্তে মার বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের ভোগের তরকারী পত্র দুই বেলাই কুটিতেন এবং আবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম সারিয়া দ্বিপ্রহরে গৃহে ফিরিয়া নিজের ও বৃদ্ধা মায়ের রন্ধনাদি করিতেন। আবার বৈকালে মার নিকট আসিতেন। রাত্রের ঠাকুরের ভোগের পরে গৃহে ফিরিতেন এবং যখন যেমন আবশ্যক যথাসাধ্য শ্রীশ্রীমার সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন।

"যোগেন মার আর একটি স্বভাব ছিল যে,—দেবস্থান বা তীর্থাদিতে গেলে যথাসাধ্য দীন-দুঃখীকে পয়সা দিতেন, কেহ শুধু হাতে ফিরিত না। গোলাপ মা বলেন 'যোগেন পয়সা দিয়ে দিয়ে এমন করেছে যে এখন ভিখারী এলেই পয়সা চায়—বলে মা এখানে আমরা একটি করে পয়সা পেয়ে থাকি'। ইহা ছাড়া তীর্থাদিতে গেলে সঙ্গী লোকজনদের খাওয়াইতেন আবার জয়রামবাটী, কামারপুকুর গেলে ঠাকুর ও মার সম্পর্কিতগণকে যথাসাধ্য কিছু না কিছু দিতে ভুলিতেন না।

"ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যোগেন মাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ যোগেন মাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। যোগেন মাও কত সযত্নে মহারাজকে খাওয়াইতেন। আমরা দেখিয়াছি,—কোন দিন মহারাজকে মার বাটিতে নিমন্ত্রণ করিলে যোগেন মা আনন্দে অধীর হইতেন। কত রকম রান্নার ব্যবস্থা করিতেন, নিজেও দু একটি তরকারী রান্না করিতেন। স্বামিজী

যোগেন মাকে এত আপনার মনে করিতেন যে, যোগেন মাকে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে দেখিয়া স্বামিজী নৌকা হইতে নামিয়াই বলিতেন,—'যোগেন মা, আজ তোমার ওখানে ছটি খাবগো, পুঁই শাক চচ্চড়ি কোরো'। যোগেন মার মুখেই শুনিয়াছি, একবার তিনি যখন কাশীতে ছিলেন, তখন স্বামিজী কাশী গিয়াছেন, সে দিন স্বামিজীর জন্ম-তিথি ছিল। তিনি যোগন মার রান্না খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া এই বিশেষ দিনে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—'আজ আমার জন্ম-তিথি—আমায় ভাল করে খাওয়াও, পায়েস কর।'

আর একদিন যোগেন মা বিশ্বনাথের পূজায় বাহির হইবেন এমন সময় স্বামিজী আসিয়াছেন যোগেন ভাবিলেন কি করিবেন তখন স্বামিজী বলিলেন,—'এই তোমার বিশ্বনাথ, তাকে রান্না করে খাওয়াবে না?' যোগেন মার সেদিন জীবন্ত বিশ্বনাথের সেবায় দিন কাটিয়া গেল।

'যোগেন মা সকল দেবতার প্রতিই ভক্তি-সম্পন্না ছিলেন। সকলেরই সমান পূজা অর্চ্চনা করিতেন। ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে শরণ লইলেও তাঁহার কোন রূপ গোঁড়ামি ছিল না। উদার ভাব-সম্পন্ন হইয়া তিনি শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি সব দেবতারই পূজা করিতেন। একদিকে যেমন বৈধীপূজা, নিষ্ঠা, ব্রত, উপবাস, সদাচার এবং সর্ব্বোপরি রাগানুগা ভক্তি ছিল, অপর দিকে তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবও তাহাতে অত্যধিক ছিল। ঠাকুর তাই বলিয়াছিলেন 'মেয়ের মধ্যে যোগেনই জ্ঞানী'।

"বাস্তবিক যোগেন মার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা

শুনিয়া ভারতের সেই প্রাচীন আদর্শে নারী জীবনের কথাই মনে পড়িত। ঠাকুর যে যোগেন মার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল,—'ও কুঁড়ি ফুল নয় যে একটুতেই ফুটে যাবে—ওর যে সহস্র দল পদ্ম ধীরে ধীরে ফুটবে।' শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতির সহিত যোগেন মা, গোলাপ মার স্মৃতি জড়িত। মা বলিতেন 'আমার জীবনে যা সব হয়েছে এই গোলাপ যোগেন এরা সব জানে।'

"যিনি যাঁর তিনি তাঁর কাছে চলিয়া গেলেন! 'একে একে নিভিছে দেউটী।'

আগষ্ট মাস। ১৭ই তারিখের রোজনামচায় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন,—Feeling very much dejected. Letters written to Sw Shivananda & Tulsi re Bangalore work অর্থাৎ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছি। ব্যাঙ্গালোরের কাজ সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দ এবং তুলসীকে চিঠি দিলাম।

এতদিন শরৎ মহারাজ পারত পক্ষে মহাপুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন মত দেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহার দায়ীত্ব বোধই তাঁহাকে মহাপুরুষের কাজের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন শরৎ মহারাজ মহাপুরুষের কোন কাজে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। হাজার ভাল মন্দ দেখিলেও শরৎ মহারাজ ইদানীং চুপ করিয়া থাকিতেন। হেতু—কর্ম্মে তাহার প্রবৃত্তি জাগিত না।

শরৎ মহারাজ উদ্বোধনেই আছেন। একদিন তিনি স্থির করিলেন,—কাহাকেও কিছু না বলিয়া দ্বিপ্রহরে বাহির হইবেন।

প্রথমে যাইয়া শরৎ মহারাজ খোকানীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন এবার ফিরিবার সময়ও তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রোগী খোকানীর পাণ্ডুবর্ণ মুখখানা কৃতজ্ঞতায় লাল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন।

ক্যাপ্টেন্ (Captian) না জানিলেও শরৎ মহারাজ জানিতেন তিনি কোথায় যাইতেছেন। এখন সমস্ত অবস্থা দেখিয়া কিরণ বুঝিল এই জন্য তিনি কাহাকে'ও না জানাইয়া লুকাইয়া আসিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক ঐ রোগীর দেয় ফল খাইতে দেখিয়া কিরণ বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল। রাস্তায় একা পাইয়া বলিল— "আপনি ঐ ফল কেন খেতে গেলেন?' প্রথমটা তিনি চুপ করিয়াছিলেন। তারপর বলিলেন,—'খোকানী যাতে মনে কষ্ট না পায় তার জন্য খেয়েছি অমন সময় ত আমার খাওয়ার অভ্যাস নেই জান।' কিন্তু এই কথাতে Captain খুসী হইতে পারে নাই বুঝিয়াই যেন মহারাজ আবার বলিলেন,— "জান, ঠাকুর বলতেন—ভালবেসে কেউ কিছু খেতে দিলে তা খেলে কোন অনিষ্ঠ হয় না।"

অপরের বেদনা নিজের প্রাণে বোধ করিতে স্বামী সারদানন্দ অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু সে বেদনা যে তিনি বোধ করিয়াছেন তাহা যাহাতে প্রকাশ না পায় তাহার জন্য এইরকম কাজ করিয়া দোহাই দিতেন ঠাকুরের, দোহাই দিতেন স্বামিজীর। যেন তাঁহার ঐ রকম কাজ করিবার কোন প্রবৃত্তিই ছিল না

তবে যে করিয়াছেন তাহা ঠাকুর বলিতেন বলিয়াই করিতে হইল।

স্বামী সারদানন্দের নিকটে যাঁহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার পদগৌরবের নিকট মস্তক নত করেন নাই, করিয়াছিলেন স্বামী সারদানন্দের হৃদয় বত্তার নিকটে।

যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রস্থানের পর যোগীন মা ও গোলাপ মা শ্রীশ্রীমাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। মায়ের সেবিকারূপে তাঁহারা মার ও উদ্বোধনের ঠাকুর পূজা এবং ভোগাদির ব্যবস্থা করিতেন। সাধুদের নিকট জননীরূপে সকল আবদার সহ্য করিতেন। শ্রীশ্রীমার মহাপ্রস্থানের চারি বৎসরের মধ্যে প্রথমে যোগীন মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে মিলিতা হইলেন। গোলাপ মার শরীর ও ভাল নয়। হৃদযন্ত্রের অসুখই ক্রমশঃ তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে।

ইদানীং শরৎ মহারাজের শরীর ভাল যাইতেছিল না দেখিয়া পূজ্যপাদ তুলসী মহারাজ, অমূল্য মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠ হইতে শ্রীমান্ বরদানন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে ভুবনেশ্বর (পুরী) মঠে কিছু দিন অবস্থান করিতে আগ্রহ জানাইলে তিনি সম্মত হইলেন এবং ১২ই নভেম্বর তুলসী মহারাজ, সান্যাল মহাশয়, অমূল্য মহারাজ সহ ভুবনেশ্বর যাত্রা করিলেন। এই স্থানে আসিয়া প্রথম চারি দিন তিনি ভালই ছিলেন কিন্তু তারপরে অজীর্ণ, অজীর্ণ হইতে আমাশয়, আমাশয় হইতে রক্ত আমাশয় হইলে প্রতিকারের জন্য এমেটিন ইন্‌জেক্সন লইতে লাগিলেন। এবং সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে নভেম্বর মাস গত হইল।

এদিকে উদ্বোধনে গোলাপ মার অসুখ আবার বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজ ভুবনেশ্বর হইতে ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীমার উৎসব আগত প্রায়। প্রতিবৎসর মায়ের উৎসব উদ্বোধনে হইত। এবার গোলাপ মার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন, কখন কি হয় ভারিয়া শরৎ মহারাজ মায়ের উৎসব নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে হইবে স্থির করিলেন। ইদানীং ভক্ত সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং উদ্বোধনের ছোট বাড়ীতে স্থানের সঙ্কুলন হইতেছিল না দেখিয়া লাহোরে রওনা হইবার পূর্ব্বে মায়ের উৎসব নিবেদিতা স্কুলে করিবার জন্য শরৎ মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন শরৎ মহারাজ কোন উত্তর দেন নাই। এবার গোলাপ মার অসুখ বৃদ্ধি দেখিয়া যখন মায়ের উৎসব নিবেদিতা বিদ্যালয়ে হইবে স্থির করিলেন তখন ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ আমাকে এ সংবাদ জানাইলেন এবং উদ্বোধনে ফিরিবার জন্য লিখিলেন। গণেন মহারাজের চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম কিন্তু তখন উদ্বোধনে ফিরিতে পারিলাম না।

ইং ১৯২৪ খ্রীঃ ১৮ই ডিসেম্বর মায়ের উৎসব আনন্দকোলা-হলের মধ্যে সমাধা হইল। পরদিন বৈকালবেলা চারিটা আট মিনিটের সময় মায়ের প্রধানা সেবিকা গোলাপমা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে মিলিত হইলেন। মায়ের সেবক স্বামী অরূপানন্দ গোলাপ মার কথা যাহা উদ্বোধনে লিখিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি পূজার পরদিন ৪ঠা পৌষ তারিখে অপরাহ্ন ৪টা ৮ মিঃ এর সময় মায়ের প্রধানা সেবিকা পূজনীয়া গোলাপমা

দেহত্যাগ করিলেন। ঠাকুর ও মার ভক্তগণের নিকটে গোলাপমা সবিশেষ পরিচিতা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পাঠকগণও বোধ হয় প্রায় সকলেই জানেন যে ইনিই সেই 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী'—যাঁহার বাড়ীতে ঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের স্ত্রীভক্ত পূজনীয়া যোগেন মার সহিত পূর্ব্ব হইতেই গোলাপমার পরিচয় ও সদ্ভাব ছিল এবং তাঁহারই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। গোলাপ-মায়ের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কিন্তু তাঁহারা কুলীন ছিলেন। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইবার পর গোলাপমার স্বামী মারা যান। ছেলেটি অল্প বয়সেই মারা যায়। অর্থাভাব-হেতু তখনকার দিনের মহামান্য কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গোলাপমা তাঁহার একমাত্র কন্যাকে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের সুবিখ্যাত সঙ্গীত -চর্চ্চা-প্রিয় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বিবাহ দেন।' কন্যাটি সুশ্রী ও গুণবতী ছিল। দৈব-প্রতিকূলে সেই কন্যারও মৃত্যু হইল। শোকে গোলাপমা পাগলের মত হইয়া পড়িলেন।

"ঠাকুরের দর্শনে ও সান্ত্বনা পাইলে শোক কতকটা উপশম হইতে পারে মনে করিয়া যোগেনমা এই সময় তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। ঠাকুরের দিব্য ঈশ্বরীয় ভাব সংস্পর্শে আকৃষ্ট হইয়া দু একবার যাতায়াতের পর হইতেই গোলাপমার মনের শোকবেগ হ্রাস পাইতে থাকে। এই সময় মা নহবতে থাকিতেন। শ্রীশ্রীমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া ঠাকুর মাকে বলিয়া দিয়াছিলেন 'তুমি ওকে খুব ঠেসে পেট ভরে খেতে দিবে

—পেটে অন্ন পড়লে শোক কমবে', এই সময় হইতেই গোলাপমা ক্রমশঃ মাঝে মাঝে নহবতে শ্রীশ্রীমার কাছে আসিয়া থাকিতেন।

"শোকসন্তপ্তা গোলাপমা, তাঁহার বাটীতে একদিন শুভ পদার্পণ করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কথামৃতে ইহার বিবরণ এইরূপ আছে ঃ—"আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া সমস্ত দিন ব্রাহ্মণী উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নন্দবসুর বাটী হইয়া তাঁহার বাটীতে আসিবেন, যতক্ষণ ঠাকুর নন্দবসুর বাটীতে ছিলেন ততক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর বাহির করিতেছিলেন—কখন তিনি আসিবেন ; বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাবিতেছিলেন তবে বুঝি ঠাকুর আসিলেন না, তাই তিনি নিজেই খবর নিতে গেলেন কেন এত দেরী হইতেছে। ইতিমধ্যে ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া প্রণাম করিয়া কি করিবেন কি বলিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। অধীর হইয়া বলিতেছিলেন 'ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচিনা গো—আমার চণ্ডী যখন এসেছিল সেপাই শান্ত্রী নিয়ে আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল তখনও এত আহ্লাদ হয় নি গো। ওগো, চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই। যাই সকলকে বলি গে—আয়রে আমার সুখ দেখে যা—যাই যোগেনকে (যোগেনমা) বলিগে আমার ভাগ্যি দেখে যা। আবার আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছিলেন 'ওগো, খেলাতে (লটারীতে) একটা টাকা দিয়ে এক মুটে লাখ টাকা পেয়েছিল, সে যাই শুনলে একলাখ টাকা পেয়েছি অমনি আহ্লাদে মরে,

গিছ্‌লো, সত্য সত্যই মরে গিছ্‌লো! ওগো, আমার যে তাই হ'ল গো! তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর না হলে আমি সত্য সত্যই মরে যাব!"

"কত জন্ম ভগবৎ ধ্যানে, ভগবানের সঙ্গলাভে মানুষ আনন্দ ও অনুরাগে এতখানি আত্মহারা হইয়া থাকে হে পাঠক! তাহা কল্পনায় অনুভব কর। মা বলিতেন, 'জন্মে জন্মে ভক্তের ভাব ঘনীভূত হয়'।

"ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় তাঁহার ভগিনী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন 'দিদি এসো না! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হয়। নীচে এসো। আমি কি একলাটি পারি।'

"ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর! ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন। কিছুতেই তাঁহাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছিলেন না।

"এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ব্রাহ্মণী অতিশয় ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিলেন। ভক্তেরাও সকলে মিষ্টিমুখ করিলেন।

"রাত্রে ঠাকুর বলিতেছেন আহা, এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্লাদ! মণি—(জনৈক ভক্ত) 'কি আশ্চর্য্য, যীশুখ্রীষ্টের সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল। তারাও দুটি মেয়ে মানুষ ভক্ত দুই ভগিনী—মার্থা আর মেরী।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ—(উৎসুক হইয়া) 'তাদের গল্প কি বল ত।' মণি—'যীশুখ্রীষ্ট তাদের বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে ঠিক এই রকম করে গিয়েছিলেন। এক ভগিনী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন,

আর একটি বোন একলা খাবার দাবার উদ্যোগ করছিল, সে যীশুর কাছে নালিশ করলে—'প্রভু দেখুন দেখি দিদির কি অন্যায়! উনি আপনার কাছে চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা এই সব উদ্যোগ করছি', তখন যীশু বল্লেন 'তোমার দিদিই ধন্য! কেননা মানুষ জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম) তা ওঁর হয়েছে!"

"এই সব ঘটনা সাদৃশ্যে মনে হয়—ভগবানের সঙ্গে নর-লীলার মহা মাধুর্য্য আস্বাদন ও আকর্ষণ সম্ভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ তৃপ্ত হইবার জন্য এবং ভক্তের অনুরাগ বিশ্বাসের আদর্শ সমুজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত তিনিই তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ভক্তগণকে বিশেষ করিয়া সঙ্গে আনয়ন করেন। শ্রীশ্রীমা বলিতেন 'যে যাঁর, সে তাঁর—যুগে যুগে অবতার।'

"গোলাপ মা দক্ষিণেশ্বরে নহবতে শ্রীশ্রীমার নিকট যখন থাকিতেন তখন প্রায়ই অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন, রান্না হইলে মা ঠাকুরের জন্য ভাতের থালা সাজাইয়া দিতেন এবং এই সময় হইতে গোলাপ মাই উহা ঠাকুরকে দিতে যাইতেন। গোলাপ মা এক দিনের ঘটনা বলিয়াছিলেন, 'এক দিন দেখি কি, খাবার সময় ঠাকুর যখনই মুখে গ্রাস দিচ্ছেন অমনি ঠাকুরের ভিতর থেকে একটা যেন সাপের মত উহা ছোবল মেরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ত দেখেই অবাক! ঠাকুর তাই দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিগো, বল দেখি—আমি খাচ্ছি, না কে খাচ্ছে?' আমি এতক্ষণ যা দেখছিলেম তাই বল্লেম—'আপনার ভিতর থেকে একটা সাপে যেন ছোবল মেরে নিচ্ছে!'

ঠাকুর তাই শুনে মহাখুসী হয়ে বল্লেন 'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ! তুমি বলে দেখতে পেয়েছ, বুঝতে পেরেছ'—এই বলে আমাকে কত যে কি প্রশংসা করতে লাগলেন। সর্পাকারা কুণ্ডলিনীর আহুতি গ্রহণ বলে না? এ তাই দেখেছিলেম!'

"ইহার পরে ঠাকুর যখন অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ থাকিতেন তখন গোলাপ মা ঠাকুরের পথ্যাদি কিছুদিন তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের কাশীপুর বাগানে অবস্থান কালেও গোলাপমা মার কাছে প্রায়ই থাকিতেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর গোলাপমা মার সঙ্গে কাশী হইয়া বৃন্দাবন যান এবং তথায় প্রায় একবৎসর থাকেন। ইহার পরে কাশী, জগন্নাথ, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে ও কৈলোয়ার, কোঠার প্রভৃতি যখন যে স্থানে মা গিয়াছেন গোলাপ মা সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। মা কলিকাতায় আসিলে ত কথাই নাই। কখন বা মার সঙ্গে তাহার দেশে যাইতেন। ঠাকুর মাকে বলিয়া দিয়াছিলেন 'তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ন কোরো—এই বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।' মা ঠাকুরের সেই ইচ্ছা পালন করিয়াছিলেন। এমন কি মা কোন ভক্তবাড়ী বা কোথায়ও যাইতে হইলে গোলাপ মাকে সঙ্গে নিতেন। বলিতেন,—গোলাপ না গেলে কি আমি যেতে পারি? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরসা'। বাস্তবিক অনেক স্থলে ভক্তদের অবিবেচনার আবদার হইতে গোলাপমাই মাকে রক্ষা করিতেন। একবার ভক্তেরা মাকে ঘরে বসাইয়া ধূপ ধূনো দিয়া স্তব পূজা করিতেছিলেন। মা খুব ঘর্ম্মক্লিষ্ট হইয়াও সঙ্কোচে কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। গোলাপ মা একটু স্থানান্তরে

ছিলেন। আসিয়া দেখিয়াই 'তোমরা কি কাঠ পাথরের ঠাকুর পেয়েছ গা'—এই বলিয়া ভক্তদিগকে ধমক দিয়া মাকে বাহিরে বাতাসে লইয়া আসিলেন।

"বাগবাজারের শ্রীশ্রীমার বাটী নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বে মাকে যখন কলিকাতা আনা হইত তাঁহার জন্য ভাড়াটিয়া বাটী ঠিক করা হইত। এইরূপে তখন বেলুড়ে, বাগবাজারে ও অন্যান্য যে স্থানে আসিয়া মা বাস করিয়াছিলেন সর্ব্বত্রই গোলাপ মা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। মার ও ভক্তদের খাওয়া দাওয়ার দেখা শুনা করা এই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। এক কথায় মার ভক্ত সংসারের তিনিই ছিলেন প্রধান গিন্নী। ভক্তদের প্রণামের সময় মার নিকট গোলাপ মা উপস্থিত থাকিতেন এবং মার অনুচ্চ উচ্চারিত আশীর্ব্বাদ ও ভক্তদের প্রশ্নোত্তর তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতেন।

"কোথাও যাতায়াত কালে গাড়ীতে উঠিবার ও নামিবার সময় গোলাপ মা মাকে হাতে ধরিয়া সাহায্য করিতেন এবং চলিবার সময় মা গোলাপ মার আঁচলটি ধরিয়া সলজ্জ বধুটির মত যাতায়াত করিতেন, এই দৃশ্য ভক্তেরা প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন।

এখানে মার বাটীতে * দেখিতাম,—গোলাপ মা শেষরাত্রে ৪টার পূর্ব্বেই উঠিতেন এবং নিজ ঘরে জপে বসিতেন। প্রায় তিন ঘণ্টা জপধ্যান করিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া নীচে আসিয়া দৈনিক রান্নার ভাণ্ডার বাহির করিয়া

* উদ্বোধন অফিসকে ভক্তগণ মায়ের বাড়ী বলিতেন।

দিয়া তরকারী কুটিতে বসিতেন। প্রথম রান্নার মত খানিকটা করিয়া দিয়া মাকে লইয়া গঙ্গা স্নানে যাইতেন ও আসিবার সময় নিত্য একটি ছোট পিতলের কলসী করিয়া ঠাকুর পূজার জন্য গঙ্গাজল লইয়া আসিতেন। পুনরায় আসিয়া তরকারী কোটায় যোগেন মার সাহায্য করিতেন এবং পরে পান সাজিতে বসিতেন। এখানে রোজ একশত খিলির কম পানে হইত না। আমি অনেক সময় দেখিয়া অবাক হইতাম যে, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার আলস্য বা অন্য কেহ সাহায্য করিতেছে না বলিয়া কোন অনুযোগ করিতেন না।

"পূজা শেষ হইলে প্রায় রোজই (কদাচিৎ কখনও মা বা অন্য কেহ) ফলমিষ্ট প্রভৃতি প্রসাদ প্রথমে শ্রীশ্রীমার জন্য একটি থালায় রাখিয়া পরে শালপাতে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া প্রথমে ভক্তদিগকে, তারপয় চাকর বামুনকে দিয়া আসিতেন। দ্বিপ্রহরে সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া আহারান্তে সামান্য একটু বিশ্রাম করিয়াই কখনও বা কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ—মহাভারত, গীতা বা ঠাকুর স্বামিজীর বই, পাঠ করিতেন। অথবা বৈকালের রান্নার জন্য আলু ছাড়াইয়া বা পানের জন্য সুপারী কুঁচাইয়া রাখিতেন বা সাধু ব্রহ্মচারীদের বালিসের ওয়াড় কি ছেঁড়া মশারী প্রভৃতি সেলাই করিয়া দিতেন। বেলা পড়িয়া আসিলে মা বা যোগেনমার কাছে গিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা ও মালাজপ করিতেন। কদাচিৎ কখনও বা বলরামবাবুর বাড়ী বেড়াইতে যাইতেন। সন্ধ্যা হইলে ঠাকুর ঘরে আলো দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া একটু পরেই নিজের ঘরে গিয়া জপ

ধ্যানে বসিতেন এবং রাত্রি প্রায় ৯টা অবধি উহাতে নিবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীশ্রীমা'ও বলিতেন,—"এই গোলাপ, যোগেন কত ধ্যান জপ করেছে—গোলাপ জপে সিদ্ধ" তৎপরে ভক্তদের আনীত ফল মিষ্ট প্রভৃতি থাকিলে ঠাকুরের রাত্রির ভোগের জন্য সব ঠিক করিয়া দিয়া মার ও ভক্তদের খাওয়া দাওয়ার সময় সেই সব প্রসাদী ফল মিষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা ও দেখা শুনা করিয়া তবে সেদিনকার মত নিশ্চিন্ত হইতেন।

"কে কোন্ জিনিষটি পাইল কি না পাইল এই সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি সজাগ ছিল। কেহ হয়ত কার্য্যানুরোধে সকাল সকাল খাইয়া কাজে গিয়াছেন—কিন্তু সেই দিনকার ঠাকুরের ভোগে বিশেষ কোন কিছু জিনিষ থাকিলে তিনি তাহার জন্য ঠিক মনে করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন এই সবে বিশেষত্ব কি? তাহা এই যে, ঐহিক লোকে আপন সন্তানাদির জন্য যাহা করিয়া থাকে, তিনি এই ভক্ত ভগবানের সংসারে সাধু, ভক্ত, ভগবানের সেবায় তাহা করিতেন—মায়ায় নয়—ভক্ত, ভগবানের সেবায়!

আমরা অনেক সময়ই কোথায়ও হয়ত হঠাৎ চলিয়া গিয়াছি, বিছানা, বালিস, মশারী কতক হয়ত উদ্বোধনের বাটীতেই পড়িয়া রহিল গোলাপমা কিন্তু সেই সব গুছাইয়া রাখিতেন। অপরিষ্কার হইলে নিজেই সাবান দিয়া বা ধোপা বাড়ী দিয়া কাচাইয়া আনিয়া ঠিক ঠাক করিয়া রাখিতেন। তিনি সব জিনিষ পত্রের হেপাজাত করিতেন বলিয়া আমরা দূরে যাইবার সময় তাঁহার কাছে নির্ভাবনায় সব রাখিয়া যাইতাম।



"ঠাকুরের দর্শন লাভের পর হইতে এইরূপে ভক্ত, ভগবানের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া গোলাপমা স্বীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা ত এই এতকাল উদ্বোধনের বাটীতে ছিলাম, কিন্তু সেখানের থালা বাসন জিনিষপত্র, ঠাকুর সেবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কি আছে না আছে বা কি দরকার সে সবের আমরা কোন ধার ধরিতাম না। সে সব গোলাপমাই দেখিতেন বলিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। তিনি যথাকালে প্রয়োজনীয় সব জিনিষ পত্র আনাইয়া রাখিতেন, মায় শাল পাতাটি পর্য্যন্ত। যদিও অনেক থালা ছিল, কিন্তু কখন হঠাৎ দরকার পড়ে তাই সাধু ব্রহ্মচারীদের ছেঁড়া পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি এবং ভাঙ্গা বাসন প্রভৃতি বদলী করিয়া নূতন বাসনাদি বা অন্য কিছু কিনাইয়া রাখিতেন—অপচয় সহ্য হইত না। এমন কি কমলা লেবুর খোসা, আকের ছোলা এসবও শুকাইয়া রাখিতেন—উনুন ধরাইতে লাগিবে। মায়ের শিক্ষা ছিল 'অপচয় করতে নাই, অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিতা হন"। তরকারী-পত্রের খোসা, ভক্তদের আহারের পর পাতে পরিত্যক্ত এসবও নিয়া রাস্তার গরুকে দিতেন। উদ্বোধনের বাটীতে কতকগুলি খরগোস গিনিপিগ আছে, পান সাজা হইয়া গেলে পানের বোঁটাগুলি তাদের দিতেন। এ নয়, যে তিনি গিনিপিগ ভালবাসিতেন—ওরা পানের বোঁটা খাইতে ভালবাসে তাই। ভিখারী বৈষ্ণব আসিলে যথাসাধ্য দু একটি পয়সা দিতে ভুলিতেন না, মাঝে মাঝে কাপড়ও দিতেন। তারা জনিত, "মা" বলিয়া ডাক দিলেই উপর হইতে কিছু পড়িবে। নিজে পাথুরিয়াঘাটার দৌহিত্রদের নিকট হইতে মাসিক

দশটি করিয়া টাকা পাইতেন। উহা হইতে পাঁচ টাকা উদ্বোধনে নিজের খোরাকীর জন্য সাহায্য করিতেন। বাকী যা থাকিত তাহা ঐরূপ দীন দুঃখীকে দিতে ফুরাইত। নিজের বিশেষ কিছুই ব্যয় ছিল না। এক পাগলী আসিয়া "গোলাপের মা, আমি এইছি" বলিয়া প্রায়ই মাঝে মাঝে হাঁক ডাক করিত। কারণ, সে জানে গোলাপের মা কিছু খাইতে দিবেনই। কখন বা রাত্রে—যখন সকলে শুইয়াছেন তখন আসিয়া পাগলী ডাকিবে —'গোলাপের মা।' সামনের দরজায় আমাদের ধমক খাইয়া সে পিছনের দরজায় গিয়া 'গোলাপের মা' বলিয়া ডাক সুরু করিল! 'এত রাতে তোকে কি দেই ?' বলিয়া উঠিয়া যা থাকে কিছু দিয়া আসিলেন। দুঃখ করিয়া বলিতেন,—'আহা পাগল, অনাথ, দুয়ারে দুয়ারে মেগে খায়, সময় হউক, অসময় হউক, এলে একমুঠো দিতে হয়'। অভাবে পড়িয়া কেহ কিছু চাহিলে তিনি ভিক্ষা করিয়াও কিছু দিতে চেষ্টা করিতেন। গরীব প্রতিবেশী কাহারও অসুখ হইলে "ও দুর্গাপদ, 'ও কাঞ্জিলাল একবারটি দেখে এস'— এই বলিয়া ভক্ত ডাক্তারদের নিয়া তাহাদের দেখাইতেন। এইরূপে যথাসাধ্য সকলের সেবা করিতেন। নিজে কিন্তু নেহাৎ অসমর্থ না হইলে কখনও সেবা নিতে চাহিতেন না এবং তাহাও একটু কেহ সেবা করিলে তাহা কতই মনে করিতেন।

"গোলাপমা নির্ভীক স্পষ্ট-বক্তা ছিলেন। তাই মা কখনো কখনো তাঁহাকে বলিতেন 'ও গোলাপ, ও কি হচ্ছে তোমার, অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়'। মা বলিতেন 'গোলাপের সত্য কথা বলতে গিয়ে চক্ষু-লজ্জা ভেঙ্গে গেছে'।

'তাঁহার চরিত্রে আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার ছিল যে, তাঁহার অভিমান ছিল না। চিকিৎসার্থ ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান কালে গোলাপ মা ভক্তদের কাছে কত লাঞ্ছনা সহিয়াছেন। কিন্তু অভিমান করিয়া চলিয়া যান নাই। গোলাপমা বলিতেন "কি আশ্চর্য্য সেই সময় কেহ ঠাকুরের কাছে আমার নামে কোন কথা লাগালে স্বপ্নে দেখতেম ঠাকুর সে সব আমাকে বলে দিচ্ছেন:—'ওগো, তোমার বিরুদ্ধে এই সব কথা বলছে—তুমি বল অমুক (জনৈক স্ত্রীভক্তের নাম করিয়া) তোমাকে খুব ভালবাসে, সেও এই সব বলেছে'। সমস্ত রাত ঠাকুরকেই স্বপ্ন দেখতেম। লোকের ভালমন্দ কথা আমার কাণেও ঢুকত না"। বর্ত্তমান কালেও আমরা অনেকে কত সময় রুক্ষ কথা বলিয়া তাঁহাকে কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছি। ইহাতে তৎকালীন অসন্তুষ্ট হইলেও তিনি সেই সব কখনও মনে করিয়া রাখিতে বা রাগ করিয়া থাকার ভাব পোষণ করিতেন না। 'সতের রাগ জলের দাগ।'

"গোলাপমার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কোন ছুঁৎমার্গ ছিল না। মা বলিতেন,—'গোলাপের মনে কোন বিকার নেই, দিলে হয়ত খানিকটা দোকানীর আলুর দম্ খেয়ে!' আর মেয়েদের যে সাধারণতঃ একটু শুচিবাই থাকে তা তাঁহার ছিলই না। শুচি অশুচি বিচার,—এক মনের নিম্ন অবস্থায় থাকে না, আর মনের উচ্চ অবস্থায় থাকে না। শ্রীশ্রীমার ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী একদিন মাকে বলিয়াছেন,—'একদিন দেখি গোলাপ দিদি পায়খানা সাফ করে এসে (মায়ের ব্যবহৃত উপরকার পায়খানা গোলাপমাই

রোজ সাফ করতেন) আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল, আমি বল্লুম ওকি, গোলাপ দিদি, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস', গোলাপ দিদি বল্লে 'তোর ইচ্ছা হয়, তুই যা না।' শুনিয়া মা বলিলেন, 'গোলাপের মন কত শুদ্ধ, কত উঁচু মন তাই ওর অত শুচি অশুচি বিচার নেই, অত শুচিবাই টাইয়ের ধার ধারে না, ওর এই শেষ জন্ম, তোদের অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার।'

"রামপ্রসাদের গান ঠাকুর গাহিতেন,—'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি, (তাদের) দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি'—এক অজ্ঞানীর শুচি বিচার অত থাকে না, আর ঠিক ঠিক জ্ঞান হইলে থাকে না।

শ্রীশ্রীমা আরও বলিয়াছিলেন 'গোলাপের মনটি শুদ্ধ। বৃন্দাবনে মাধবজীর মন্দিরে আমরা দর্শন করতে গেছি, সঙ্গে ছেলে-যোগেন (১) এরা সব; কাদের ছেলে মেয়ে যেন নোংরা করে দিয়ে গেছে। সবাই নাক সিঁটকুচ্ছে কিন্তু কেউ পরিষ্কারের চেষ্টা কচ্ছে না। গোলাপ তা দেখে অমনি নিজের নূতন মলমলের ধুতি ছিড়ে পরিষ্কার করলে। মেয়েগুলো দেখে বল্‌ছে,—এ যখন ফেলছে তবে এরই ছেলে নোংরা করেছেরে! আমি মনে মনে বলছি মাধব দেখ দেখ কি বল্‌ছে। কেউ বা বলছে এরা সাধুলোক, এদের আবার ছেলেপিলে কি? এঁরা ফেলছেন সব্বায়ের দর্শণের অসুবিধা হচ্ছে—মন্দিরে ময়লা রয়েছে, এজন্য।'

(১) স্বামী যোগানন্দ।

"'এই গঙ্গার ঘাটেই যদি কোন ময়লা গোলাপ দেখেলে, হেথা সেথা থেকে ন্যাকড়া কুড়িয়ে এনে পরিষ্কার করে ঘটি ঘটি জল ঢেলে ধুয়ে দিলে! এতে দশ জনের উপকার হল। তারা যে শান্তি পেলে, ওতে গোলাপেরও মঙ্গল হবে, তাদের শান্তিতে এরও শান্তি হবে।

"'অনেক সাধন তপস্যা করলে, পূর্ব্বজন্মের বহু তপস্যা থাকলে তবে এজন্মে মনটি শুদ্ধ হয়'।

"মা-গঙ্গার প্রতি গোলাপ মার অগাধ ভক্তি ছিল। এই অতি-বৃদ্ধ বয়সে অসমর্থ হইয়াও লাঠিভর দিয়া রোজ গঙ্গা স্নানে যাইতেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, —'যোগেন যাবে শুক্ল আর আমি যাব কৃষ্ণপক্ষে'। ঠিক তাহাই হইয়াছে গোলাপ মা দেহ রক্ষা করিয়াছেন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। আমি বলিয়া আসিয়াছিলাম,—"গোলাপ মা, আমি ফিরে এলে তবে যাবেন'। তা আমার ভাগ্যে তাঁহার শেষ সময়ে উপস্থিত থাকা ঘটিল না!

"শ্রীশ্রীঠাকুর ও সাধু ভক্তগণের সেবা করা যাঁহার মুখ্য কাজ ছিল, যিনি ছায়ার ন্যায় প্রায় সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শ্রীশ্রীমার ৩৬ বৎসর সেবাধিকার পাইয়াছিলেন, যিনি সঙ্গে থাকিলে শ্রীশ্রীমার 'ভরসা'। অহো ভাগ্য, কত জন্ম জন্মান্তরীণ তপস্যা! ৩৬ বৎসর সেবা—মূর্ত্তির নয়, সাক্ষাৎ শরীরী ভগবানের!!" * * *

শ্রীশ্রীমার মহাপ্রস্থানের পাঁচবৎসর না যাইতে মায়ের প্রধানা সেবিকা গোলাপ মা ঠাকুরের পাদপদ্মে মিলিতা হইলেন। শরৎ মহারাজ দিন দিন ধ্যান জপের সময়ের মাত্রা বাড়াইতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ বর্ষ

বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে (পাঞ্জাবে) অবস্থান করিলেও অল্প সময়ের ব্যবধানে যোগীন মা ও গোলাপ মা দেহরক্ষা করায় শরৎ মহারাজ যে অত্যধিক ক্লেশবোধ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিয়াও তখন বঙ্গদেশে ফিরিতে পারি নাই। তারপরেও প্রায় ছয় মাস পাঞ্জাবে অবস্থান করিয়া ১লা জুলাই (১৯২৫ খ্রীঃ) উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলাম। ইহার প্রায় দেড়মাস পরে শরৎ মহারাজ পুরী হইতে উদ্বোধনে ফিরিলেন। ষ্টেশনে সকলেই গিয়াছিলাম। সেখানে বিশেষ কোন কথা হয় নাই। দ্বিপ্রহরে তাঁহার আহারের পরে যখন কথা হইল তখন দেখিলাম অনেক কথাই বুঝিতে কষ্ট হইতেছে। বুঝিলাম বিদেশে পনর মাস থাকিবার সময়ে শরৎ মহারাজের অনেক দাঁতই পড়িয়া গিয়াছে। তিনিও আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন তারপর বলিলেন,—'আমার কথা বুঝি বুঝতে পাচ্ছ না? তা দু চার দিন শুনলেই অভ্যাস হয়ে যাবে।' ইতি মধ্যে ৪।৫ দিন গত হইয়াছে, এখন আর তাঁহার কথা বুঝিতে কষ্ট হইত না।

স্বামী সারদানন্দ পূর্ব্বের ন্যায় জপধ্যানে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত নিত্যই নিযুক্ত আছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সকালের দিকে কথা বলিবার সুবিধা হইত না। বৈকালে ও সকল দিন তাঁহাকে একা পাওয়া যাইত না। সুতরাং বিশেষ ভাবে কথা বার্ত্তা বলিবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই।

একদিন সকালে স্নানে যাইবার পূর্ব্বে শরৎ মহারাজ বলিলেন, —আজ ৩টার সময় তোমার সঙ্গে কথা হবে, কি বল? আমি ত তাহাই প্রার্থনা করিতেছিলাম সুতরাং 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি জানাইলাম। তিনি স্নানে গেলেন।

বৈকাল ৩টার সময় শরৎ মহারাজ বসিয়া আছেন আমি আসিয়া দূরে বসিলাম। তিনি বলিলেন,—'কেমন কাজ হ'ল পাঞ্জাবে?' আজ তাঁহারই কথা বেশী শুনিব স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম সুতরাং উত্তরে নিবেদন করিলাম,—'সে সকল সংবাদ ত পত্রেই পেয়েছেন তার বেশী কিছু হয় নাই।' তিনি বলিলেন, —এখন কিছু দিন এখানে থাকবে ত? এমন করুণ স্বরে তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে কখন কথা বলিতে শুনি নাই। কথা শুনিয়া কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, শুধু তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অতঃপর তিনি যোগীন মার কথা প্রথমে বলিয়া পরে গোলাপমার কথা বলিলেন। তারপর পুরীতে যাইয়া শরীরও মন তাঁহার খুব ভালই ছিল বলিলেন।

শরৎ মহারাজের উদ্বোধনে ফিরিবার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মঠ হইতে কখন দলে দলে কখন একা একা নিত্য সাধু ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম,—পাঞ্জাব যাইবার সময় যে হাওয়া দেখিয়া গিয়াছিলাম সে হাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীত বহিতেছে। শরৎ মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া এবার সকলেই যেন চলিতে চাহিতেছেন সকলের কথাবার্ত্তায় এমন ভাবই প্রকাশ পাইতেছিল। ইহা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কনভেনসন বা মহা সম্মেলনী বেলুড়

মঠে হইবে যে স্থির হইয়াছে তাহার পরামর্শের জন্যও অনেকে অনেক সময় আসিতে লাগিলেন। তিনিও 'যখন যেমন, তখন তেমন', 'যার সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন' হইয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া যাইতেন। তাঁহার প্রতি কাজে প্রকাশ পাইত, তিনি নির্লিপ্ত তিনি সাক্ষী স্বরূপ।

আগত মহা সম্মেলনীতে সকল কেন্দ্র হইতে যে সকল সাধু আসিবেন তাঁহারা মঠ মিশনের কর্ম্ম ধারা কি ভাবে হওয়া বিধেয় অর্থাৎ যাহাতে কাজ শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন স্থির হইল। এই জন্য সকলের অভিমত জানিবার জন্য এক কমিটি হইল। আমার যাহা বক্তব্য তাহা লিখিত ভাবে যথা সময়ে কমিটির হস্তে প্রদান করিলাম।

এক দিন শরৎ মহারাজ আমাকে ডাকিলেন। আমি আসিয়া দেখি তিনি কত গুলি কাগজ লইয়া বসিয়া আছেন এবং কি লিখিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—'বস, এই হাতের কাজটা সেরেই তোমার সঙ্গে কথা হবে।' পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাতের কাজ শেষ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি ৩৫ হতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক সাধুদের দ্বারা মঠ মিশনের কাজ চালাতে চাও? আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ। এঁরাই ট্রাষ্টি হবেন, ৪৫ বৎসরের উপর যে সকল ট্রাষ্টির বয়স তাঁরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—যদি পদত্যাগ না করেন?

আমি বলিলাম,—কোন উন্নতির আশা মঠ মিশনের নেই।

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—তুমি কি বলেছ প্রাচীনগণের সেবা যুবা সাধুগণ করবে না চাকর রেখে কাজ চালাতে হবে?

আমি বলিলাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—তার মানে? উত্তরে বলিলাম,—আমার সকল কথা যদি আমায় নিবেদন করতে অনুমতি করেন তবে বলতে পারি, আমি কোন উদ্দেশ্যে কি কথা বলেছি। শরৎ মহারাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—'বল।'

প্রথম,—প্রাচীন সাধুগণ সকলেই ঘর মুখো হয়েছেন। তাঁহারা নিজেরা কাজ করতে পারেন না অপর কাহাকেও কোন কাজে পাঠাতে চান না. সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে থাকতে ভালবাসেন। এর ফলে মঠ মিশনের শাখা কেন্দ্রে লোকাভাব হয়েছে, কাজ এগুতে পাচ্ছে না। এই জন্য ৩৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সের সাধুগণ ট্রাষ্টী হয়ে মঠ মিশন চালালে কাজ প্রীতি ও শৃঙ্খলার সহিত চলবে বলেই আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয়,—আমরা মানুষ হবার জন্যইত আপনাদের নিকটে আছি। অসম্পূর্ণ বলেই ত আমাদের শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন। সে অবস্থায় আমরা যদি ক্রমাগত প্রাচীনদের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হই তা হলে নবীনের খোলে প্রাচীনের ব্যবহারিক ভাব গুলিই বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আমরা প্রাচীনগণের চাল চলনেরই বেশী অনুকরণ করতে অভ্যস্থ হব তাঁদের যুবা বয়সের ত্যাগ তপস্যারদিক দিয়েও যাব না।

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—সে দোষ কার, তোমাদের না প্রাচীনদের? দোষ ত আমাদেরই কিন্তু সে দোষ যাতে আমাদের মধ্যে না আসতে পারে তারই জন্য এমন শ্রুতি কটু কথা বলতে হচ্ছে' বলিয়া আমি অসম্পূর্ণ অংশ বলিতে লাগিলাম,—শুধু যদি

আমাদের মঠ থাকত আমি কখন চাকর দিয়ে প্রাচীনগণের সেবার ব্যবস্থার কথা তুলতেম না। মঠে ঠাকুর পূজা, গুরুসেবা প্রবর্ত্তকগণের অবশ্য করণীয় কার্য্য কিন্তু আপনারা যখন 'মিশন' সৃষ্টি করে তার সঙ্গে দেশের সেবা যুক্ত করে দিয়েছেন আর সেই সেবা কাজে যখন লোকাভাব অথচ প্রাচীনগণের সেবায় কোথায়ও ৮।১০ জন, কোথায়ও বা ৪।৫ জন কোথায়ও বা ২।৩ জন রয়েছেন দেখা যাচ্ছে—তখন এ রকম কথা না বলে কি মাইনে দিয়ে লোক রেখে কাজ চালান ভাল বলতে পারি না? পূর্ব্বে মঠ মিশনের কাজ অল্প সংখ্যক লোকে যা করতে পেরেছে এখন তার চেয়ে ঢের বেশী লোক মঠ মিশনে থাকা সত্ত্বেও কাজ হচ্ছে না। যা অল্প সল্প হচ্ছে তাতেও কোন আন্তরিকতা প্রকাশ পাচ্ছে না। বিরক্তির সঙ্গে যেন হুকুম পালন কচ্ছে মাত্র।

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—এই তোমার বক্তব্য না আরও কিছু আছে? আমি বলিলাম,—অবস্থা যা তা ত বল্লেম এখন বাকী যদি কিছু থাকে, তা আমার ভাবেরদিকে লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—এখন তবে এস।

এই সকল কথাবার্ত্তার কয়েকদিন পরে শরৎ মহারাজ ঘরে বসিয়া আছেন। শ্রীমান্ বিমল (স্বামী দয়ানন্দ) বসিয়া কথা বলিতেছিল এমন সময় শরৎ মহারাজ আমাকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন,—"তুমি সে দিন যা বলেছিলে তা কাজে পরিণত

করা দেখছি সম্ভবপর হবে না। কেউ resign (পদত্যাগ) দিতে চাইবেন বলে মনে হয় না।"

আমি বলিলাম,—'আপনি ত resign (পদত্যাগ) দিতে পারেন, তাই করুন না?'

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'আমি অনেকবার resign দিতে চেয়েছি, কেউ তা accept (গ্রহণ) করতে চান না।'

আমি বলিলাম,—'আমি আপনাকে আদর্শ দেখাবার জন্যই পদত্যাগ করতে বলছি। নতুবা আপনার কাজ করবার সামর্থ এখনও যা আছে তা সুধীর মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ সুবোধ মহারাজ প্রভৃতি অনেকেরই নেই। তাঁরা দায়ীত্ব পূর্ণ পদে আছেন কিন্তু কাজের বেলা থাকেন বাইরে বাইরে। এঁরা যদি বিশ্রাম নেন এবং এঁদের স্থানে যদি চরিত্রবান, বিশ্বাসী কর্ম্মঠ লোক নেওয়া যায় তাহলে কাজ কি অনেক ভাল চলবে না?'

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'কাজ ভাল চলবে না হয় মেনে নিচ্ছি কিন্তু এঁরা যদি পদত্যাগ না করেন—কি করবে?'

আমি বলিলাম,—'করবার কোন পন্থা নেই বলেই আপনাকে resign দিতে বলছি। আপনাকে দেখে যদি এঁরা সরে দাঁড়ান তখন আর কাজে কোন গোল থাকবে না বলেই মনে হয়। তবে প্রথমটা চালিয়ে নিতে নূতনদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। কিন্তু আপনারা থেকে দেখে যেতে পারবেন—এঁরা কাজ করতে পারবে কি না?'

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—"আমি তোমার সবকথা না হয় বুঝিলাম কিন্তু আর যাঁরা আছেন তুমি তাঁদের বলগে না ?"

আমি বলিলাম,—'সে অনেক কথা' বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

এই মহা সম্মেলনে ভবিষ্যত কর্ম্ম পরিচালন সম্বন্ধে যিনি যে মতামত দিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ অসুবিধার দিকে নজর রাখিয়াই বলিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে কেহই তখন মঠের দলিল (Trust Deed) কিম্বা মিশনের নিয়মাবলীর সহিত ওয়াকিবহাল হইয়া বলিতে পারি নাই। অথবা কন্‌ভেন্-সনের ফলে যে ওয়ার্কিং কমিটির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে প্রাচীনগণও দলিলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিধি নিয়ম প্রনয়ণ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ও নবীন উভয় দলই এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের উপরে অনুমান আশ্রয় করিয়া যাহা করিয়াছিলেন কখন তাহা আইনের আমলে আসিলে পরিষ্কার বেয়াইনী কাজ বলিয়া যে ধরা পড়িত একথা শরৎ মহারাজের দেহরক্ষার পরে ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম।

ইদানীং শরৎ মহারাজের বৈকালের দিকে কন্‌ভেন্‌সনের কথাবার্ত্তায় সকাল বেলা জপ ধ্যানে কাটিয়া যায়, সন্ধ্যার পরে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত নীচের ঘরে আসিয়া বসেন। সন্ধার বৈঠকে নিত্য নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়া থাকে। কোন ধরা বাঁধা নিয়ম ছিল না যাহা অতিক্রম করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না। এই বৈঠকে মহাত্মা গান্ধীর কথা হইত, দেশের কথা হইত। কত কি হইত।

একদিন শরৎ মহারাজ সান্ন্যাল মহাশয় ও পূর্ণানন্দ স্বামীকে লক্ষ করিয়া বলিতেছিলেন,—'আজকাল দেখছি কর্ত্তা না হতে পারলে অনেকে কাজ করতে চায় না। আমরা কিন্তু ঠাকুর স্বামিজীর কাছে এসব শিক্ষা পাইনি। চিরকাল অনুগত হয়েই কাজ করতে হবে শিখেছি।'

স্বামী পূর্ণানন্দ বলিলেন,—কংগ্রেস ত এই নিয়েই ক্রমাগত ভেঙ্গে যাচ্ছে। শরৎ মহারাজ উত্তরে,—না রাম, না গঙ্গা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এমন সময় সান্ন্যাল মহাশয় বলিলেন,—অত দূরে যাচ্ছ কেন? পূর্ণানন্দ ভিতরের কথা জানিতেন না তাই সান্ন্যাল মহাশয়ের ইঙ্গিতে কতকটা থতমত খাইয়া গেলেন।

শরৎ মহারাজ চিরদিন সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত কাজের পরামর্শ করিতেন। আজ সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত আগত কন্‌ভেন্‌সন্ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। আমরা বুঝিলাম এবার কার কন্‌ভেন্‌সনে তিনি যা মন্তব্য করিবেন স্থির করিয়াছেন তাহাতে আমাদের অক্ষমতার স্বীকার উক্তিই অনেকটা প্রকাশ পাইবে। বোধহয় তিনি এবার সব খুলিয়াই বলিবেন, কিছু আর রাখিয়া ঢাকিয়া যাইবেন না।

যথা সময়ে শ্রীশ্রীমার উৎসব আসিল। শরৎ মহারাজ বেলা ১১টার সময় গাড়ীতে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে উৎসব দেখিতে চলিলেন। যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের দ্বিতলে একখানা চেয়ারে বসিয়া শরৎ

মহারাজ চণ্ডীর গান শুনিতেছিলেন। ১২টার সময় পূজা শেষ হইল। এইবার ভোগ উঠিবে।

ঠাকুরের ভোগরাগ সকল হইল, শ্রীশ্রীমার পূজা ভোগরাগ শেষ হইল। শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'এইবার সব পাতা করে ফেল।'

বেলা ২টা পর্য্যন্ত বসিয়া লোক খাওয়ান দেখিলেন। তারপরে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন।

মায়ের উৎসবের ১২।১৪ দিন পরে শরৎ মহারাজের জন্ম তিথি পূজা ভক্তগণ উদ্বোধনে সম্পন্ন করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া শরৎ মহারাজকে ঠায় বসিয়া থাকিতে হইল। উৎসবের দিনে ভক্তগণ যত ফুল শরৎ মহারাজকে সাজাইবে বলিয়া আনিয়াছিলেন প্রথমে সেই সমস্ত ফুলের মালা দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে সাজাইতে আদেশ করিলেন। নিজের ঘরে যে কয়খানা ছবি ছিল শরৎ মহারাজ স্বয়ং সেই সকল ছবিতে ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। দলে দলে শিষ্যগণ আসিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার বিধুভূষণ রায়, শ্রীযুত জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলেন্দু বসু, যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত (ভুঁদিবাবু), শচীন্দ্রনারায়ণ সান্ন্যাল প্রমুখ শিষ্যগণ বেলুড় মঠ হইতে সন্ন্যাসীগণ সকলে আসিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। এমন সময় শ্রীমান গৌরাঙ্গ কতগুলি ফুলের মালা লইয়া শরৎ মহারাজকে পরাইবে বলিয়া আসিয়াছে দেখিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—ত্যাখ না এদের কাণ্ডখানা! মার বাড়ীর দ্বারীকে ভগবান করিয়া

ফেলিতে চায়। আমরা হলেম ঠাকুরের দানা, দৈত্য, ভূতের দল আমাদের কি ও সব মানায় না শোভা পায়' বলিয়াই গৌরাঙ্গকে বলিলেন,—'যা ঠাকুর ও মাকে প্রাণ ভরে সাজিয়ে আয় তারপর দেখা যাবে।' গৌরাঙ্গ প্রাণ ভরিয়া ঠাকুর ও মাকে সাজাইবার পরে যে সামান্য মালা ও ফুল লইয়া ফিরিয়াছিল শরৎ মহারাজ তাহা হাসিমুখে গ্রহণ করিলেন।

সমস্ত দিন পূজা, পাঠ, হোম, প্রসাদ ধারণে কাটিয়া গেল যাঁহার জন্ম-তিথি পূজা আমাদের মনে হয় এই দিন তাঁহারই বেশী অসুবিধা হইয়াছিল, তাঁহাকেই বেশী চিন্তিত থাকিতে হইয়াছিল।

একে ছোট বাড়ী, তাহাতে একসঙ্গে বহু লোকের সমাগম। স্ত্রী পুরুষ, বালক, বালিকা, একসঙ্গে এত লোক কোথায় বসিবে কেমন করিয়া খাওয়া দাওয়া করিবে এই সকল কারণে তাঁহাকে বার বার খোঁজ লইতে হইতেছিল লোকজনের খাওয়া দাওয়া কতদূর হল এখনও কত লোক বাকী আছে ইত্যাদি।

এতদিন ধরিয়া ঐ একই বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম,—শরৎ মহারাজ তাঁহার নিজের জন্য অথবা তাঁহার নামে কোন কাজে লোকে সামান্য অসুবিধা ভোগ করে ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। এই যে তাঁহার জন্ম-তিথি পূজা ইহাও তিনি করিতে পারেন নাই। তারপর সেবকগণের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিতে হইয়াছিল। পাছে সেবকগণ 'না' বলিলে দুঃখিত হন।

ঊনবিংশ বর্ষ

স্বামী সারদানন্দের রোজ নামচায় লেখা আছে,—১লা জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের জন্মতিথি পূজায় যোগদান করিতে ইটালী (শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ে) গিয়াছিলাম। এই রোজ নামচা দৃষ্টে দেখা যাইবে,—৬ই জানুয়ারী স্বামিজীর জন্মতিথি পূজায় যোগদান করিতে শরৎ মহারাজ বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন। সমস্ত দিন মঠে অবস্থান এবং প্রসাদ বিতরণ দর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন। ৯ই জানুয়ারী শ্রীমতী ফক্স ভগ্নীদ্বয় শরৎ মহারাজকে মধ্যাহ্নে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী ফক্স ভগ্নীদ্বয় আমেরিকা নিবাসীনী। ঠাকুরের সম্বন্ধে গ্রন্থে নানা কথা পাঠ করিয়া ঠাকুরের সাধনার স্থান দক্ষিণেশ্বর এবং ঠাকুরের শিষ্যগণের থাকিবার স্থান বেলুড় মঠ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং স্বামী সারদানন্দের অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় বৎসরাবধি বাগবাজার পল্লীতে এক ভাঁড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিয়া সাধনায় দিন যাপন করিতেছিলেন। আগামী ১১ই জানুয়ারী তাঁহাদের আমেরিকায় ফিরিবার দিন স্থির ছিল। তাই বিদায়ের পূর্ব্বে গুরুকে নিজ হাতে রান্না করিয়া খাওয়াইবার মানসে তাঁহারা শরৎ মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

আজ ১৬ই জানুয়ারী শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মতিথি পূজা। এই উৎসবে যোগদান করিতে শরৎ মহারাজ মঠে গিয়াছিলেন এবং সমস্ত দিন আনন্দ কোলাহলে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পরে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন সন্ধ্যারতির পরে শরৎ মহারাজ নীচের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন পার্শ্বে সান্যাল মহাশয় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন একধারে স্বামী পূর্ণানন্দ এবং দুইজন বাহিরের ভক্ত বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে একজন শরৎ মহারাজকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহারাজ, মঠ হইতে এখন যে ভাবে কাজ হইতেছে তাহা দেখিয়া কিন্তু মনে হয় না ঠাকুরের আগমনে এদেশে যে আমুল পরিবর্ত্তন হইবার কথা তাহা কখনও সাধিত হইবে।' উত্তরে শরৎ মহারাজ বলিলেন,—"এখন যে ভাবে কাজ হচ্চে তা এক রকম হচ্চে এর বেশী কাজ হবে দু'শ বছর পরে যখন ঠাকুর আবার আস্‌বেন। যেমন বুদ্ধদেবের প্রায় আড়াইশ বছর পরে সম্রাট অশোক এসে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম জগৎময় ছড়িয়েছিলেন তেমনই ঠাকুরের ভাবও জগতে তখনই ছড়িয়ে পড়্‌বে যখন ঠাকুর আবার আস্‌বেন।" ভক্তটী আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

শ্রীমতী কুক্ ইংলণ্ড নিবাসীনী। কিছুদিন যাবৎ ইনি কন্যা ও পুত্র সঙ্গে করিয়া বেলুড় মঠের অতিথি নিবাসে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে শিক্ষার জন্য পুত্র ও কন্যাটিকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এইবার ইনিও দেশে ফিরিবেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী কুক উদ্বোধনে আসিয়া শরৎ মহারাজকে

প্রণাম করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। শ্রীমতী কুক্ স্বামী সারদানন্দেরই অন্যতমা শিষ্যা।

আমাদের নিকট দিন গুলি যেমন গত হইবার তেমনই গত হইতেছিল কিন্তু শরৎ মহারাজের নিকট উহা যে দিন দিন অভিনব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া দেখা দিতেছিল তাহা তাঁহার মধুরতম স্বভাব ও সহাস্য বদন দেখিয়া প্রতীয়মান হইত। অনেক দিন হইতেই ত তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু ইদানীং তিনি যেমন শান্ত, যেমন প্রফুল্লভাবে ছিলেন এমন ভাব তাঁহাতে কখনও দেখি নাই। এই সময় পুরীধাম হইতে সংবাদ আসিল বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে ছয়টার সময় লক্ষ্মীদিদি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। লক্ষ্মীদিদি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, রামলাল দাদার কনিষ্ঠা ভগিনী। যেদিন এসংবাদ আসিল সেইদিন নানা কথার মধ্যে লক্ষ্মীদিদির ত্যাগ তপস্যার, সাধন ভজনের, অপরকে নকল করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা বলিতেছিলেন। পুরীতে অবস্থান কালে শরৎ মহারাজ প্রায়ই লক্ষ্মীদিদিকে দেখিতে যাইতেন এবং লক্ষ্মীদিদিও তাঁহাকে যত্ন সহকারে ভোজন করাইতেন। আজ সেই সকল কথা ও বলিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন,—লক্ষ্মীদিদির মহাপ্রস্থানে শরৎ মহারাজ সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। পর দিন হইতে শরৎ মহারাজকে পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল দেখাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীজগন্মাতা যাঁহাকে দেখাইয়াছেন,—'তুমি আমাতে অবস্থিত' তাঁহাকে শোক কতক্ষণ মুহ্যমান রাখিবে ?

শরৎ মহারাজের চরিত্রে এক বিশেষত্ব চিরদিন এই দেখিলাম

যে,—যখন যে কাজের উপর তিনি মন দিতেন তখন সে কাজে ষোল আনা মনই ঢালিয়া দিতে পারিতেন। লীলাপ্রসঙ্গ রচনা কালে তাহাকে সকাল হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিতে নিত্য দেখা যাইত। তখন উহাই ছিল তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম। ইদানীং জপ ধ্যান হইয়াছে মুখ্য কর্ম্ম। কি সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি আমন কর্ম্মে রত থাকিতেন। দ্বিপ্রহরের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময় আহার, বিশ্রাম, বিশ্রামান্তে চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া। কাহাকে কি লিখিতে হইবে তাহা শরৎ মহারাজ বলিয়া দিতেন শ্রীমান্ কিরণ লিখিত। সন্ধ্যারতির পরে ভক্ত সমাগমে তাঁহাকে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত নীচের ঘরে বসিতে হইত। বাহিরের সকল কর্ম্ম হইতে রেহাই পাইয়া তিনি আপনার মধ্যে আপনি যে ডুবিয়া যাইতেছিলেন তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহার মধ্যে বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী সঙ্ঘের মহা সম্মেলন আগত প্রায়। এই মহা সম্মেলনীর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি স্বামী সারদানন্দ মনোনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে নিত্য বৈকালে বসিয়া অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির অভিভাষণ লিখিতে হইত। লেখার বিষয়ে শরৎ মহারাজের স্বভাব ছিল, যাহা তাঁহার নামে বাহির হইবে তাহা তিনি লিখিবেন। এমন কি মিশনের সেবা কার্য্যাদির সাময়িক বিবরণী যাহা সংবাদ পত্রে বাহির হইয়া থাকে তাহা অপর কেহ লিখিলেও তিনি তাহা না পড়িয়া প্রকাশ করিতে দিতেন না। একবার ঐ রকম একটা মুদ্রিত বিবরণী পড়িয়া তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহাকে না জানাইয়া উহা মুদ্রিত করা হইয়াছে।

ইহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া মঠে শিষ্য স্থানীয় সহ কর্ম্মীদের জানাইয়াছিলেন,—'সেবা কার্য্যাদির রিপোর্ট ইচ্ছা করিলে তোমাদের নামেই বাহির করিতে পার কিন্তু আমার নামে যাহা প্রকাশ করিবে তাহা আমাকে না দেখাইয়া কদাচ প্রেসে দিবে না।' এই ব্যবস্থায় রিপোর্ট প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইতেছে ইহা শরৎ মহারাজকে জানান হইল। অগত্যা তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,—'সুধীর যদি দেখে দেয় তবে আমার আপত্তি নাই।' এই সকল কাজে তিনি ওজন করিয়াই যেন শব্দ ব্যবহার করিতেন। যে শব্দ প্রয়োগ করিলে হৃদগত ভাব সহজে প্রকাশ করা যায় তাহাই তিনি পছন্দ করিতেন। তাঁহার প্রতি লেখায় বিশ্বাসীর ভাব ও ভাষা ফুটিয়া উঠিত, পাঠকের মনে উহা অমোঘ ভাবে আঘাত করিত। চিরদিন তিনি ঠাকুরের মুখ চাহিয়া কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বাক্য এত মধুর, ভাষা এত সংযত ছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই তিনি কখন যথেচ্ছাচার, ব্যবস্থায় কোন পক্ষ পাতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার প্রশান্ত উদার হৃদয়ে যে সহানুভূতি, যে স্নেহ, মমত্ব বোধ সকলের জন্য 'নিরবচ্ছিন্ন স্রোত ধারার' ন্যায় নিত্যরূপে প্রবাহিত ছিল তাহার সহায়ে তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়া সকলকে উন্নত ও মহৎ হইবার সহায়তাই করিয়াছেন কখন বিরূপ হইয়া কাহাকেও মঠ মিশন হইতে বিদায় করেন নাই।

অভিভাষণের জন্য শরৎ মহারাজের লেখা নিত্য বৈকালে চলিয়াছে। মার্চ্চ মাস আরম্ভ হইয়াছে। নানা শাখা কেন্দ্র

হইতে সাধু ও গৃহী ভক্তগণ দলে দলে বেলুড় মঠে আসিতেছেন। এবং সেই সকল ভক্তগণ প্রায় প্রতিদিন বৈকালে উদ্বোধনে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিতেছেন—শরৎ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। ইহাতে শরৎ মহারাজের লেখা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি সন্ধ্যার পরেও বসিয়া বসিয়া লিখিতেছেন দেখা যাইত।

বেলুড় মঠে এই রকম সম্মেলন ইহাই প্রথম। সাধুগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ পরিচয়, ভাবের আদান প্রদান করিতে যাইয়া মঠকে মুখরিত করিয়া তুলিলেন—যেমন কংগ্রেসের সময় হইয়া থাকে।

এই মহা সম্মেলন আহ্বান করিবার যে হেতু ছিল তাহাকে সার্থক করিবার জন্য একটি প্রচার বিভাগ ও ছিল। সেই প্রচার বিভাগ হইতে কার্য্যের অনুকূল জন মত গঠন করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নবাগত সাধুগণকে কি হওয়া বিধেয় এবং কেমন করিয়া তাহা সাধিত হইতে পারে কথা-প্রসঙ্গে তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। এই ভাবে দিন যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল তখন শরৎ মহারাজ সেবক সাতু ও 'ক্যাপটেন' কিরণকে সঙ্গে করিয়া তিন দিন পূর্ব্বে মঠে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই যাত্রায় মঠে শরৎ মহারাজ ১৬।১৭ দিন ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এত দীর্ঘকাল মঠে অবস্থান করিতে আমরা কখন শরৎ মহারাজকে দেখি নাই।

পূর্ব্ব হইতে সম্মেলনের আরম্ভ দিন ১লা এপ্রেল ধার্য্য হইয়াছিল। যিনি এই দিনটা পছন্দ করিয়াছিলেন তিনি যে

'রসিক' লোক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরাজ জাতি ১লা এপ্রেলকে All fools' day (বোকা ঠকাইবার দিন) বলিয়া ধার্য্য করিয়াছে। এই দিনে বুদ্ধিমানের দল নানা উপায়ে আহাম্মুকদের বোকা ঠকাইয়া আনন্দ উপভোগ করে। যিনি এই দিন পছন্দ করিয়াছিলেন তিনি যে এই কথা জানিতেন না তাহা নহে। আজ মার্চ্চ মাসের শেষ দিন—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ, মহারথীগণ, অর্দ্ধরথীগণ, পদাতিকগণ সকলে নানা শাখা কেন্দ্র হইতে আজ বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছেন। স্থানাভাবের জন্য মঠের বাহিরে দুইটি বড় বাড়ী লওয়া হইল। কিন্তু সকলের আহারাদির ব্যবস্থা মঠেই হইত।

আজ ১লা এপ্রেল। প্রাতঃকালে সকলে আসিয়া মণ্ডপে বসিতে লাগিলেন। যথা সময়ে শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামিজী, সারদানন্দ স্বামিজী, অখণ্ডানন্দ স্বামিজী আসিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তগণ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া, 'শ্রীগুরু মহারাজজী কী জয়' বলিয়া প্রাচীনগণকে শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করিলেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনে স্বামী অম্বিকানন্দ 'ভজন' আরম্ভ করিলেন। শ্রীভগবানের মহিমা গানের সহিত সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। ইহার পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী সারদানন্দ অভিভাষণ * পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। ভক্তগণ জয়ধ্বনির দ্বারা শরৎ মহারাজের অভ্যর্থনা করিলেন। সেই

---

* শরৎ মহারাজ ইংরাজীতে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। সাধারণের জন্য উহার মুদ্রিত বঙ্গানুবাদের নকল দেওয়া গেল।

জয়ধ্বনির মধ্যে গম্ভীর ভাবে স্বামী সারদানন্দ পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—

"যখনই কোন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখনই দেখা যায়, সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতি উহার মূল তত্ত্বগুলি মানিয়া লইবার পূর্ব্বে প্রথমে লোকে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, শেষে তৎসম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করে। কোন নূতন আন্দোলনকে এই দুইটী অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেই হয়—ইহা যেন প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। আর যখন মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান, তখন কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য জগৎ সর্ব্বত্রই এই নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ, নীতি, রাজনীতি বা ধর্ম্ম—যে কোন ক্ষেত্রেই বল না কেন, যদি নূতন কোন সংস্কার করিতে চাও, নূতন কোন ভাবধারা—আনয়ন করিতে চাও, তবে দেখিবে, তোমার চারি পাশের লোক তোমার বিরুদ্ধে লাগিবে। আর তোমার প্রবর্ত্তিত সংস্কার-আন্দোলনের ভাবগুলি প্রচলিত ভাব হইতে যতই নূতন হইবে, ততই বাধা প্রবলতর হইবে। লোকে বলিবে, উক্ত আন্দোলনের মূলে যে ভাবরাশি—যে আদর্শ বিদ্যমান্, তৎপ্রভাবে বর্ত্তমান সমাজে যাহা কিছু ভাল ও প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহার ভিত্তি পর্য্যন্ত চূরমার করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি ঐ আন্দোলনের ভিতর যথার্থ জীবনীশক্তি থাকে, যদি উহা মানব-প্রকৃতির ও উহার বিভিন্ন অঙ্গ ও কার্য্যাবলির পরিচালক সার সত্য সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাধা সত্ত্বেও উহার বিনাশ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহার প্রভাব বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমে মানবহৃদয়ে উহা স্থায়িভাবে তাহার শিকড় গাড়িয়া বসিবে।

এই বাহিরের বাধা হইতেই ঐ আন্দোলনকে নিজ শক্তিরাশি একমুখী করিতে এবং যে মূল সত্যসমূহের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত সেইগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে—সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাকে মন্দ বলিতে পারা যায় না।

"কিছুকাল পরে এই বাধা আপনা আপনি ধীরে ধীরে চলিয়া যায়—উদাসীনতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে—যাহারা প্রথমেই উহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল, তাহারাই বলিতে থাকে—দেখ, এই যে আন্দোলন দেখিতেছ—ইহাতে নূতনত্ব আর কি আছে? ইহারা যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে ও শাস্ত্রে অমুক অমুক শ্লোকে সেই কথাগুলিই যে রহিয়াছে। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্ব্বেই এ সকল কথা জানিতেন এবং বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এগুলি করিয়া আসিতেছেন। অতএব এগুলি লইয়া অধিক মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। এই দ্বিতীয় অবস্থায় বাধা অপসারিত হওয়ায় ঐ আন্দোলন বহুদূরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কালে সমাজের লোকে যখন উহার অস্তিত্ব ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া লয়, তখন উহা সমাজে একটা স্থান অধিকার করিয়া বসে—উহাকে বাধা দিবার—উহার বিরুদ্ধে লাগিবার আর কেহ থাকে না।

"সুতরাং এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শেষে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি-ক্রমে উহা সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে আর এইরূপে সমাজে পরিগৃহীত ও আদৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে

তখন হইতে দলে দলে উহাতে লোক প্রবেশ করিতে থাকে। তবে ঐ আন্দোলনের উন্নতির ইতিহাসে এইরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলেই ঐ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে তাহা মনে করা উচিত নহে। কারণ, বাধাহীন অবস্থায় পৌঁছিয়া —প্রথম অবস্থার উৎসাহ ও উদ্যমে যেন একটু ভাঁটা পড়ে আর প্রথমাবস্থায় উক্ত আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে যে ভাবের গভীরতা ও উদ্দেশ্যের একতা ছিল, হঠাৎ বিস্তারের সঙ্গে তাহা কমিয়া যায়। সুতরাং তখন বাহিরের বাধার স্থলে উহার অঙ্গগণের বিভিন্ন মতামতের ফলে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে প্রথমাবস্থায় খাঁটি সত্যের জন্য যে একটা স্বার্থত্যাগের ভাব ছিল, তৎস্থলে খাঁটি সত্যের সঙ্গে সত্যাভাসের আপোষ করিয়া—সমাজে একটা প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা এবং যথার্থ ভিতরের জিনিষটার পরিবর্ত্তে বাহিরের চাকচিক্যের দিকে—দেখাইবার চেষ্টার দিকে একটা ঝোঁক হয়—যাহারা সত্যের জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার না করিয়া আরামে জীবন কাটাইতে চায়, তাহাদের স্বভাবতঃই এই দিকেই প্রবৃত্তি হয়। আর যদি ঐ আন্দোলনের নেতাগণ সতর্ক দৃষ্টিতে জাগরিত না থাকেন অথবা ঐ সকল দোষের উৎপত্তিতে বাধা দিবার জন্য—উহাদিগকে সমূলে বিনাশের জন্য কোনরূপ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়া ঐ অবস্থাটাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা না করেন, তবে তাহার ফলে যে কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমতঃ, এবং প্রধানতঃ যতই স্বার্থের ভাব প্রবেশ করিতে থাকে, ততই যে প্রেমের সূত্রে এতদিন সকলে একত্র ও গ্রথিত ছিলেন, তাহা

কমিতে থাকে এবং সঙ্ঘের অঙ্গগণ সমগ্র সঙ্ঘের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা ভুলিয়া পৃথক পৃথক ভিন্ন এক একটা দল হইয়া সমগ্র সঙ্ঘের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া উহার পৃথক পৃথক এক একটা অংশের উন্নতিবিধান ও উহার স্থায়িত্বসাধনের ভাব লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হন। এইরূপ সঙ্ঘের ভিতর বিশ্লেষণের ভাব এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সমস্ত সঙ্ঘটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। আর কালবশে গুরুজনের অবাধ্যতা, অহঙ্কার, আলস্য ও অন্যান্য শত শত দোষ সঙ্ঘের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিনের মত উহার সর্ব্বনাশ সাধন করে।

"শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাও ইহার প্রধান প্রবর্ত্তক ও নেতা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্দ্ধানের কয়েক বর্ষ পূর্ব্বেই এইরূপ বাধা ও উদাসীনতারূপ সোপানদ্বয় অতিক্রম করিয়াছিল—তিনি তাঁহার তিরোভাবের পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণ মিশন নাম দিয়া ইহাকে একটা কার্য্যোপযোগী গঠন দিয়াছিলেন ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই ইহা প্রায় ত্রিশ বর্ষ ধরিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় পঁহুছিয়াছে, যখন ইহা ভারত ও ভারতেতর কয়েকটি দেশের লোকের হৃদয়ে আদর ও স্থান পাইয়াছে। প্রথমে ইহা প্রধাণতঃ বঙ্গদেশের একটি ক্ষুদ্র নগণ্য সঙ্ঘমাত্র ছিল—এক্ষণে এই অল্পকালের মধ্যে উহা ভারতের সকল প্রদেশে শুধু ভারতে কেন, ব্রহ্মদেশে, সিংহল, যুক্ত মালয় রাজ্য, এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য দেশে যথা আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং

ইউরোপেও কতক অংশে বিস্তৃত হইয়াছে। বন্ধুগণ, তোমরা এবং তোমাদের সহযোগী কর্ম্মী ভ্রাতৃগণ সঙ্ঘের এই গৌরবময় পরিণাম আনয়নের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় শ্রীপ্রভুর হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। তোমরা একমাত্র শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া বারাণসী, কনখল ও বৃন্দাবনে জনহিতকর সেবাকেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিয়াছ—তোমাদের ভবিষ্যদ্দর্শী নেতা তাঁহার কতকগুলি বক্তৃতায় যে বলিয়াছেন, "অর্থবলে বলী ব্যক্তি নহে, কিন্তু চরিত্রবল ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি তীব্র অনুরাগরূপ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মানুষই এইরূপ কার্য্যকে স্থায়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে", তাঁহার সেই বাক্য জনসাধারণের নিকট প্রমানিত করিয়াছ। তোমরা মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অনেক প্রদেশে এবং ইদানীং নাগপুর, বোম্বাই, কুয়ালালামপুর ও রেঙ্গুনে প্রচার ও শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ স্থাপন করিয়াছ—ঐ সকল স্থানের জনসাধারণ তোমাদের কার্য্য দেখিয়া তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তোমাদের সহযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। আর তোমরা সমগ্র ভারতে দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত এবং অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন নরনারীর সাহায্যকল্পে পুনঃপুনঃ সেবাকেন্দ্র খুলিয়া সমগ্র দেশবাসী জনসাধারণের হৃদয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর এখন যে লোকের একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, তাহা জাগাইতে সাহায্য করিয়াছ। তোমরা অদ্ভুত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে তোমাদের নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া সমানে লাগিয়া আছ, কোন কোন স্থলে আবার সমগ্র জীবন

একটা স্থানে কামড়াইয়া পাড়িয়া আছ, কারণ, তোমাদের অবসর দিয়া তোমাদের স্থলে বসাইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই।

"সত্যই, আমাদের প্রভু এবং তাঁহার মনোনীত আমাদের সঙ্ঘের মূলনেতা তোমাদেরই মধ্য দিয়া দরিদ্র ভারতে এবং অন্য অধিকতর সৌভাগ্যশালী দেশসমূহে অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু উহাপেক্ষা বড় বড় কায এখনও বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। আর আমাদের প্রভু ও স্বামিজী সময়ে তোমাদেরই মধ্য দিয়া উহা সাধন করিবেন, যদি তোমরা তাঁহাদের পবিত্রতা, সংকল্পের একনিষ্ঠতা, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ, এবং যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু মহৎ—তৎসমুদয়ের উপর আত্মসমর্পণরূপ তাঁহাদের জীবনের মহান্ গুনরাশির অনুকরণ করিতে পার এবং এতদিন যে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াছ, যদি এখনও তাহাই করিয়া যাইতে পার। কারণ, যদি আমরা তাঁহাদের কার্য্য করিতে অন্য ভাব লইয়া অগ্রসর হই, এবং তাঁহাদের কার্য্য করিতে নির্ব্বাচিত হইয়া এতদিন উহা করিতে পাইয়াছি বলিয়া যদি আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠি, তবে আমরা—সেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছি এবং আমাদের স্থানে কার্য্য করিবার জন্য অপরে নির্ব্বাচিত হইয়াছে—দেখিয়া শীঘ্রই আমাদিগকে শোকের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। বাইবেলে উল্লিখিত তথাকথিত ঈশ্বর-নির্ব্বাচিত ইস্রায়েলিটদের কথা স্মরণ কর—তাহারা—শ্রীপ্রভুর কথা এবং 'প্রভু অতি সামান্য ধূলিকণা হইতে পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য করিবার লোক গড়িয়া তুলিতে পারেন'—তাঁহার

এই সাবধান বাক্যে কর্ণপাত করে নাই এবং তাহারা কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল—ভাবিয়া দেখ। এই প্রসঙ্গে ভারতে এক সময়ে আমাদের কতকগুলি প্রবল সম্প্রদায়ের দুর্গতির কথাও স্মরণ রাখিও।

"অতএব বিগত ত্রিশবর্ষ ধরিয়া আমাদের মিশন যেরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে গেলে যদিও আশ্চর্য্য হইতে হয়, ঐ সঙ্গে সঙ্গে গভীরভাবে এ প্রশ্নটিও আপনা আপনি আসিয়া পড়ে যে, এই বিস্তারের ফলে কি আমাদের আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় যে প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল, তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, অথবা যে কার্য্য আমরা প্রথমে আদর্শের উপর তীব্র অনুরাগ-বশে ঐ আদর্শের জয় ঘোষণার জন্য করিতাম, তাহা বর্ত্তমানে আমাদের নামযশোলিপ্সা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, ও নিজ নিজ পদ-গৌরবের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিবশতঃ দাসত্ব ও বন্ধনে পরিণত হইয়াছে! সত্যই এক্ষণে এই সকল গুরুতর প্রশ্নের বিচার, চিন্তা, ও সমাধানের—খাঁটি শস্য হইতে তুষ এবং বিশুদ্ধ ধাতু হইতে খাদ বাছিয়া পৃথক্ করিবার সময় আসিয়াছে।

"এই বর্ত্তমান মহাসম্মেলন তোমাদিগকে এই সুযোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছে। ইহাতে সমবেত হইবার ফলে তোমরা তোমাদের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সহকর্ম্মী-দিগের সহিত এবং গুরুজনদিগের সহিত মিলিত হইবার এমন সুযোগ ও সৌভাগ্যলাভ করিয়াছ, যাহা সচরাচর ঘটে না। এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা

অনেক শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইবে—সমগ্র মিশনের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটা স্থির করিতে এবং আমাদের সঙ্ঘের এই সঙ্গীন অবস্থায় সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক উহার প্রচলিত ভাবরাশি পরিগৃহীত হইবার ফলে যে সকল বিপদ ও দোষ প্রবেশ করে বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে নিজেদের দূরে রাখিবার অবকাশ পাইবে। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকলে অকপট ও সরলভাবে এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, তোমরা এই অদ্ভুত বিস্তারের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সেগুলি করিতে যাইয়া আমাদের সেই গৌরবময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ কি না। আদর্শ টিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক, কারণ, সেই আদর্শের ভিতরই প্রত্যেক আন্দোলনের সঞ্চিত শক্তি—কুণ্ডলিনী—নিহিত থাকে। নিজেকে ও অপরকে ইহারই তীব্র আলোকে বিচার করিয়া লও। ইহা যদি করিতে পার, তবেই তুমি আমাদের কার্য্যের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়া এই মহাসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে।

"এইরূপ সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে—ইহা যেন স্মরণ রাখিও—এইরূপেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্ঘসমূহের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল—আমরাও সেই প্রাচীন, বারম্বার পরীক্ষিত পথে ভ্রমণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ কয়েকবার এই প্রণালী

অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সঙ্ঘের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সঙ্ঘ খুব বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের মহৎ কর্ম্মের সর্ব্বনাশ বা বিলোপসাধন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদের শিষ্যগণও তাঁহাদের সঙ্ঘজীবনের প্রাচীন যুগে সময়ে সময়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানার্থ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই কার্য্যপ্রণালী কিছু নূতন নহে—কিন্তু যাঁহারা এক্ষণে নিজেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের অকপটতা ও লক্ষ্যের একতানতার উপরই এই প্রণালী প্রয়োগের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব তোমরা স্বেচ্ছায় যে কার্য্যসাধনে উদ্যোগী হইয়াছ, তাহা শ্রীপ্রভুর কৃপায় যতদিন না সমাপ্ত হইতেছে, ততদিন প্রাণপণে খাটিতে থাক—আমাদের নেতা আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় 'উঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন অনলসভাবে অগ্রসর হইতে থাক' এই কথাগুলি বলিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেককে উহাতে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিতেছি। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, সন্তানগণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শপ্রচাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মিগণ, আমি আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র নাম লইয়া, আমাদের জগদ্বিখ্যাত নেতা স্বামী বিবেকানন্দের নাম লইয়া, এবং আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি—আমাদের প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম লইয়া—তোমাদের সকলকে স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছি।"

অভিভাষণ পাঠ শেষ হইল। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর জয়ধ্বনির মধ্যে স্বামী সারদানন্দ আসন গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে সম্মেলনের অন্যান্য কার্য্য চলিতে লাগিল।

এই অভিভাষণ লইয়া মঠে কোলাহলের সৃষ্টি হইল। একপক্ষ বলিতে লাগিলেন,—'স্বামী সারদানন্দ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিকে অতীতের দিকে সম্প্রসারিত করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্প্রদায় সকলের উত্থান ও পতনের হেতুগুলি উপলব্ধি করিয়া সেই অভিজ্ঞতার কথাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন।' অপর পক্ষ বলিতে লাগিলেন,—'এই কথা অতি সত্য। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনেও পতনের সেই সকল হেতুগুলি যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি যেন আমাদের চক্ষুতে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখাইতেছেন,—'ত্মাখ তোমাদের মধ্যেও পতনের বীজ উপ্ত হইতেছে।'

স্বামী সারদানন্দ জীবিত থাকা পর্য্যন্ত আমরা কখন 'active' মঠ পলিটিক্সে যোগ দান করি নাই। সুতরাং উভয় পক্ষ যে কথা লইয়া বাদানুবাদ তুলিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য সমস্ত অভিভাষণটি উদ্ধৃত করিতে হইল।

১লা এপ্রেল গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গনে সাধুদের মহাসম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বকুলে কলিকাতায় এই দিনে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাও আরম্ভ হইয়াছে।

এই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য-প্রসঙ্গে কতবার শরৎ মহারাজকে বলিতে শুনিয়াছি,—দেশের নেতাগণ যতদিন জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের ভাবরাশী বিশেষভাবে প্রচার করিতে

আরম্ভ না করিবেন ততদিন এই বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেশের অশান্তি দূর হইবে না। ঠাকুরের 'যত মত তত পথ যতদিন দেশবাসী হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে ততদিন কাহার সাধ্য এই রকম মারামারি কাটাকাটি দূর করে।

মহাসম্মেলনে শত কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও শরৎ মহারাজ কলিকাতার দাঙ্গার সংবাদ, নেতাগণ কি উপায় অবলম্বন করিয়া রক্তারক্তি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এই সকল তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার জন্য কত প্রশ্নই না করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ স্বামী সারদানন্দ সকল সাম্প্রদায়িক মতবাদ হইতে সর্ব্বদার জন্য নিজকে দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই প্রাণান্ত দাঙ্গার মধ্যে পাড়ার মুসলমানগণ মহরমের জন্য ভরসা করিয়া শরৎ মহারাজের নিকট চাঁদা চাহিতে আসিয়াছিল। তিনিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মুসলমানদের চাঁদা দিয়াছিলেন।

মুসলমানগণও মানুষ, তাহারা অকৃত্রিম সহানুভূতি, নিষ্কাম কর্ম্ম তাহাদের জন্য কে করে, তাহা যে বুঝিতে পারে না, তাহা নহে। এবং সময় উপস্থিত হইলে তৎজন্য কৃতজ্ঞতা দেখাইতেও যে তাহারা জানে না এমতও নহে। আজ মনে পড়িতেছে সেই বিপদের দিনের কথা—যে দিন শরৎ মহারাজের দেহ অগ্নিতে অর্পণ করিবার জন্য বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। শ্রাবণ ভাদ্রমাস সমস্ত রাত্রি ইলিশ মাছের সন্ধানে পাড়ার মুসলমান নিকারীগণ নৌকায় অতিবাহিত করিয়াছে। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাহারা মাছ বিক্রয় করিয়া যখন গৃহে ফিরিয়াছে তখন শুনিল,—বড় মহারাজ দেহ রক্ষা করিয়াছেন। অভুক্ত অবস্থায় নিকারীর দল ছুটিয়া

উদ্বোধনে আসিল এবং যখন শুনিল মহারাজের দেহ বেলুড়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে তখন বেলুড় মঠে যাইবার জন্য ষ্টিমার ঘাটে রওনা হইল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একজন আমাদিগকে বলিল— আপনারাই যে শুধু বাপ হারাইয়াছেন তাহা নহে, আমরাও বাপ হারাইলাম। এমন দয়া, এমন উপকারী বান্ধব তিনি ছাড়া কেহ আমাদের ছিল না। আপদে বিপদে পড়িয়া যখন তাঁহার কাছে আসিয়াছি তিনি সে আপদ বিপদ কাটাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পয়গম্বরের আপনার লোক বলিয়াই জানিতাম।

অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সর্ব্বভূতে প্রেম, ভালবাসা ছিল বলিয়াই তাঁহার অভাবে পাড়ার মুসলমানগণও হায় হায় করিয়াছিল।

বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে নিত্য সম্মেলনের বৈঠক বসিতেছে, কলিকাতার অলিতে গলিতে নিত্য খুন, রক্তপাত চলিয়াছে। কলিকাতার দাঙ্গার জন্য মঠের সম্মেলনে আশানুরূপ লোক সমাগম হইল না সত্য কিন্তু যে জন্য এই মহাসম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল তাহা জয়যুক্ত হইতে কোন অসুবিধা হইল না। যথা সময়ে মহাসম্মেলন শেষ হইল। সন্ন্যাসী সঙ্ঘ সবিস্ময়ে শুনিলেন,—মঠ ও মিশনের কার্য্য পরিচালনের জন্য এক কার্য্যকরী সমিতির (Working Committee) উদ্ভব হইবে। কেন এবং কেমন করিয়া ইহার উদ্ভব তাহা বলিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না যদি ইহার মধ্যে স্বহস্তে স্বামী সারদানন্দ আত্মবলিদান না করিতেন।

মহারাজের মহাপ্রস্থানের পরে শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামিজী মঠ ও

মিশনের অধ্যক্ষপদে বরিত হন। এই সময় হইতে যে সকল তরুণ সন্ন্যাসিগণ প্রাচীনগণের নির্দ্দেশ মতে মঠ ও মিশনের কাজ করিতেন তাহারা ক্রমাগত শরৎ মহারাজকে এমন ভাবে নানা অভিযোগ করিতে লাগিলেন যাহার জন্য আমাদের মনে হয়, অবস্থার এবম্বিধ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—"আজকাল দেখছি কর্ত্তা না হলে অনেকে কাজ করতে চায় না। আমরা কিন্তু ঠাকুর স্বামিজীর কাছে এসব শিখি নাই, চিরকাল অনুগত হয়েই কাজ করতে হবে শিখেছি।"

কিন্তু কাল বলবান! যে সময়ে স্বামী সারদানন্দ শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন সে কাল অনেক দিন গত হইয়াছে। একালে তরুণ সন্ন্যাসিগণ যে 'ক্ষমতা না দিলে সহযোগ চলিবে না' বলিয়াছে তাহা সমস্ত জগতের,—ধনী মজুরের, শাসক শাসিতের মধ্যে যে ভোগ তারতম্যের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে মজুর ও শাসিতের War Cry (যুদ্ধের ধ্বনি) No Control—no Co-operation এর প্রতিধ্বনি মাত্র। এই no Control, no Co-operation বলিয়া যাহারা সাগর মেলার কাজ বন্ধ করিয়াছিল তাহারাই আজ কার্য্যকরী কমিটী গঠন করিয়া প্রাচীনদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

কর্ম্ম বড় অদ্ভুত জিনিষ! কর্ম্ম করিতে গেলে মানুষের 'অহং' বাড়িতে থাকে। সে 'অহং'কে দমন করিবার জন্য ধ্যান ধারণা, বিচার তপস্যা করিতে হয়। যেখানে ধ্যান ধারনা, বিচার তপস্যা থাকে সেখানে মানুষ কর্ম্মকে—আদেশ পালন হিসাবে করিতে পারে—অন্যথায় নহে।

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে যে মঠ তাহাতে জাগতিক ব্যাপারের ছাপ আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া শরৎ মহারাজ নিজে যাহা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছিলেন তাহা কার্য্যতঃ করিয়া তিনি অমর হইয়া গেলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"পাহাড় থেকে যখন একটা ঝরণা বেরোয় সেটা যদি কোন বাধা না পায় তা হলে তার জোরে নীচেকার গ্রামাদি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একটা বাধা পেলে স্রোতটা ভাগ হয়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে তার জোর ও কমে যায়। সেই রকম যদি কোথাও দেখ যে মনের গরমিল হবে, সেখানে প্রথমে তুমি নিজে মাথাটা দিয়ে তার জোরটা কমিয়ে দিবার চেষ্টা করিও" কেমন করিয়া তিনি অবিশ্বাসের ঝরণার বেগ প্রতিহত করিতে যাইয়া নিজে মাথা পাতিয়া দিয়াছিলেন সে কথা এখানে বলিতে হইবে।—

যথা সময়ে স্বামী সারদানন্দ ট্রাষ্টির সভাতে A Scheme for the Working Comittee (কার্য্যকরী সমিতির পাণ্ডুলিপি) দাখিল করিলেন। এবং ধারার পর ধারাগুলি পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সকল ধারাগুলি পাঠ করা যখন শেষ হইল তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন,—'শরৎ' ওরা তোমাকেও চায় না, আমাকেও চায় না—এস এই বেলা আমরা দুজনাই সরে পড়ি।' মহাপুরুষের এই কথার উত্তরে শরৎ মহারাজ কিছুই বলিলেন না। তিনি পাণ্ডুলিপিখানা পাস করিবার পক্ষে সকলকে বিশেষ

* মূল পাণ্ডুলিপিখানা ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছিল। সাধারণের জন্য উহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে বিনা পরিবর্ত্তনে পাণ্ডুলিপি পাস হইয়া গেল। যথা :—

ওয়ার্কিং বা কার্য্যকরী কমিটির জন্য স্কীম বা পদ্ধতি

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বেলুড় মঠের ট্রাষ্টীগণ নিম্নলিখিত বারজন সভ্য লইয়া একটি ওয়ার্কিং বা কার্য্যকরী কমিটি গঠন অনুমোদন করিলেন। কমিটির সাতজন সভ্য দ্বারা কোরাম (quorum) হইবে। অর্থাৎ কমিটির কার্য্য সম্পাদনার্থ ন্যূনকল্পে সাতজন সভ্যের উপস্থিতি আবশ্যক।

ঐ কার্য্যকরী কমিটি মাসে অন্ততঃ দুইবার অধিবেশন করিবেন ও প্রত্যেক অধিবেশনকালে নিজেরা সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন এবং ঐ কমিটির একজন স্থায়ী সেক্রেটারী থাকিবে।

প্রত্যেক সভ্য একটি ভোট দিবেন, দ্বিমতকালে উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে—ঐ সভাপতির কাষ্টিং (Casting) বা অতিরিক্ত একটি ভোট দিবার অধিকার রহিবে।

ট্রাষ্টীসভার অন্ততঃ পক্ষে ৬জন সভ্য একমত হইলে ওয়ার্কিং কমিটি বাতিল, রদ, বদল করিতে পারিবেন।

ঐ ওয়ার্কিং কমিটির সেক্রেটারী সমেত অন্ততঃ সাতজন সভ্য মঠে বাস করিতে বাধ্য রহিবেন। প্রত্যেক সভ্যের কার্য্য-কাল হইবে দুই বৎসর। এই কাল মধ্যে কোনও সভ্য আটটির অধিক অধিবেশনে অনুপস্থিত রহিতে পারিবেন না।

পদত্যাগ বা অন্য কারণে ওয়ার্কিং কমিটিতে পদখালি হইলে

ঐ ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন অনুসারে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী ঐ শূন্যপদ পূর্ণ করিবেন।

সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত দফাগুলিতে উল্লিখিত কার্য্যসমূহ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ট্রাষ্টীদের কমিটি ঐ ওয়ার্কিং কমিটিকে দিলেন। তবে উক্ত নিষ্পত্তি অনুকূলে অন্ততঃ সাতজনের ভোট থাকা আবশ্যক ঃ—

১। ট্রাষ্টীদের কমিটি মঠ ও মিশনের যে সাধারণ নীতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদনুসারে মঠ ও মিশনের কার্য্যকারিতা নির্ণয়ন।

২। পরস্পরের স্বার্থ সম্বন্ধ হেতু বিভিন্ন কেন্দ্রের অর্থনীতি পরিচালন।

৩। স্বামিজীর মঠের নিয়মাবলী অনুসারে প্রধান কেন্দ্রে এবং শাখা কেন্দ্রসমূহে কর্ম্মিগণকে শিক্ষাদান।

৪। সম্প্রদায়ে সভ্য গ্রহণ এবং শাখা কেন্দ্রে অধ্যক্ষ ও কর্ম্মী প্রেরণ।

৫। প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ ও মিশনের কার্য্য পরিচালন।

৬। অন্যান্য কেন্দ্রে মঠ এবং মিশনের কার্য্য পরিদর্শন ও পরিচালন।

ট্রাষ্টীদের কমিটি (ক) মঠ এবং মিশনের সাধারণ নীতি নির্ণয় করিবেন এবং (খ) ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া নিম্নলিখিত দফার কার্য্য সকল চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিবেন ঃ—

১। শাখা কেন্দ্র সমূহ মঠ এবং মিশনের অন্তর্ভুক্ত এবং বহিস্কার করা।

২। স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, বন্ধক এবং দান সংক্রান্ত আইনের ব্যাপার। এবং (গ) বৎসরে অন্ততঃ একবার এই (ওয়ার্কিং বা কার্য্যকরী) কমিটির কার্য্যাদি সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিবেন এবং আবশ্যক উপদেশাদি দিবেন।

কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন জন্য ট্রাষ্ট সভার পক্ষ হইতে ওয়ার্কিং কমিটিতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট অথবা সেক্রেটারী উপস্থিত রহিবেন।

পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইবার পরে কার্য্যকরী কমিটির সভ্যগণ মনোণীত হইলেন। তখন দেখা গেল, যে শুদ্ধানন্দ স্বামীর কল্পনায় এই মহাসম্মেলনকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীনদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার প্রচেষ্টা তাহা সফল হইলেও তিনি নিজেও এই কমিটিতে বাদ পড়িয়া গেলেন। যথা ঃ—

কার্য্যকরী কমিটির সভ্যগণের নাম ঃ—

১। স্বামী বিরজানন্দ
কমিটির সম্পাদক
২। ” ধীরানন্দ
৩। ” অমৃতেশ্বরানন্দ
৪। ” জ্ঞানেশ্বরানন্দ
৫। ” কালিকানন্দ
৬। ” আত্মবোধানন্দ
৭। স্বামী প্রবোধানন্দ
৮। ” আত্মপ্রকাশানন্দ
৯। ” ওঁকারানন্দ
১০। ” নির্ব্বেদানন্দ
১১। ” নির্ব্বাণানন্দ
১২। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

বেলুড় মঠের ট্রাষ্টীগণের নাম ঃ—

১। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ প্রেসিডেন্ট	৭। স্বামী বিরজানন্দ
২। " " অখণ্ডানন্দ ভাইস প্রেসিডেন্ট	৮। " ধীরানন্দ
	৯। " শঙ্করানন্দ
৩। " " সুবোধানন্দ	১০। " অচলানন্দ
৪। " " অভেদানন্দ	১১। " শর্ব্বানন্দ
৫। " " সারদানন্দ সেক্রেটারী	১২। " মহিমানন্দ
	১৩। " বিশুদ্ধানন্দ
৬। স্বামী শুদ্ধানন্দ জয়েন্ট সেক্রেটারী	১৪। " অমৃতেশ্বরা
	১৫। " মাধবানন্দ

এই কার্য্যকরী কমিটি যে স্বামিজীর দেবোত্তর দলিলের পরিপন্থী সে কথা শরৎ মহারাজ নিশ্চিত জানিতেন না। জানিলে তিনি কদাচ জ্ঞাতসারে এমন পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইতেন না। প্রাচীনগণের মধ্যে কেহই ঐ কথা জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। তখন আমরাও কেহ জানিতাম না। শরৎ মহারাজের দেহ রক্ষার পরে যখন অনেক কথা জানিতে হইল তখন দেবোত্তর দলিল খানা পড়িয়া এবং আইনজ্ঞগণের অভিমত শুনিয়া বুঝিলাম,—মঠের ট্রাষ্টীগণ নিজেদের ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া এই কার্য্যকরী কমিটি স্থাপন করিয়া শুধু যে স্বামিজীর আদেশ অমান্য করিয়াছেন তাহা নহে, ক্ষমতাহীন ট্রাষ্টীগণের অক্ষমতার ছল ধরিয়া যে কেহ প্রতিবাদ তুলিলে বিপত্তি ঘটিবার

আশঙ্কা যথেষ্টই রহিয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা দেবোত্তর দলিলের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ—

দেবোত্তর দলিলের মধ্যে তিনটি বিষয় সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—

১। উক্ত ট্রাষ্টীগণ উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি পরিদর্শন (ম্যানেজ) করিতে এবং দেবোত্তর ট্রাষ্ট অনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান করিতে বাধ্য রহিলেন।

ইংরাজী দলিলে "ম্যানেজ" (manage) শব্দের পূর্ব্বে shall শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত shall শব্দ ব্যবহার দ্বারায় ট্রাষ্টীগণ বাধ্য রহিলেন এই ভাব ব্যক্ত ও তদ্রূপ অনুবাদিত হইয়াছে। উক্ত দলিলে ট্রাষ্টীগণ এইরূপ বাধ্য থাকায় তাঁহারা ট্রাষ্টীর ক্ষমতাদি অন্য কাহাকেও অর্পণ করিতে পারেন না পরন্তু তাঁহারা নিজেরা কার্য্য করিতে বাধ্য।

২। যে কোনও ট্রাষ্টী দেউলিয়া হইলে বা স্থায়ীভাবে বৃটিশ ভারতের বাহিরে বসবাস করিতে যাইলে বা অধিকাংশ ট্রাষ্টীর মতানুসারে তিনি নৈতিক কারণে বা ধর্ম্মমতের নিমিত্ত ট্রাষ্টীরূপে কার্য্য করিতে অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে ট্রাষ্টীভাবে কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন এবং এতদ্ব্যতীত যে কোনও ট্রাষ্টী পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

এই স্থলে জানিতে পারা যাইতেছে যে,—কখন ট্রাষ্টী আর ট্রাষ্টী থাকিতে পারিবেন না এবং মঠের ট্রাষ্টী যে কোনও কারণে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৩। যে কোনও ট্রাষ্টীর মৃত্যু, পদত্যাগ, দেউলিয়া, অক্ষমতা বা উপরি উক্ত কারণে (অর্থাৎ স্থায়ীভাবে বৃটিশ ভারতের বাহিরে

বসবাসহেতু) ট্রাষ্টীর পদখালি হইলে এবং কখনও এরূপ ঘটিলে এবং কখনও এরূপ পদখালি না রহিলেও তৎকালীন ট্রাষ্টীগণ যখন ট্রাষ্টীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন তখন জীবিত বা কার্য্যরত বা বর্ত্তমান ট্রাষ্টীগণ—ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বা চেলাগণের মধ্য হইতে এক বা একাধিক যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাষ্টী বা ট্রাষ্টীগণের শূন্যপদে নিয়োগ দ্বারা অথবা তৎকালীন ট্রাষ্টীগণের সংখ্যা সেওয়ায় ট্রাষ্টীরূপে নিয়োগ দ্বারা ট্রাষ্টীর পদ পূর্ণ বা বৃদ্ধি করিবেন এবং জীবিত বা কার্য্যরত বা বর্ত্তমান ট্রাষ্টীগণ যদি একমত না হন তবেই তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের মতানুসারে এইরূপ নিয়োগ হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য কে ট্রাষ্টী হইতে পারিবেন এ প্রশ্নের সমাধানও মূল দলিলে দৃষ্ট হইবে। তাহাতে লেখা আছে—সন্ন্যাসী ট্রাষ্টী হইতে পারিবেন —ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টী হইতে পারিবেন না।

এত বড় একটা পরিবর্ত্তন—যাহার ফলে প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী প্রভৃতি ট্রাষ্টীগণ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও ক্ষমতাহীন হইয়া রহিলেন এই সামান্য কথা স্বামী সারদানন্দ বুঝিতে পারেন নাই মনে করিলে তাঁহার প্রখর বুদ্ধিমত্তাকে অস্বীকার করা হইবে। যিনি 'এক আঁচড়ে' অপরের মনের কথা জানিতে পারিতেন তিনি প্রাচীনগণের প্রতি তরুণগণের বিশ্বাসের অভাব, মনের গরমিল দেখিয়া স্বেচ্ছায় যে নিজে 'মাথা পাতিয়া' দিয়াছিলেন তাহা তখন কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই। অথবা এক সময় যিনি সর্ব্বময় অধ্যক্ষের পদ হাতে পাইয়াও স্বামিজীর দেওয়া সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিতে পারেন নাই তিনি কোন্ দুঃখে

সেই পদের দায়ীত্ব পর্য্যন্ত তরুণ দলের উপর অর্পণ করিলেন তাহাও তখন কেহ বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। হট্টগোলের মধ্য দিয়া মহাসম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল, হট্টগোলের মধ্য দিয়া ইহার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল। কেহই দেখিলেন না, কেহ বুঝিতে চেষ্টাও করিলেন না—জ্ঞাতসারে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং অপস্থত হইয়া কেমন শান্ত ভাবে শেষ দিনের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

জানি না পাঠকগণের নিকট আমাদের এই সকল কথা হেঁয়ালির মত বোধ হইবে কিম্বা তাঁহারা কোন উপকথা শুনিতেছেন মনে করিবেন কিন্তু ঠাকুর যে বলিয়াছিলেন,—'অনেক সাধুই কামিনী কাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু নাম যশের (প্রতিষ্ঠা) মায়া খুব কম সাধুই ত্যাগ করিতে পারেন, সেই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলেই দেখিবেন,—কামিনী কাঞ্চনের মায়ার সহিত সাধুর শেষ কামনা নাম যশের মায়াও স্বামী সারদানন্দ হেলায় ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই ভাবে প্রাচীনগণ পদে থাকিয়াও সকল ক্ষমতা শূন্য হইয়া রহিলেন এবং তরুণগণ পদহীন হইয়াও সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। No control, no co-operation মন্ত্র এই ভাবে সার্থক হইল।

মঠ হইতে উদ্বোধনে ফিরিয়া শরৎ মহারাজ আমাকে বলিলেন, —'যা হল তাতে কাজ কেমন চলবে বলতে পার?' উত্তরে নিবেদন করিলাম,—'কেমন হবে ঠিক বলা বড়ই কঠিন তবে আমি যা বলে-ছিলাম তা হয়নি মহারাজ। এ একদল নায়েব গোমস্তার সৃষ্টি হল মাত্র যার ফলে অসন্তোষ সকল কাজে শীঘ্রই প্রকাশ পাবে।'

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'মঠে জ্ঞানও (ব্রহ্মচারী জ্ঞান বা জ্ঞান মহারাজ) এ রকম কথা বলেছিল বটে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলেম না কেন সে ও রকম বললে!'

আমি বলিলাম,—'তিনি কি বলেছেন তা ত জানি না। তবে আমার যা ধারণা তা হয়ত ঠিক নাও হতে পারে—দেখা যাক ওঁরা কি ভাবে কাজ চালান।'

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'শুধু দেখা নয়, সকলেরই কর্ত্তব্য যাতে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ভালবাসা বাড়তে পারে তার অনুকূল কাজে সহায়তা করা।'

আমি বলিলাম,—মহারাজ! বিশ্বাস ভালবাসা বলতে আমার মনে হয় ঠাকুরের কথা,—চুম্বুক লোহাকে, আকর্ষণ করে কিন্তু লোহারও ইচ্ছা থাকা চাই সে চুম্বুকের কাছে যায়। আমরা ত কাজ করতে প্রস্তুতই আছি কিন্তু কেউ যে হুকুম করতে চান না, দুঃখ ত এই খানে।

শরৎ মহারাজ—'বেশত। কাজ করতে প্রস্তুত থাকলে হুকুম আসবে বলে আমার ধারণা।

আমি—'তা হলে কোন গোল হবে বলে আমারও মনে হয় না।'

সে দিন এই প্রসঙ্গে আর কোন কথা হয় নাই। অন্য প্রসঙ্গে যা কথা হইয়াছিল তাহা তেমন উল্লেখ যোগ্য নহে।

মঠে ওয়ার্কিং কমিটি স্থাপনের ৩।৪ মাস পরে এক দিন সন্ধ্যার পর স্বামী বরদানন্দ (ভবানী) আসিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। শরৎ মহারাজ মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেখানে স্বামী পূর্ণানন্দ, ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ, হৃষীবাবু উপস্থিত ছিলেন। শরৎ মহারাজ স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—ভবানি! তুমি না কি আমায় দোষী করেছ? বরদানন্দ বলিলেন,—হ্যাঁ মহারাজ! না জেনে করেছিলাম। তারপরে যখন জানতে পেরেছি তখন হতে আমার বলবার আর কিছুই নেই। শরৎ মহারাজ বলিলেন,—যদি কাউকে দোষী করতে হয় সে তোমার ভাইদের—গুরু ভাইদের কর।' ইহার পরে ৺কামাখ্যা মায়ের কথা আরম্ভ হইল। পরদিন স্বামী বরদানন্দ, অমৃতানন্দ ও মুক্তেশ্বরানন্দের ৺কামাখ্যা দর্শনে যাইবার কথা স্থির ছিল।

ইদানীং ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিষ্ঠার জন্য শরৎ মহারাজকে ধমক, মাঝে মাঝে যুক্তি, বা মিনতির সুরে শিষ্য স্থানীয় সাধুদের সহিত আলোচনা করিতে দেখা যাইত। কিন্তু সকলের মনেই ঐ এক প্রশ্ন জাগিয়াছিল,—রাজা (প্রাচীনগণ) থাকিতে কোতোয়াল (মঠ-জীবনে নাবালকের দল) কেন হুকুম করিবে?

গত পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ শরৎ মহারাজের জন্মতিথি পূজা উদ্বোধনে হইয়া আসিতেছিল। এই বৎসর মঠে নূতন কার্য্যকরী কমিটি হইয়াছে সুতরাং যাহাতে উদ্বোধনে না হইয়া শরৎ মহারাজের জন্মতিথি পূজা মঠে হইতে পারে তাহার জন্য কার্য্যকরী কমিটি আসিয়া শরৎ মহারাজকে ধরিয়া বসিল। ভক্তগণের দুঃখ ও অসুবিধা বিলক্ষণ হইবে জানিয়াও শরৎ মহারাজকে মত দিতে হইল। এই তিথিপূজাই তাঁহার শেষ তিথিপূজা যাহাতে তিনি সশরীরে যোগদান করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে বেলুড় মঠে শরৎ মহারাজের জন্মতিথিপূজা আরম্ভ হইল। বেলা প্রায় দশটার সময় তিনি মোটর গাড়ীতে মঠে চলিয়া গেলেন এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন।

বিংশতি বর্ষ

অতি প্রত্যুষে হিন্দুস্থানী ভিখারী বালকের গানে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বালকের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সারঙ্গের সহিত মিশিয়া 'আনন্দ ভৈ—আজু অযোধ্যাজীমে' গানটি বড়ই মধুর লাগিতে ছিল। বালকটি মধ্যে মধ্যে সকাল বেলা আসিয়া গান করিয়া থাকে।

আজ ১লা জানুয়ারী। 'আনন্দ ভৈ—আজু অযোধ্যাজীমে' গান শুনিয়া মনে হইল 'সুবৎসর' হইবে। হাতমুখ ধৌত করিয়া ঠাকুর ঘরে গেলাম।

তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া শরৎ মহারাজের ঘরে আসিয়া দেখিলাম তিনি ঘরে নাই। বুঝিলাম ছাদে পায়চারী করিতেছেন। ইদানীং পায়ের ব্যথা বৃদ্ধি না পাইলে তিনি সকালে ছাদে আসিয়া বেড়াইতেন। উদ্বোধনের বাহিরে পদব্রজে কোথায়ও যাইতেন না।

ছাদে আসিয়া দেখিলাম শরৎ মহারাজ গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছেন। নিকটে আসিতেই শুনিতে পাইলাম,—'বিহরে রঘুবংশ বীর।' বুঝিতে বিলম্ব হইল না মহাত্মা তুলসী দাস কৃত "সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই" গানটির শেষ কলি তিনি গাহিতেছেন। বোধহয় ভিখারী বালকের গান শুনিয়াই তাঁহার আজ হিন্দি গানে প্রবৃত্তি জাগিয়া থাকিবে। আমি অগ্রসর

হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। এই সময় তিনি চুপ করিয়াছিলেন। প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছি তখন শুনিলাম গানের অসম্পূর্ণ অংশ তিনি গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছেন,—

"বিহরে রঘুবংশ বীর সখা সহ সরযূ তীর।
তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণ যুগ পাই॥"

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ স্বামী নির্লেপানন্দ (কার্ত্তিক) গান শিখিতেছিল। তাহাকে গান শিখিতে শরৎ মহারাজই উৎসাহ দিয়াছিলেন। কার্ত্তিক সন্ধ্যার পরে নিয়ম করিয়া নিত্য গান গাহিত। শরৎ মহারাজের সজাগ শ্রবণে বেতাল বা বেসুর যাহা বাজিত তাহা তিনি রাত্রের আহারের পরে শুদ্ধ করিয়া দিতেন। কার্ত্তিককে শিখাইতে তাঁহাকেও গাহিতে হইত,— "আদিনাথ! প্রণবরূপ, সম্পূর্ণ! দাও হে, তব প্রসাদ শান্তি সিন্ধু মহেশ—সকল গুণ নিদান—।"

শরৎ মহারাজের এই সকল গানের সহিত মঠ বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। শিবরাত্রিতে স্বামিজী ও ঠাকুরের তিথি পূজায় শরৎ মহারাজকে তানপুরা সহযোগে সমস্ত রাত্রি এই সকল গান গাহিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতে অনেকেই শুনিয়াছেন। সেই একদিন—আর আজ একদিন! তবুও যখনই তিনি গান গাহিতেন গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বাহিরে দাঁড়াইয়া সেই গান শুনিতাম। তাঁহার গানে এমনই এক আকর্ষণী শক্তি ছিল।

পুরীধাম হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে দুই বৎসর তিনি

উদ্বোধনেই ছিলেন। বাহিরে কোথাও যান নাই। বেলুড় মঠে মধ্যে মধ্যে যাইতেন, কনভেনসনের সময় ১৫।২০ দিন মঠে ছিলেন মাত্র।

এই সময় তাঁহার নিত্য কাজ ছিল,—সকালে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া ছাদে বেড়ান। ছাদ হইতে নামিয়া তৈল মাখিয়া স্নান। স্নানের পরে—আসনে যাইয়া ধ্যান, জপ। এই আসনে বসিয়াই সকালের চা পান করিতেন তারপর একেবারে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জপ ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। আহার করিতে প্রায় একটা দেড়টা বাজিয়া যাইত, আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামান্তে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বসিতেন এবং স্বামী অশেষানন্দ তাঁহার নির্দ্দেশ মত তিনি যে সকল চিঠি পাইতেন তাহার উত্তর লিখিতেন। বৈকালে চা পান করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতি স্তোত্র পাঠ হইয়া গেলে নীচের বসিবার ঘরে আসিয়া বসিতেন। রাত্রি প্রায় দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত নানারকম কথাবার্ত্তার পরে বৈঠক ভাঙ্গিলে তিনি উপরের ঘরে আসিয়া আহারে বসিতেন।

তারপর রাত ১১টা সাড়ে এগারটার সময় শয়ন করিতেন। এই সময় কোন কোন দিন কার্ত্তিককে গান গাহিয়া কেমন করিয়া গাহিতে হইবে শিক্ষা দিতেন। সকালের দিকে কেহ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হইত,—সন্ধ্যার পরে আসিলে দেখা হইবে। এই উত্তরে অনেকে অনেক কিছু মনে করিয়াছেন জানি—কিন্তু যাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসা তিনি যে দিন দিন আপনার মধ্যে আপনি ডুবিয়া

যাইতেছেন—তাঁহার যে বাহিরের কোলাহল অপেক্ষা অন্তরের বাণী শুনিবার আগ্রহ বেশী জাগিয়াছে তাহা দর্শন প্রার্থীদের বোঝান শক্ত হইত। যিনি লীলাপ্রসঙ্গ রচনার সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতে কলম লইয়া বসিয়া লিখিতেন প্রাপ্ত বয়সে যিনি সেই হাতেই জপের মালা লইয়া সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতেন তিনি এই সময়েও এমন নিখুঁত হিসাব রাখিতে ও সাধারণের অর্থে কৃপণের ন্যায় দরদ দেখাইতে পারিতেন যাহা দেখিয়া মনে হইত সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে স্বামী সারদানন্দই সক্ষম ছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মতেই সাধারণের অর্থে যে সকল লোকহিতকর (Relief ইত্যাদি) কার্য্য হইত, তাহার হিসাব নিকাশ যথা সম্ভব সত্বর, নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করিতে মঠ অভ্যস্থ ছিল। কার্য্যান্তে হিসাব নিকাশ পাইতে সাধারণকে কোন দিনই উদ্‌গ্রীব থাকিতে হয় নাই। ইদানীং তাঁহার হিসাব পত্র এত পরিষ্কার করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল যাহা দেখিলেই মনে হইবে তিনি যেন প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

শরৎ মহারাজের গম্ভীর ভাব ও দেহের বিপুলতা ভিন্ন আড়ম্বরের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। তাঁহাকে লইয়া কেহ হৈ চৈ করে ইহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। অসুখে পড়িয়া বাক্‌শক্তি বন্ধ না হইলে ২।৩ জন ছাড়া বেশী লোক তিনি ঘরে ঢুকিতে দিতেন কিনা সন্দেহ। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে জানিতে পারিলে তখনই তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া ছাড়িতেন।

বিগত ৭।৮ বৎসর যাবৎ তাঁহার শরীর ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার নিকট ছিলেন—তাঁহাদের বলা ছিল,—প্রস্রাব রক্তই হউক আর জলই হউক—বাহিরের কাহাকেও সে সংবাদ জানাইবে না। অসুখের সংবাদ পাইলে লোক ব্যস্ত হইয়া উঠিবে—'কেমন আছেন' প্রশ্ন করিবে—তাঁহার মত একজন "সামান্য" লোকের জন্য লোকের উদ্বেগ জাগিবে—ইহা তিনি কোন দিন পছন্দ করিতেন না।

এই সময় দীক্ষার ব্যাপারে তাঁহাকে অধিক বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে হইত। এতদিন রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসি-সঙ্ঘে থাকিয়া একটা সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে,—যখনই প্রাচীনগণের মধ্যে কাহারও মহাপ্রস্থানের সময় হইয়া আসে তখনই তিনি অতি মাত্রায় আধ্যাত্মিক ভাবে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবের ভাগী হইবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোকও ছুটিয়া আসিতে থাকে। এই জানা জানির ভাব কিন্তু বেশী দিন থাকে না। আমরা দেখিয়াছি,—যখনই যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া লোক ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছেন তখনই তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন।

এইভাবে 'আসর' না জমিতেই মূল অধিকারী শ্রীশ্রীঠাকুর চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীমহারাজ প্রভৃতিও 'আসর' জমিতে না জমিতেই মহাপ্রস্থান করিলেন।

এইবার শরৎ মহারাজকে আশ্রয় করিয়া 'আসর' জমিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার পূণ্য স্মৃতি যাঁহার মনে যত বেশী জাগ্রত থাকিবে তিনি তত বেশী শান্তিতে থাকিতে পারিবেন—

কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে তত বেশী অচল অটল থাকিয়া কর্ম্ম সমাধা করিতে পারিবেন। নিতান্ত কর্ম্মশ্রান্ত হইয়া তাঁহার মুখ হইতে কখন বাহির হইবে না,—কর্ম্ম অশুভ!

শ্রীশ্রীমহারাজের দেহরক্ষার পরে শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামিজী অধ্যক্ষ হন। এই সময় হইতে শেষদিন পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,—ইংরাজ জাতির ন্যায় শরৎ মহারাজ অন্তরের সহিত 'পদের' সম্মান অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছেন। মহাপুরুষের ইচ্ছার নিকট নিজের ইচ্ছা বলি দিয়াছেন। মাত্র পূজ্যপাদ তুলসী মহারাজের ব্যাঙ্গালোর হইতে চলিয়া আসিবার ব্যাপারে মহাপুরুষকে শরৎ মহারাজ যুক্তিতর্ক দিয়া একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। মহাপুরুষ সেই যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া যেমন নিজ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন তেমনই ঐ ব্যাপারের মীমাংসা হইয়া গেল। শরৎ মহারাজ সেই কথা আর কখন উত্থাপন করেন নাই। আমরা দেখিয়াছি,—শরৎ মহারাজ মহাপুরুষকে যেমন মান্য করিয়াছেন, যে ভাবে কাজ-কর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে পুরদেশে রক্ষা করিয়া তিনি পশ্চাতে অনুবর্ত্তন করিতেন, তাহা অনেক ঘরে পিতা পুত্রে দেখা যায় না, বড় ভাইয়ে ছোট ভাইয়ে ত অনেক দূরের কথা। আর আমাদের মধ্যে এই ভাবের অভাব যেন প্রকাশ পাইবার উপক্রম করিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যগণ ঠাকুর ও মাকে আশ্রয় করিয়া যে ঠাকুরের সংসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—সেই সংসারে আজ মহাপুরুষ অধ্যক্ষ, সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং শরৎ মহারাজের

মহাপ্রস্থানে তিনি যে কি আঘাত পাইয়াছেন তাহা কল্পনায় বুঝিবার মত সামর্থ যাঁহার আছে তিনিই দেখিতেছেন,—বৃদ্ধের চলিবার শেষ সম্বল হাতের লাঠি গাছটি ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার যে দশা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর রূপে এই বিশ্বের খেলাতে আসিয়া শরৎ মহারাজকে হারাইয়া মহাপুরুষের যেন তেমনই অবস্থা হইয়াছে।

বৈশাখ মাসে উদ্বোধনে গোবিন্দের (স্বামী তত্ত্বানন্দ) বসন্ত হইয়াছিল। এবং রোগ ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল। উদ্বোধন আফিসে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাও রহিয়াছে। সুতরাং পুস্তক ক্রেতা ও ভক্তের সমাগম বন্ধ করিবার উপায় ছিল না। গোবিন্দ কিন্তু অসুখ হইতেই হাঁসপাতালে যাইতে চাহিয়াছিল একথা শরৎ মহারাজও শুনিয়াছিলেন। নানাদিক লক্ষ্য করিয়া শরৎ মহারাজ অপেক্ষাকৃত জনৈক প্রাচীন সাধুকে বলিলেন,—"কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে হাঁসপাতালে যাইতে তাহার বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা আছে কিনা।"

যাঁহার উপরে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিবার ভার দিয়াছিলেন তিনি অন্য একজনকে উহা জিজ্ঞাসা করিতে বলেন। তিনি আবার গোবিন্দের যে সেবা করিতেছিল তাহাকে বলিলেন গোবিন্দকে জানাইবে তাহাকে কাল হাঁসপাতালে যাইতে হইবে। গোবিন্দ প্রথম হইতেই হাঁসপাতালে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল সুতরাং হাঁসপাতালে যাইবার কথা শুনিয়া সে অম্লান বদনে সম্মতি দিল। গোবিন্দ কি কথার উপরে সম্মতি দিয়াছিল সে কথা তখন শরৎ মহারাজকে জানায় নাই। গোবিন্দ

হাঁসপাতালে দেহ রক্ষা করিল। তখন গোবিন্দকে হাঁসপাতালে পাঠান লইয়া কতিপয় বাহিরের লোক "সেবাধর্ম্ম" সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কিন্তু একদিনও গোবিন্দকে দেখিতে আসেন নাই কিম্বা কি করিলে হাঁসপাতালে না পাঠাইয়া তাহার সেবা চলিতে পারে তাহাও বলিয়া দেন নাই। কিন্তু তবুও অযাচিত মন্তব্যগুলি যথাসময়ে শরৎ মহারাজ শুনিলেন। একদিন জনৈক সাধুর কাছে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তোমরা যদি কথা মত কাজ না কর আমি অথর্ব্ব মানুষ কি করতে পারি বল?"

জগতে দলপতির জয় ততদিন অব্যাহত থাকে যতদিন অধীনস্থ সকল লোক ব্যক্তিগত বুদ্ধি খরচ না করিয়া অধ্যক্ষের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে তৎপর থাকে। যেখানে অধ্যক্ষের আদেশের সহিত অধীনস্থ লোকের ব্যক্তিগত বুদ্ধি যোগ হয় সেখানেই বিভ্রাটের উপর বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হইবে। গোবিন্দকে হাঁসপাতালে পাঠান দোষের হইয়াছিল কিম্বা গুণের হইয়াছিল সে বিচার করিতে কেহ এসময় পুঁথি খুলিয়া বসিবে না। আমরা শুধু দেখাইতে চাই অধ্যক্ষের আজ্ঞা অব্যাহত না থাকিলে যে বিভ্রাট উপস্থিত হয় তাহার জন্য অধ্যক্ষকেই মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীমহারাজ ও শরৎ মহারাজকে স্বামিজী কথায় কথায় বলিতেন "তোদের ঐ এক ছটাক বুদ্ধি রেখে দে, সুদে আসলে বাড়ুক, পরে কাজে লাগাবি। এখন যা বলি করে যা।" মহারাজ, শরৎ মহারাজ স্বামিজীর আদেশ মত ঠিক ঠিক কথা

বলা, কাজ করা গৌরবেরই জানিতেন। অতএব যাহারা অধীনস্থ তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত,—আজ্ঞাবহতাই সৈনিকের ধর্ম্ম "Soldiers do not choose, they obey"।

মে মাসের একদিন সন্ধ্যার পরে শরৎ মহারাজ নীচের ঘরে বসিয়া আছেন। ঘরে শ্রীমান্ বিমলেন্দু বসু, গৌরাঙ্গ, স্বামী পূর্ণানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শরৎ মহারাজও উত্তর দিতেছেন এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া শরৎ মহারাজকে বলিলেন,—'মহারাজ! আমি রেলে চাকুরী করি, অতি কষ্টে মাত্র চার দিনের ছুটি পেয়েছি, আমাকে কিন্তু কৃপা করতে হবে।'

গম্ভীর ভাবে শরৎ মহারাজ কথা শুনিতেছিলেন, গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন,—আপনি কি চান? ভদ্রলোকটি বলিলেন,—'আপনার নিকট দীক্ষিত হতে চাই।' কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'আপনি দেখছি ঘোড়ায় জিন কসিয়ে এসেছেন!' ভদ্রলোকটি বলিলেন,—'তাহলে আপনি আমায় পায়ে ঠেললেন বলুন? তাহলে আমার কোন আশা নেই।' ভদ্রলোকটির কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজের মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, গম্ভীর প্রকৃতি পুরুষ অধিকতর গম্ভীর হইয়া পড়িলেন তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন,—'দেখুন! মানুষকে পায়ে ঠেলি এত অহঙ্কার আমার নেই।' কত বেদনার মধ্যে তিনি যে এই কথা বলিয়াছিলেন তাহা ভদ্রলোকটিও বুঝিতে পারিয়া চুপ করিলেন। তখন শরৎ মহারাজ বলিলেন,—বেলুড় মঠ,

দক্ষিণেশ্বর এসকল স্থান আপনার দেখা আছে কি ? ভদ্রলোকটি বলিলেন,—'তা না হয় পরে দেখা যাবে।' শরৎ মহারাজ বলিলেন,—'আপনার যদি বিলম্ব করবার ক্ষমতা না থাকে, বেশ ত আমি মহাপুরুষের নিকট আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' ভদ্রলোকটি বলিলেন,—'মহারাজ ! আমি আপনার নিকটেই এসেছি।' শরৎ মহারাজ নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—'দেখুন তবে ঠাকুরের ইচ্ছা হয় ত হবে।' ভদ্রলোকটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন।

পরের দিন যখন সন্ধ্যার পর সেই ভদ্রলোকটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন শরৎ মহারাজ অযাচিত ভাবেই বলিলেন,—'কাল যা হয় বলে দিব আপনি সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে আসবেন।' ভদ্রলোকটি—'তবে ঠাকুর আমাকে দয়া করেছেন' বলিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অধিকাংশ লোকেই শরৎ মহারাজকে গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া জানিতেন' কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যদি কেহ দেখিয়া থাকেন বালকের সঙ্গে তিনি বালক বনিতে পারিতেন,—হাসিতে হাসিতে তিনিও অবশ হইয়া পড়িতেন যাহা দেখিয়া একদিন পূর্ণানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন,—'মহারাজ ! আপনি দুর্গাবাবুর ছেলে নিতায়ের সঙ্গে এত হাসাহাসি করলেন কিন্তু মানুষ দেখলেই এমন গম্ভীর হয়ে থাকেন কেন ?' কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—'দেখছ না এত গম্ভীর হয়ে থাকি তাতেই রক্ষা নেই, হেসে কথা বল্‌লে আর কি রক্ষা আছে। তাহলে অমনি বলবে—দীক্ষা দাও'। মহারাজের কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া ঘর শুদ্ধ সকলেই আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

সম্প্রতি ছক্কুর (স্বামী যাদবানন্দ) 'বেয়াড়া' ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ক্রমাগত কাসি, দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। একান্ত অস্থির হইয়া শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া আনিতে বলিল। শরৎ মহারাজ ঐ স্থূল দেহ লইয়া একটি হাঁটু বিছানার উপর রাখিয়া ছক্কুর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন— "ঠাকুর রয়েছেন, মা আছেন ভয় কিরে"। তাহা দেখিবার বিষয়। ছক্কুর অবস্থা খুব খারাপই হইয়াছিল। কিন্তু ঐ স্পর্শে ও "ঠাকুর রয়েছেন, মা আছেন" এই কথা শুনিয়া ছক্কু কিন্তু শান্ত হইয়া গেল। ছক্কুর স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল তাহার অসুখ নাই বলিলেও চলিত। এ হেন লোকের 'বেয়াড়া'—ম্যালেরিয়া জ্বরও কাসিতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম সুতরাং সময়ে সময়ে সে এত অধৈর্য্য হইয়া উঠিত তা দেখিয়া অনেকে তাহার সেবা করিতে ভরসা করিতেছে না শুনিয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন "যা তোদের সেবা করতে হবে না—আমি অথর্ব্ব মানুষ যা পারি করবো।" পরে সেবকগণ তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিল। ছক্কুও কয়েক দিনের ভিতর ভাল হইয়া উঠিল।

একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে অন্নদা ঠাকুর (তাঁহাকে এই নামে ভক্তগণ অভিহিত করিয়া থাকেন) উদ্বোধন আফিসে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সে দিন তাঁহার সঙ্গে দুইটি ভক্তও ছিলেন। যাঁহারা অন্নদা ঠাকুরকে লইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা সেদিন দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মূর্ত্তি একে অপরের সম্মুখীন দেখিয়া কি মনে করিয়াছিলেন জানি না। আমরা কিন্তু দেখিয়াছিলাম,—স্বামী সারদানন্দ সবল সুস্থ, স্নায়ু

বিশিষ্ট এক পুরুষ সিংহ আর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মূর্ত্ত প্রতিমূর্ত্তি বেতস পত্রের ন্যায় কম্পন রত অন্নদা ঠাকুর তাঁহারই সম্মুখে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একজন বীর্য্যবান অপর ক্ষীন বীর্য্য। ভিতরে কাহার কি ছিল তাহা দেখিবার মত চোখ আমার ছিল না—সুতরাং যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছি তাহাই বলিতে হইবে।

যতক্ষণ শরৎ মহারাজ না আসিয়াছিলেন—ততক্ষণ অন্নদা ঠাকুর কম্পনরত দেহের সহিত কম্পিত কণ্ঠে কখন শ-র-ৎ-দা-দা কে দেখব—কখন মার কখন ঠাকুরের নাম তেমনি ভাবে করিতে-ছিলেন। যখন শরৎ মহারাজ আসিয়া দাঁড়াইলেন—তখন অন্নদা ঠাকুর কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া—বিরক্তির স্বরে মহারাজ বলিলেন—"বস" "বস"। অন্নদা ঠাকুর পশ্চাতে হঠিয়া বসিয়া পড়িলেন, শরৎ মহারাজও বসিলেন। তখন ও তাঁহার মুখে সামান্য বিরক্তির চিহ্ন রহিয়াছে। ইহার পরে অন্নদা ঠাকুরের সেই অপ্রস্তুত ভাব ও কম্পনরত দেহ দেখিতে দেখিতে মুখে বিরক্তির চিহ্ন লোপ হইয়া অনুকম্পার ভাব পরিষ্কার হইয়া উঠিল। তখন একজন ভক্ত ঠাকুরের প্রসাদ আনিয়া অন্নদা ঠাকুরকে দিলেন—শরৎ মহারাজ সেই প্রসাদ সস্নেহে তাঁহার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। অন্নদা ঠাকুর বার কয়েক তাঁহার ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,—"তোরা আমাকে যা বলিস তা এখানে বল না ?" কিন্তু সে কথা কেহ ভরসা করিয়া বলিলেন না। শরৎ মহারাজ 'স্থির হও স্থির হও,' বার দুই বলিয়া অন্নদা ঠাকুরের মাথায় বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া

দিতে লাগিলেন। অসাক্ষাতে যিনি বলিয়াছিলেন,—'শরৎ দাদাকে দেখব' সাক্ষাতে কিন্তু কোন কথাই হইল না। তাঁহার ভক্তগণও যা বলিতে আসিয়াছিলেন স্বামী সারদানন্দের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় তাহা ও বলিতে পারিলেন না।

শুনিয়াছি,—শরৎ মহারাজের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে অন্নদা ঠাকুরের * কম্পন ভাব দূর হইয়াছিল। তারপর অনেক দিন তিনি বেশ সুস্থও ছিলেন। এবং অপরের সাহায্য ভিন্ন বেশ চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে ও পারিতেন।

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ অন্যান্য দিনের ন্যায় ৬ই আগষ্ট শনিবার (১৯২৭) সকালে উঠিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া আসনে যাইয়া উপবেশন করিয়া জপ ধ্যানে রত হইলেন। অন্যান্য দিনের অপেক্ষা আজ একটু সকালে আসন ত্যাগ করিয়া ঠাকুর ঘরে আসিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোজনের ভোগ উঠিতেছিল—তিনি নিত্য যেমন প্রণামাদি করিতেন প্রথমে তাহা সমাধা করিলেন। ভোগ উঠিতেছে দেখিলে তিনি সত্বর বাহির হইয়া আসিতেন কিন্তু আজ যেন আর বাহির হইতে পারিতেছেন না—একবার দরজা পর্য্যন্ত আসেন আবার ফিরিয়া মায়ের খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়ান আবার আসেন আবার ফিরিয়া যান—দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিতেছিলাম এমন করিতেছেন কেন? এই রকম একবার মায়ের খাটের ধারে যাইয়া প্রণাম করিতেছেন—আবার দরজা পর্য্যন্ত আসিতেছেন এমনই করিয়া প্রায় পঁচিশ মিনিট গত

* ১৩৩৫ সনে অন্নদা ঠাকুর দেহরক্ষা করিয়াছেন।

হইল। তারপর যখন বাহির হইয়া আসিলেন তেমন শান্ত মুখশ্রী জীবনে খুব বেশী দিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাহিরে আসিয়া চরণামৃত নিত্যকার ন্যায় গ্রহণ করিয়া নিজের ঘরে যাইয়া বসিলেন। এই যে জাগতিক সম্পর্কের শেষ বিদায় মায়ের সঙ্গে হইয়া গেল তখন সে কথা কেহ জানিল না, কেহ তাহা বুঝিল না কেন তিনি বাহির হইতে আসিয়াও ঠাকুর ঘর হইতে, মার নিকট হইতে চলিয়া আসিতে পারিতেছিলেন না। শুধু পূজক সন্ন্যাসী পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—একি হইল! আর আমি গোলাপ মার ঘর হইতে দেখিতেছিলাম। যে সেবক সন্ন্যাসী তামাক লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল সে ও ভাবিতেছিল,—কেন মহারাজ আসিতেছেন না।

নিত্য যেমন আহার করেন তেমন আহার করিলেন। আহারান্তে বিশ্রাম বিশ্রামান্তে হাত মুখ ধুইয়া বসিয়া নিজ হাতে একখানা চিঠি লিখিলেন—ইহাই তাঁহার শেষ লেখা।

নানা রকম গল্পে সন্ধ্যা আগত হইল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরত্রিক আরম্ভ হইল। তারপর স্তোত্র পাঠ। স্তোত্র পাঠ সমাপ্ত হইল। তিনি হাত জোড় করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন।

তারপর উঠিয়া Bath Room (কল ঘর) এ গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া গামছা দিয়া মুখ হাত পা মুছিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া খাটের উপরে বসিলেন। এমন সময় স্বামী হরিপ্রেমানন্দ আসিয়া একটা খরচের হিসাব ও উদ্বৃত্ত টাকা পাশে রাখিয়া দিল। মহারাজ এইবার নীচে আসিয়া বসিবেন মনে করিয়া টাকা ও হিসাব দেরাজে

(Drawer) রাখিবার জন্য দক্ষিণ হস্ত বাড়াইলেন কিন্তু টাকা বা হিসাব ধরিতে পারিলেন না। পুনরায় চেষ্টা করিয়া না পারিয়া বলিলেন—ডান হাত দিয়া ধরতে পাচ্ছি না কেন? সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়া উঠিল—কপাল দিয়া ঘাম আরম্ভ হইল—একজন সেবক সন্ন্যাসীকে বলিলেন—"ঐ তেলটা দু ফোঁটা তালুতে দাও একমাত্রা মকরধ্বজ তৈয়ার কর। আর বলিলেন—কাউকে কিছু বোলোনা—এখনি ভাল হয়ে নীচে যাচ্ছি।" চিরদিন অপরকে ব্যস্ত করিতে, সেবা লইতে যিনি কাতর ছিলেন তিনি এসময়েও তাঁহা ভুলিতে পারেন নাই। 'কাউকে কিছু বোলোনা' বলার সঙ্গে সঙ্গে খাটের উপরে শুইয়া পড়িলেন। সেবকগণ ভয় পাইয়া সে সংবাদ নীচে আসিয়া বলিল। তখন রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকা মাত্র।

তখনই ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি—ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ প্রভৃতিকে সংবাদ দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে ডাক্তার কবিরাজে ক্ষুদ্র বাড়ীখানি ভরিয়া গেল—চিকিৎসকগণ একবাক্যে সন্ন্যাস রোগ স্বীকার করিলেন।

বেলুড় মঠে (Phone) সংবাদ দেওয়া হইল। মঠ হইতে সেবা-কুশল সেবকগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতাশ্রম, ছাত্রনিবাস সকল স্থান হইতে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ আসিতে লাগিলেন।—বাহির হইতে ভক্তগণ অনেকে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজের মাথাতে 'বরফ' দেওয়া আরম্ভ হইল। কবিরাজী মতে ঔষধ চলিতে লাগিল। আক্রমণের বেগ তীব্র হয় নাই বলিয়াই ঔষধ শেষ পর্য্যন্ত খাইতে পারিয়াছিলেন এবং সংজ্ঞা ও

পূর্ব্বাপর ছিল—কেবল রোগ যখন যখন বৃদ্ধি হইত তখনই লোপ হইয়া যাইত।—ইতিমধ্যে দুইদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত বাঁ হাতে কুশী গ্রহণ করিয়া নিজেই পান করিয়াছিলেন।

কবিরাজী ঔষধে উপশম হইল না দেখিয়া হোমিওপ্যাথিক আরম্ভ হইল। রোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধির দিকে চলিল। ডাক্তারগণের অভিমত লইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রে নিরাশার তার (Telegram) প্রেরণ করা হইল। চতুর্দ্দিক হইতে সাধুগণ শরৎ মহারাজকে দেখিতে ছুটিয়া আসিলেন। পূজনীয় তুলসী মহারাজ মালাবার হইতে সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজকে দেখিতে ছুটিয়াছেন। এদিকে দক্ষিণ ভারত বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়া রেল লাইন ধুইয়া গিয়াছে। তুলসী মহারাজ হতাস হইলেন না। ছয় দিন ক্রমাগত রেলপথে বোম্বাই হইয়া যে দিন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন সে দিন ১৮ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার। তুলসী মহারাজ আসিয়াই শরৎ মহারাজকে দেখিতে গেলেন। যেন তুলসী মহারাজের আন্তরিক টানের জন্যই ঠাকুর শরৎ মহারাজকে এই কয়দিন রাখিয়াছিলেন। তুলসী মহারাজের দেখাও হইল মহাপ্রস্থানের আশঙ্কাও প্রতিমুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল।

শেষ রাত্রি দুইটার পরে ভক্ত কণ্ঠে দূরাগত সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' এই মধুর নাম উচ্চারণের মধ্যে স্বামী সারদানন্দের মহাযাত্রার সংবাদ ঘোষিত হইল। যে যেখানে ছিল—সেবাশ্রান্ত ভক্তগণ আসিয়া মধুর 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শক্তিমন্ত্রের একনিষ্ঠ সিদ্ধ সাধক

মাতৃগতপ্রাণ স্বামী সারদানন্দ সে মধুর 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' নাম শুনিতে শুনিতে চির স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে দেবাদিদেবের আহ্বানে ঝাপাইয়া পড়িলেন। সে শাশ্বত মিলনবার্ত্তা সন্ন্যাসী ও ভক্তকণ্ঠে "শ্রীগুরুমহারাজজীকী জয়" ধ্বনিতে ঘোষিত হইল।

চিরকর্ম্মশ্রান্ত দেহ এতদিনে শান্ত হইয়া গেল।